প্রকাশকের নিবেদন

ভগবৎ কৃপায় আমাদের প্রথম প্রকাশিত এই গ্রন্থটি সকলের বিশেষ সমাদর লাভ করায় অতি অল্পদিনের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া যায়। তাহার পর বহু অনুরাগী পাঠকবৃন্দের অনুরোধ সত্ত্বেও অনিবার্য কারণ বশতঃ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে বিলম্ব হইয়া গেল। বর্তমান সংস্করণে লেখক-পরিচয় সংযোজন ব্যতীত মূল বিষয় বস্তু সবই অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে। আশা করি পূর্বের ন্যায় এবারও এই গ্রন্থটি সকলের নিকট আদরণীয় হইবে।

শুভ বুদ্ধপূর্ণিমা,
২০শে বৈশাখ, ১৩৭৩।

বিনীত
শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়

ডক্টর শ্রীহরিশচন্দ্র সিংহ
৬ই মার্চ ১৮৯৫—৩১শে ডিসেম্বর ১৯৬৩
প্রথম প্রকাশ—১৫ই আগস্ট ১৯৫৮

 দ্বিতীয় প্রকাশ—বুদ্ধপূর্ণিমা, ৪ঠা মে ১৯৬৬

প্রাপ্তিস্থান :

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির, ৪নং ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো, কলিকাতা-২৫।

২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমন্দির পোঃ ফলতা (২৪ পরগণা)

৩। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির প্রকাশক মণ্ডলীর পক্ষে,
শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক, ৪নং ঠাকুর রামকৃষ্ণ
পার্ক রো, কলিকাতা-২৫ হইতে প্রকাশিত।

এবং

শ্রীসুকুমার চৌধুরী কর্তৃক বাণী-শ্রী প্রেস, ৮৩ বি বিবেকানন্দ
রোড, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য আট টাকা মাত্র

"ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥"

মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

ভূমিকা

মানুষের মধ্যেও যেমন তেমনি ইতর প্রাণীদের মধ্যে কয়েকটি শক্তি জন্মে, যেমন বুদ্ধি (মস্তিষ্কে), ভাব (হৃদয়ে)। কিন্তু মানবের আর একটি শক্তি আছে যাহা পশুপক্ষীর নাই—সেটি বিবেক অর্থাৎ পরজগতের সঙ্গে মানবের সম্বন্ধে বিশ্বাস, পাপপুণ্যের অনুভূতি, যাহার কেন্দ্র আত্মা (the soul as the seat of conscience) এবং এই আত্মা হইতেই সকল ধর্মের জন্ম। কিন্তু ইহা বুদ্ধির বোধগম্য নয়, তর্কের বিষয় না, যতোবাচঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। ঈশ্বর মানব-আকারে জন্মগ্রহণ করেন কিনা, অমুক সাধু সত্যই ঈশ্বরের অবতার কিনা, তাঁহাকে অবতার মানিয়া লইলেও তিনি পূর্ণ বা অংশ (24 Carat gold) কিনা, এই প্রশ্ন লইয়া জগতে অশেষ তর্ক হইয়াছে এবং হইতে থাকিবে।

কিন্তু এহ বাহ্য। যুক্তির দ্বারা ইহার নিষ্পত্তি সম্ভব নয়। নিজের আত্মা যে সাড়া দেয় (electric response) তাহার দ্বারাই প্রত্যেক লোক এই প্রশ্নের উত্তর দিবে। আসল কথাটি এই—ঐ সাধুটি আমার আত্মার মধ্যে বিবেকের আলো জ্বালাইতে পারিয়াছেন কি? ইহার উত্তর যদি হাঁ হয়, তবে তিনিই আমার গুরু, সাচ্চা পীর। তাঁহার সংস্পর্শে আমার অন্ধকার হৃদয় আলোকিত, শক্তিশালী হইয়াছে, যেমন একখানা জ্বলন্ত কয়লার সঙ্গে ঠেকা লাগিলে একখানা কালো ভেজা কাঠ-কয়লা সজীব উজ্জ্বল হইয়া উঠে—

তব্ কয়লাকা ময়লা ছুটে
যব্ আগ্ করে পরবেশ।

রামকৃষ্ণ-শিষ্য মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের আশ্রিত এইরূপ একজন সাধু শ্রীহেমচন্দ্র রায়ের সঙ্গলাভ করিয়া এই পুস্তকের লেখক চিত্তের চিরশান্তি পাইয়াছেন, তাঁহার শিখান চিন্তাস্রোতে ভাসিয়া সাধনা করিয়া অধ্যাত্মজীবনে নবজন্ম লাভ করিয়াছেন। আরও অনেকে এই লাভের অংশীদার হইয়াছেন।

তাঁহার উপদেশগুলি এখানে যত্নের সহিত, প্রেমের, বিশ্বাসের সহিত লিপিবদ্ধ হইয়া বিনাশের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইল। কালে এই ক্ষুদ্র বীজ অন্য কোন শুষ্ক হৃদয়ে পড়িয়া ভক্তির বারি সিঞ্চনে অঙ্কুরিত, ফলপ্রসূ হইয়া উঠিবে। ঈশ্বরের জগতে খাঁটি জিনিস কখনও বৃথায় লোপ পায় না। ভক্ত-পরম্পরা নিজ চরিত্র দ্বারা গুরুর নাম অমর করিয়া রাখে।

শ্রীযদুনাথ সরকার

"মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

প্রার্থনা

শ্রীশ্রীহেমচন্দ্র রায় পরম পিতার শ্রীচরণকমলে।

বাবা, কথায় বলে গঙ্গাপুজা গঙ্গাজলে। আপনি বুঝিয়েছেন শুধু গঙ্গাপুজো নয়, সব পুজোই তাই। পত্র, পুষ্প, ফল, জল সবই তো শ্রীশ্রীঠাকুরেরই। যদি বলি, গাছ থেকে পাতা, ফুল ও ফল এবং নদী থেকে জল, আহরণের দ্বারা আমাদের ক'রে নিয়ে, তবে তাঁকে সমর্পণ করছি, তবু আহরণের সেই শক্তিই বা কার? তাঁরই নয় কি? সুতরাং সমর্পণ না ব'লে প্রত্যর্পণ বলাই সঙ্গত। সত্যই এ শুধু ফেরফার। বাবা, আপনার মনের বাগানে অজস্র ফুল। আমি কটাই বা কুড়াতে পেরেছি? যে কটি কুড়িয়েছি তার কতকগুলি দিয়ে এই মালাটি গেঁথে আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করছি।

বাবা, সত্যই এ গঙ্গাজলেই গঙ্গাপুজা। শুধু তাই কেন, এই তীর্থনীর অনেকের পরশে পবিত্র করা। প্রথমেই অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয়ের কথা মনে পড়ে। তিনি তাঁর জীর্ণ দেহে নানা অসুবিধার মধ্যেও ভূমিকাটি লিখে দিয়েছেন। বেঙ্গল অটোটাইপ কোম্পানির শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার সেনগুপ্ত মহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতির ব্লকখানি এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয়ের সেবকমণ্ডলী মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের প্রতিকৃতির ব্লকখানি এই গ্রন্থে ব্যবহারের জন্য প্রদান ক'রে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। আপনার "স্মৃতিকথা"র উপাদান অনেকের নিকট থেকে সংগৃহীত হলেও, সেটি আপনার জনৈক সন্তান আমাদের সকলের হয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে লিখে দিয়েছেন। আপনার আশ্রিত অন্য অনেকে, কেউ বা অর্থ সাহায্যের দ্বারা, কেউ বা অন্য ভাবে, এই পুণ্য অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের সকলের কথাই কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি, এবং আপনার আবির্ভাবের এই পুণ্যতিথিতে শুধু তাঁদের কেন, সকলেরই আত্যন্তিক কল্যাণ প্রার্থনা করছি।

এই পুস্তকের সমগ্র আয় আপনার নামে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত 'মহাত্মা হেমচন্দ্র রায় রিলিজাস এণ্ড চ্যারিটেব্‌ল ট্রাস্ট'এ অর্পিত হল। আপনি গ্রহণ ক'রে কৃতার্থ করুন।

পরিশেষে প্রার্থনা—"পিতা নোঽসি, পিতা নো বোধি", তুমি আমাদের পিতা আছ সত্যই, কিন্তু সেই বোধ আমাদের দাও। ওঁ তৎসৎ।

শুভ শুক্লা ত্রয়োদশী।
১১শে চৈত্র, ১৩৬৪।

আপনার স্নেহের বাবাঠাকুর

সূচীপত্র

শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহ

লেখক-পরিচয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন—" যে সংসারে থেকে তাঁকে ডাকে, বিশ মণ পাথর ঠেলে যে আমায় দেখে সেই-ই ধন্য সেই-ই বাহাদুর সেই-ই বীরপুরুষ।"

এমনি এক বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায় এই পুস্তকের লেখক শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহের জীবনে। পরদুঃখকাতর হরিশ্চন্দ্র কৈশোরে সমাজ সেবা এবং পরে স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িত হন। তাঁহার সর্বদা লক্ষ্য ছিল একজন নিষ্কলঙ্ক মহৎ ও খাঁটি লোকের সন্ধান করা যাহাতে তাঁহাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া ও তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিয়া জীবন সার্থক হইতে পারে। কিন্তু এমন লোক মিলিল না। কারাবরণ, অন্তরীণাবস্থা প্রভৃতি বাধা সত্ত্বেও কৃতী ছাত্র হরিশ্চন্দ্র বিজ্ঞান বিভাগে ফলিত গণিতের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া দুইটি স্বর্ণপদক লাভ করেন। ইহার পর তিনি এক ব্যাঙ্কিং সংস্থায় যোগদান করেন এবং সেখানে চাকরি করিতে করিতে তদানীন্তন লণ্ডনের "ইনষ্টিটিউট্ অব্ ব্যাঙ্কার্স" পরীক্ষায় বিদেশীয় ছাত্রগণের মধ্যে প্রথম এবং সমস্ত উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়া মানপত্র লাভ করেন। ঐ ব্যাঙ্কিং সংস্থা বিলুপ্ত হইলে স্যর আশুতোষের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগে অধ্যাপনার কার্যে নিযুক্ত হন এবং তিন বৎসরের কঠোর পরিশ্রমে "Early European Banking in India with some reflections on present conditions" শীর্ষক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন সর্বোচ্চ উপাধি পি, এইচ, ডি, ডিগ্রি লাভ করেন। ভারতীয় পরিসংখ্যান সংস্থাটিকে ইনিই মুখ্য সম্পাদক রূপে গড়িয়া তোলেন। ১৯৫২ সালের ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পরিসংখ্যান শাখার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন।

বাল্যে মাতৃহীন হরিশ্চন্দ্রের চির কৌমার্যের সংকল্প তাঁহার পিতার চোখের জলে টলিয়া গেল। কিন্তু সংসারে প্রবেশ করিয়াও তাঁহার মন শান্ত হইল না। ব্রাহ্ম সমাজে তাঁহার যাতায়াত ছিল—কিন্তু সেখানেও কাম্যবস্তু তিনি পাইলেন না। অবশেষে এক পুত্র ও এক কন্যার জন্মের পর তিনি দৈববশে তাঁহার বাঞ্ছিত ব্যক্তির সন্ধান পাইলেন। ইনি তাঁহার গুরুদেব শ্রীশ্রী[illegible]চন্দ্র রায়। ইহার নির্দেশ অনুযায়ী ঈশ্বর লাভেই মানব-জীবনের সার্থকতা বুঝিতে পারিয়া হরিশ্চন্দ্র ঈশ্বর লাভই জীবনের লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু

ইহাব জন্য সংসার ও কর্মক্ষেত্রে তিনি নিজ কর্তব্যে কোনরূপ ত্রুটি ঘটিতে দেন নাই। গুরুলাভের এক বৎসব পবে পবিসংখ্যান বিষযে চর্চাব জন্য বিশ্ববিদ্যালয হইতে বৃত্তি পাইযা তিনি ইংল্যাণ্ড গমন করেন। তথায কর্মব্যস্ততাব মধ্যেও তিনি আপন সাধনা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। দেশে ফিবিবাব পব কর্মক্ষেত্রের বিপুল কর্মস্রোত ও সংসাব হইতে প্রবাহিত প্রবল বাধাব স্রোত ঠেলিযা হবিশ্চন্দ্র যথার্থ বীবভক্তের ন্যায অসীম তিতিক্ষাব সহিত ধর্মপথে পুর্ণোদ্যমে অগ্রসব হইতে লাগিলেন এবং যথাকালে সিদ্ধিলাভ কবিলেন। কর্মক্ষেত্রে কোনপ্রকাব শৈথিল্য প্রদর্শন না করিলেও প্রযোজনাতিরিক্ত কর্মে জড়াইতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। দেশে এবং বিদেশে বিপুল সম্মান ও অর্থ উপার্জনেব একাধিক প্রস্তাব তিনি বিনা দ্বিধায প্রত্যাখ্যান করেন।

বাহিবের বাধা যেমন তিনি জয কবিযাছেন তেমনি শাবীবিক বাধাও তাঁহাব আধ্যাত্মিক সাধনাকে প্রতিহত করিতে পারে নাই। জীবনেব শেষ কুড়ি বৎসর নানা প্রকার কঠিন রোগে আক্রান্ত থাকিলেও তাঁহাব মুখেব হাসি অম্লান ছিল। বিশেষ কি অন্তিম বোগশয্যায পাঁচ মাসেব অধিক কাল তিনি ইউবিমিযার ও হার্টের হাঁপানির কষ্ট যেরূপ শান্তভাবে ববণ করিযাছেন তাহা চিকিৎসকমণ্ডলীসহ সকলকেই বিস্মিত কবিযাছে। দেহ ও মন যেন সম্পূর্ণ আলাদা।

অবসর গ্রহণান্তে হবিশ্চন্দ্র স্বীয গুরুদেবেব পরিকল্পিত নূতন আশ্রম, ফলতায গঙ্গাতীবে স্থাপনা করিয়া, তথায বাস কবিতে লাগিলেন। পবম বিনযী, আত্মপ্রচাব বিমুখ এই মহাপুরুষ জন সমাগম হইতে দূবে আত্মগোপন করিযা থাকিলেও কতিপয ভাগ্যবান লোক তাঁহাব সংস্পর্শে আসিযা ধন্য হইযাছিলেন। সদা হাস্যময হবিশ্চন্দ্র স্নেহমযী জননীর ন্যায় সদাসতর্ক দৃষ্টি লইযা অপাব স্নেহে গুণবান গুণহীন, বিদ্বান মূর্খ, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সমভাবে ইহাদেব কল্যাণ তথা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রাণপাত কবিযাছেন। তিনি স্বীয বালসুলভ চবিত্রেব মাধুর্যে এবং অপত্যস্নেহে বহু ভক্তের জীবনধারা সংসাবের গতানুগতিক পথ হইতে ফিবাইযা আনিযাছেন। লক্ষ্যভ্রষ্ট দিশেহারা, নৈবাশ্যে পূর্ণ এই যুগে তাঁহাব মত পথপ্রদর্শক মহাপুরুষ আশাব আলোকবর্তিকা স্বরূপ। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বব প্রায ৭০ বৎসর বয়সে হরিশ্চন্দ্র মহাসমাধি লাভ কবেন।

প্রস্তাবনা

সাধারণতঃ বলা হয়ে থাকে শ্রীভগবান তিনটি উদ্দেশ্য সাধনেব নিমিত্ত অবতাবরূপে আবির্ভূত হন ঃ—(১) দুষ্কৃতদের বিনাশ, (২) সাধুদের পরিত্রাণ এবং (৩) ধর্ম সংস্থাপন। সত্যযুগেব যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে মনে হয় তখন সমাজ ব্যবস্থা জটিল ছিল না ; মানুষের জীবনযাত্রা সহজ, সরল ও স্বাভাবিক ছিল। সেই নিমিত্তই কি তখন মনুষ্যদেহ-ধারী অবতার পুরুষের প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই ? কিন্তু তখনও বর্ণিত আছে যে শ্রীভগবান মৎস্যরূপে আবির্ভূত হযে প্রলয়েব কারণ-সলিল-রূপ অজ্ঞানে নিমজ্জিত শুদ্ধ জ্ঞান উদ্ধার করলেন এবং ভক্ত স্তব করলেন, "প্রলয় পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্" ; "প্রলয সমুদ্রেব জলে তুমি বেদ ধারণ করেছ।"

পরবর্তী ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ—রামায়ণ, মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণের যুগ। সেই সময়েই এগুলি লেখা হয়েছে একথা বলছি না, লেখা হয়েছে তার অনেক পরে। কিন্তু পৌরাণিক যুগের যে সব লীলা-কথা বর্ণিত হয়েছে, তাতে মনে হয় মানুষের জীবনযাত্রা পূর্বতন সত্যযুগের সেই সহজ, সরল পথ পরিত্যাগ ক'রে কৃত্রিম পথে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করেছে। মানুষের অন্তরের কালিমা ধর্মেব স্বাভাবিক রূপকে আবৃত ক'রে ফেলছে। অবতার পুরুষেরা এসে সেই আবরণ উন্মোচন ক'রে ধর্মের বিশুদ্ধ রূপ জগৎকে দেখালেন। অবশ্য তাঁদেব দৈত্যদলনের, অসুর বিনাশের এবং সাধু ভক্ত শরণাগতের রক্ষার নানা আখ্যায়িকা আছে। কিন্তু তাঁদেব মুখ্য কাজ ধর্ম সংস্থাপন। ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করলে এটি বেশ বোঝা যায়। কিন্তু এ আলোচনা সহজসাধ্য নয়। কোনও ধর্মমতই প্রথম থেকেই প্রণালীবদ্ধ ভাবে প্রচারিত হয় নি। তারও পরে গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হতে সময় লেগেছে। আবার গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হলেও তাতে পরবর্তী সময়ের অন্য মতও প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। সুতরাং পৌর্বাপর্য নির্ণয় করতে গেলে ভ্রম প্রমাদের আশঙ্কা আছেই।

তথাপি মনে হয় ঋগ্বেদের যুগের ধর্মের সরল আদর্শ পরবর্তী ব্রাহ্মণের যুগে বিকৃত হয়েছিল। আগে সকলে নিজেকে নিজেকে ধর্মের অনুগত করবার প্রয়াসী ছিল। পরে কিন্তু তা না ক'রে ধর্মকেই নিজেদের অনুগত করবার চেষ্টাতে অনুষ্ঠানের বাহুল্য ঘটল এবং ধর্ম খর্ব হয়ে গেল। মানুষ ধর্মকে ধরে ধর্মের আশ্রয়ে না থেকে ধর্মকে অনুষ্ঠানের ও মন্ত্র তন্ত্রের নাগপাশে বেঁধে ফেলে নিজেরাই ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করব এই অভিমান ভরে, অহংকারের বশবর্তী হয়ে, "যক্ষ্যে, দাস্যামি", "আমি যজ্ঞ করব, আমি দান করব" এই বলে চীৎকার ক'রে তমঃ-সম্ভূত অজ্ঞানের তিমির আবরণে ধর্মের শুচি শুভ্র রূপ ঢেকে ফেলল।

কার আবির্ভাবে এই অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত হয়েছিল জানি না। জানি না এই আবির্ভাব স্বরাট্ না বিরাট। ঋষিরা নিজেদের কথা বিশেষ কিছু বলেন নি। তাঁরা নিজেদের প্রচার করতে চাইতেন না। সুতরাং তাঁরা কার আবির্ভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন কেমন ক'রে বলা যাবে? তথাপি যখন তাঁরা বলছেন, "প্রাপ্য বরান্ নিবোধত", তখন কী বলতে চাইছেন? তাঁরা কি এই কথা বলতে চাইছেন যে শ্রেষ্ঠ তত্ত্বরাশি বা জ্ঞানরাশি লাভ করে প্রতিবোধিত হও? না কি, এই বলতে চাইছেন যে তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণের সংস্পর্শে এসে জ্ঞানলাভ কর? না কি, কোনও একজন আচার্যশ্রেষ্ঠকে গৌরব দানের জন্যই এই বহুবচন প্রয়োগ করেছেন? রবীন্দ্রনাথ তাঁর "মনুষ্যত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধে যেখানে এই শ্লোকার্ধের তর্জমাতে লিখেছেন, "যথার্থ গুরুকে প্রাপ্ত হইয়া বোধ লাভ কর", সেখানেও কি তিনি এই মানেই করেন নি? তাই মনে হয়, ব্রাহ্মণের যুগের পরবর্তী অজ্ঞান-তিমিরাবগুণ্ঠিতা রজনীর অন্ধকারে, নিঃশব্দে, গোপনে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম, অদৃশ্য শিশিরবিন্দু সম্পাতে বেদান্তাম্বুজ-কলি হয়তো বা পুষ্টিলাভ করেছিল, কিন্তু বেদান্তাম্বুজ প্রস্ফুটিত হবার জন্য সূর্য উঠে নাই কি? তাই বলি, "উদিলে ঋষি-হৃদয়ে সূর্যসম।" প্রথমে অরুণোদয়ের অস্ফুট আলোকে অজ্ঞানের অন্ধকার অপসারিত হল। পরে সূর্যের ভাস্বর দীপ্তিতে

সব প্রকাশিত হয়ে গেল। কিন্তু কতদিনই বা সেই ভাস্বর দীপ্তি! কিছুদিনের মধ্যে আবার অহংকারে বিমূঢ় হয়ে মানুষের ধর্মের নামে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টাতে ধর্মের কত শাখা, কত প্রশাখা, কত জটিলতা দেখা দিল। সাংখ্য, ন্যায় এবং অপরাপর দর্শনশাস্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে মস্তিষ্কের খাদ্য যোগাল বটে, কিন্তু হৃদয় শুষ্ক হয়ে গেল।

ঠিক এই সময়েই ভক্তিমার্গ ও ভাগবত ধর্মের আবির্ভাব। বৈদিক কর্মমার্গ, বৈদান্তিক জ্ঞানমার্গ, সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ, পাতঞ্জলের যোগমার্গ এ সকলের সমন্বয় শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে তাঁর পুরুষোত্তম-তত্ত্বে সংসাধিত করলেন। খ্রীষ্ট দেবের মত "I have come to fulfil, not to destroy" "আমি ধ্বংস করতে আসি নি, পূর্ণতা-বিধানের জন্যই এসেছি" এ কথা স্পষ্ট না ব'লে, গীতা-মুখে বুঝিয়ে দিলেন। কিন্তু হায়! কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত হতে না হতেই "অশেষ তন্ত্রে-মন্ত্রে, কৃত্রিম ক্রিয়া কর্মে, জটিল মতবাদে" আবার ধর্ম গহন ও দুর্গম হয়ে গেল।

এবারে এলেন বুদ্ধদেব। মানুষের কথা দূরে থাকুক, সামান্য ছাগ-শিশুর জন্য অক্লেশে প্রাণ উৎসর্গকারী বুদ্ধদেব সেই পুরাতন বৈদান্তিক তত্ত্ব "ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্" "ঈশ্বরের দ্বারাই সব কিছু আচ্ছাদিত" এটি নিজের জীবনে দেখালেন। এবং মুখেও বললেন, "মা যেমন নিজের একটি মাত্র পুত্রকে নিজের আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন, সমস্ত প্রাণীতে সেই প্রকার অপরিমিত মানস রক্ষা করবে। উর্ধ্বে, অধঃ, চারদিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাহীন, হিংসাহীন, শত্রুতাহীন অপরিমিত মানস ও মৈত্রী রক্ষা করবে।" কিন্তু হায়! কালের কি করাল গতি! এই পবিত্র ধর্মেরও কালক্রমে বিকৃতি ঘটল। কী সব বীভৎস অনুষ্ঠানেই না সেই পবিত্র ধর্ম পর্যবসিত হল।

শুধু এদেশে কেন, অন্য দেশেও এরই পুনরাবৃত্তি দেখতে পাওয়া যায়। ধর্মধ্বজী ফ্যারাসিদের বাহ্য, হৃদয়হীন, অনুষ্ঠানের পরিবর্তে খ্রীষ্টদেব ঈশ্বরকে ভালবাসতে শেখালেন, নিজের প্রতি যেরূপ,

প্রতিবেশীদের প্রতিও ততখানি প্রীতি কববার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু কালক্রমে তাতেও কত বাদ বিসংবাদ। ধর্মেব নামে কী পৈশাচিক নির্যাতন। কত রক্তপাত! এই সবই আবার অনুষ্ঠিত হল তাঁবই নামে, যিনি ক্ষমাসাব,—ক্রসে বিদ্ধ হয়েও যিনি নির্যাতনকারীদের জন্য প্রার্থনা করছেন, বলছেন "বাবা, এদের ক্ষমা করুন। এরা জানে না যে এবা কী কবছে।" এক এক সময়ে মনে হয়, একি শুধুই ক্ষমাব একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত? না কি, খ্রীষ্টদেব বলতে চাইছেন যে তাঁর উপরে নির্যাতন যত নিদারুণ হবে, অধর্মের আর ধর্মের পার্থক্য সকলে ততই পবিষ্কাব ভাবে বুঝতে পাববে, এবং ধর্মের মহিমা ততই বিঘোষিত হবে। সুতবাং তাদেব ক্ষমা করা উচিত, শাস্তি দেওযা উচিত নয়। দেখা যায় যে এব প্রায় দেড হাজার বৎসর পরেও হরিদাস ঠাকুর একটি নয়, দুইটি নয়, পরে পরে বাইশটি বাজারে কঠোব নির্যাতনেব পরেও ঠিক এই কথাই বলছেন এবং তারও ঠিক এই ফলই হয়েছিল।

বিকৃত বৌদ্ধ অনুষ্ঠান আর বীভৎস তান্ত্রিক অনুষ্ঠান,—এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। এবারে এলেন শংকরাচার্য। প্রতিষ্ঠিত করলেন অদ্বৈত -মাযাবাদ। সুগভীব তাঁর পাণ্ডিত্য। অপূর্ব তাঁর মনীষা। অদ্ভুত তাঁব তর্কশক্তি। তাঁর আবির্ভাবে -সনাতন ধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হল কিন্তু সে কেবল তত্ত্বের দিক দিয়ে। তাঁর উপদিষ্ট সন্ন্যাস ও জ্ঞান মার্গ সর্বসাধারণেব উপযোগী হল না। তাঁর নিজেব জীবনে তত্ত্বজ্ঞান লাভের পবে "বিদ্যার আমি"ব নানা কাজ দেখা গেলেও, তিনি জ্ঞান ও কর্মেব সহ-সমুচ্চয় কখনই মানেন নি। তাই তাঁর প্রচারিত মতবাদ সর্বসাধারণের কাছে কর্মশূন্য জ্ঞানের সাধনাতে পর্যবসিত হল। সুতরাং যে বৌদ্ধ সাধনার প্রতি তাঁর নিদারুণ অভিঘাত, তাঁর প্রচারিত ধর্মমতেও সেই একই দোষ দেখা দিল। নিয়তির কী সুতীক্ষ্ণ পরিহাস!

পববর্তীকালে নিম্বার্কাচার্য, মধ্বাচার্য প্রভৃতি আচার্যেরা মায়াবাদের প্রতিবাদ করলেও শুষ্ক জ্ঞান-চর্চা বন্ধ হল না। অপর পক্ষে

শ্রীশংকরের আবির্ভাবের কিছুদিন পরেই আবার কাম্য কর্মের প্রাবল্য দেখা দিল। বাসনা-বহ্নিতে ধর্মের নামে আবার আহুতি দেওয়া হল। তার লেলিহান শিখা বহুধা বিভক্ত হল। আবার সেই জটিলতা। এরপর শ্রীচৈতন্য আবির্ভূত হয়ে ভক্তি ধর্ম প্রচার করলেন। কিন্তু হায়, মানুষে আবার ভুলল যে ধর্মসাধনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বড় নয়; আনন্দই বড। সে আনন্দের পরিবর্তে ক্রমে দেখা দিল—একদিকে শাক্তবৈষ্ণবের বাদ বিসংবাদ আর অপরদিকে ন্যাডানেড়ির বীভৎস ঢলাঢলি। কিসে আর কিসে!

এবার এলেন পরমহংসদেব। তাঁর সমন্বয় এক অদ্ভুত ব্যাপার। তিনি স্থাবর জঙ্গমে, কীটপতঙ্গে, কি কুলনারী, কি ব্যভিচারিণী, সকলের মধ্যেই সেই একেকেই দেখলেন। কি নিরাকারে, কি-সাকারে; কি নির্গুণ ব্রহ্মে, কি সগুণ ব্রহ্মে, কি শাক্তে, কি বৈষ্ণবে, কি হিন্দু ধর্মে, কি মুসলমান ধর্মে; কি ব্রাহ্ম ধর্মে, কি খ্রীষ্ট ধর্মে; সেই একেকেই দেখলেন, সেই একেকেই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁর বহুরূপীর উপাখ্যান, ভক্তিহিম, জ্ঞান-সূর্যের উপমা, কত আর বলি!

এ পর্যন্ত অবতার পুরুষগণের যে বর্ণনা দেওয়া হল তাতে দেখা যায় যে প্রত্যেক অবতার প্রথমে তাঁর ভক্ত বা শিষ্যদের কাছে গুরুরূপেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। পরে অবশ্য অপর সকলেও তাঁকে অবতার বলে স্বীকার করেছেন। শ্রীভগবান অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখাবার পরে বলছেন :—

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবং বিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥" গীতা ১১।৫৪।

"হে পরন্তপ অর্জুন, জীব কেবল অনন্যাভক্তি দ্বারাই আমার এই তত্ত্ব জানতে, আমার স্বরূপ দর্শন করতে এবং আমাতে প্রবিষ্ট হতে সমর্থ হয়।"

শ্রীভগবানকে মনুষ্যদেহধারী গুরুরূপে পেয়ে তাঁর সঙ্গগুণে অনন্যা-ভক্তির উদয় হলে শুধু যে তাঁতে শ্রীভগবানের আবির্ভাবই বোঝা যাবে এমন নয়, ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান, ব্রহ্মদর্শন এবং ব্রহ্মাত্মভাবও হবে।

লক্ষ্য করবার আরও একটি বিষয় আছে। গীতা বোঝানর সময়ে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের প্রেমের লীলা ভুলেছিলেন ; হস্তিনা নগরের রাজ-সভাতে দৌত্য ভুলেছিলেন ; তাঁর অপরাজেয় বীরত্ব, অলৌকিক অস্ত্র-শস্ত্র ভুলেছিলেন ; ভীষণ কুরুক্ষেত্রের রণকোলাহল, উদ্যোগ আয়োজন, কূটনীতি, সলাষড়যন্ত্র সব ভুলেছিলেন। এমন কি ধর্ম প্রচার, ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা এ সবও যেন তাঁর কাছে গৌণ, গুরুরূপে অর্জুনের মোহ দূর করাই যেন তাঁর একমাত্র কাজ।

শুধু শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুনের বেলাতে কেন, প্রতি গুরুশিষ্যের বেলাতেই এটি দেখতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত "শ্রীগুরু" শীর্ষক প্রবন্ধে আরও বলা হয়েছে যে গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের মত। এবং প্রকৃত প্রস্তাবে সীতা-রাম, রাধা-কৃষ্ণ, সারদা-রামকৃষ্ণের পরস্পরের সম্বন্ধ এই দিক দিয়ে দেখলে তবে খানিকটা বোঝা যায়। আমরা সকলেই শুনেছি "পতি পরম গুরু" ; কিন্তু এই প্রসঙ্গে লৌকিক স্ত্রীর, লৌকিক স্বামীর কথা নয়, ভক্ত শিষ্যের পালন-কর্তা শ্রীভগবানের অলৌকিক সম্বন্ধের কথা হচ্ছে, এটি আমরা কখনও ভেবেছি কি?

সীতা রাজকন্যা, রাজবধূ, তিনি সব কর্তব্য পরিহার ক'রে একান্তভাবে রামচন্দ্রের কাছেই নির্জন বনে রয়েছেন। এমন কি, রামচন্দ্রের জন্য ফলমূলও লক্ষ্মণই সংগ্রহ ক'রে আনছেন। আর রামচন্দ্রও সব ভুলে, সব ছেড়ে কেবল সীতাকেই শেখাচ্ছেন। তাঁর অন্য কোনও কাজই নেই। দুজনেরই নবযৌবন, দুজনেই অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করছেন। চৌদ্দ বৎসর পরে শুধু রাজকার্যের জন্য লবকুশের জন্ম হল। তখনও আসক্তি কিছুমাত্র নাই। নতুবা, না বলে, না কয়ে লক্ষ্মণের সঙ্গে ছল ক'রে, পঞ্চমাস গর্ভবতী সীতাকে রামচন্দ্র বাল্মীকির আশ্রমে পাঠাতে পারতেন কি? না কি, ঋষি নির্বাসিতা সীতার কাছে রামচন্দ্রের এই অন্যায় আচরণের কথা উল্লেখ করাতে তিনি কখনও বলতে পারতেন, "ঋষি, তুমি জান না যে রামচন্দ্র আমার কী! এমন কথা তুমি যদি আবার বল, আমি এখনই তোমার আশ্রম ছেড়ে চলে যাব।"

কর্ণ অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার লোভে পরশুরামকে স্বীয় ক্রোড়ে নিদ্রাগত দেখে বজ্রকীটের দংশন সহ্য করেছিলেন। আর মা সীতা! পঞ্চবটীতে যখন রামচন্দ্র তাঁর অঙ্কে নিদ্রিত ছিলেন, তখন তাঁর সুকোমল আরক্তিম পাদমূল সুপক্ক ফল মনে ক'রে একটি পাখী দংশনের পরে দংশন ক'রে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছিল। সে সময়ে তিনিও তো বাঙ্‌নিষ্পত্তি করেন নি ;—কিছু লাভের আশায় তো নয়। নিদ্রাভঙ্গের পরে রামচন্দ্র সোহাগভরে যে মণিটি তাঁকে দিয়েছিলেন সেটি তিনি নিজের মাথাতে চুলের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন,—পাছে অপর কেউ জানতে পারে। তাই, হনুমান যখন অশোকবনে তাঁর কাছে অভিজ্ঞান চাইলেন, পাছে রামচন্দ্র মনে করেন যে মা সীতার বেশে কোনও রাক্ষসীই হনুমানকে ছলনা করেছে, তখনই সেই চূড়ামণি তিনি বার করে দিলেন। তখনও তিনি হনুমানের পিঠে চড়ে অশোকবন থেকে পালিয়ে গিয়ে তাঁর দুর্বিষহ যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা, গঞ্জনার আশু প্রতিকার চাইলেন না, বললেন, "আমার রামচন্দ্র এসে আমাকে নিয়ে যাবেন, তবে যাব।"

তাই মনে হয় এ আদর্শ গুরু, আদর্শ শিষ্য ; আদর্শ আত্মনিবেদন, আদর্শ শরণাগতি। কিন্তু এটি পৌরাণিক কাহিনী বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না তো। আধুনিক যুগেও সারদা-রামকৃষ্ণের অলৌকিক, অপার্থিব দিব্য সম্বন্ধের কথা স্বতঃই মনে উদিত হবে। যখন ভক্ত কন্যারা শ্রীশ্রীমায়ের কাছে তাঁর প্রতি শ্রীশ্রীঠাকুরের অমনোযোগ এবং অদ্ভুত ব্যবহারের কথা ব'লে অনুযোগ করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, "তোমরা কী যে বল! ঠাকুর আমার বুকের মধ্যে আনন্দের ঘট বসিয়ে দিয়েছিলেন" শ্রীশ্রীঠাকুরের সাহচর্যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলে শ্রীশ্রীমায়ের সাধনার সময়েও রাক্ষস রাক্ষসীর উপদ্রব ছিল না এমন নয়। হাজরার আর হৃদয়ের দুর্ব্যবহারের কথা মনে পড়ে। শ্রীশ্রীঠাকুর ত্যাগী আর শ্রীশ্রীমা অলঙ্কার-বিমণ্ডিতা,*

* সারদা-রামকৃষ্ণ : শ্রীদুর্গাপুরী দেবী, শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, ১৩১৬, ১১১-১১২ পৃঃ।

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমায়ের উপরে রাগ ক'রে শ্যামপুকুরে চলে গিয়েছেন,** এ রকম কত গঞ্জনা শ্রীশ্রীমাকে সইতে হয়েছে। যেমন মিলনের সময়ে, তেমনি বিরহের সময়ে। শ্রীশ্রীঠাকুরের তিরোভাবের পরে ১২৯৪ সালের ভাদ্র থেকে ১২৯৫ সালের জ্যৈষ্ঠ এই সুদীর্ঘ দশমাস কামারপুকুরে তপশ্চর্যার করুণ কাহিনী আজও সম্পূর্ণ জানা যায় নি। এ যেন অশোকবনে মা সীতার দশমাস বাস। হরিশের আক্রমণ যেন রাবণের কু-প্রস্তাব। কুসংস্কারাচ্ছন্ন পল্লীবাসিনীদের শ্রীশ্রীমায়ের পরিধানে পাড়ওয়ালা শাড়ী এবং হাতে বালা দেখে তীব্র মন্তব্য যেন চেড়ীদের নিদারুণ বাক্য-যন্ত্রণা। এ সবের মধ্যে কেবল প্রসন্নময়ী সরমার মত মাকে প্রবোধ দিয়েছিলেন। হায়, মূঢ় পল্লীবাসিনীরা কেমন ক'রে বুঝবেন যে শ্রীশ্রীঠাকুর কেন স্বয়ং শ্রীশ্রীমাকে মা সীতার মত হোগল পাকের বালা গড়িয়ে দিয়েছিলেন। আর শ্রীশ্রীমায়ের কি কৃচ্ছ্রসাধন! কি কঠোর তপস্যা! বরাহনগরের মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদের তপশ্চর্যার সময়ে তাঁদের অন্ততঃ নুন ভাতটাও জুটেছিল। আর শ্রীশ্রীমা নুনটুকুও পান নি। তবু কেবল শ্রীশ্রীঠাকুরের গুণই গেয়ে গিয়েছেন। মাতা শ্যামাসুন্দরীর আহ্বানে জয়রামবাটীতে গেলেন না। পরম গুরু পতির ভিটেতেই পড়ে রইলেন।

এটিও দেখা যায় যে ভক্ত শিষ্য শ্রীগুরুকে একান্ত আপনার জন বুঝে এমন অভিভূত হয়ে যান যে শাস্ত্রনির্দিষ্ট লক্ষণ মিলিয়ে মিলিয়ে শ্রীগুরুর অবতারত্ব প্রতিপাদনের ইচ্ছা তাঁর আর থাকে না। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরকে "অবতারবরিষ্ঠ" বলে স্তব করেছেন। আবার রহস্য ক'রে এও বলেছেন "এ জন্মটা ঐ বুড়ো বামুনের পায়ে দিয়েছি। আর জন্মে না হয়, দেখে শুনে একটা ভাল গুরু করা যাবে।" ভক্তপ্রবর গিরিশচন্দ্রও তাঁর লিখিত "পরমহংসদেবের শিষ্যস্নেহ" প্রবন্ধে বলেছেন যে যখন তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নেহের কথা স্মরণ করেন, তখন তিনি জড় হয়ে যান। যোগের চিত্তবৃত্তি নিরোধের সঙ্গে এর

** শ্রীমা সারদা দেবী, স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৫০; ১৭১-১৭২ পৃঃ।

তফাৎ কোথায়? যোগসাধনার উপলব্ধি এইভাবে হবে না কি? আম খেতে পেলে পাতা গণাব চেষ্টা কে করে?

অপর পক্ষে অবতারের আবির্ভাব সম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্যও অন্যভাবে নেওয়া যেতে পারে। এই গ্রন্থে "অবতার" শীর্ষক প্রবন্ধে "যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানি· " এই শ্লোকের উপরে শ্রীশ্রীহেমচন্দ্র নূতন আলোকপাত করেছেন। বাস্তবিক পক্ষে ধর্ম কি, ধর্মের গ্লানিই বা কি, অধর্মের অভ্যুত্থান বা কি, এগুলি কিরূপে ব্যক্তিগত জীবনে উপস্থিত হয়, এ সব বিষয়ে নূতন ক'রে ভাববার কিছু নাই কি? যা কিছু আমরা ধর্ম বলে ধরে থাকতে চাইছি, কর্তব্য বলে পালন করতে চাইছি, সেই কর্তব্যেই সংকট এসেছে, পালন করা যাচ্ছে না, তাই ধর্মের গ্লানি! আবার, যেগুলি কিছুতেই ধরে রাখা যাবে না,—অনিত্য ধন জন মান, সেই সব অধর্মের আমাদের মধ্যে এত অভ্যুত্থান যে অহর্নিশি তাদের চিন্তাতেই আমরা ব্যাপৃত। এই দ্বিবিধ বিপত্তি নিবারণের জন্য মধুসূদন স্বয়ং আসেন। এসে, সাধু অর্থাৎ সৎপ্রবৃত্তিগুলি রক্ষা করেন; দুষ্কৃত অর্থাৎ যা তাঁকে দূর করে, তফাৎ করে, সেগুলি বিনাশ করেন। আর কি করেন? ধর্মসংস্থাপন করেন। আগে যাকে ধর্ম বলে মনে করেছিলাম সে তো ধর্ম নয়, ধরে তো থাকা যায় না। তিনি এসে বাঁশী বাজিয়ে অর্থাৎ তাঁর মধুর জীবনের মধুর আদর্শে আমাদের আকৃষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দেন যে ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু। আমাদের সেই ভাবে অনুপ্রাণিত ক'রে, আমাদের প্রবৃত্তির মোড় ফিরিয়ে দেন। বুঝিয়ে দেন, আমাদের কি করতে হবে, না হবে। শুধু অর্জুনের গুরুরূপে নন; আমাদেরও গুরুরূপে। কিন্তু যুগে যুগে, অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে হয়ে, তবে ক্রমশঃ তাঁর এই দিব্য আবির্ভাব বুঝতে পারা যায়। যত আমাদের মন শুদ্ধ, পবিত্র হবে, ততই গুরুতে আমাদের ঈশ্বর বোধ দৃঢ় হবে। তখন আমরাও অর্জুনের মত বলতে পারব, "করিষ্যে বচনং তব," "ঠাকুর, আমি তোমারই কথামত চলব।" শ্রীগুরুর কাছে ব'সে শ্রীগুরুর কথা শুনে, অর্জুনের মোহ কেটেছিল; আমাদেরও সংসারের আবলা সেই ভাবেই কেটে যাবে।

এই প্রসঙ্গে এই গ্রন্থে মুদ্রিত শ্রীশ্রীহেমচন্দ্র পরিকল্পিত অভিজ্ঞানের (monogramএর) দিকে পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাঁর জীবদ্দশাতেই একটি ট্রাস্ট গঠন করে তাঁর বসতবাটিতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মন্দির স্থাপিত করেছেন। তাই অভিজ্ঞানটির পাদদেশে তাঁর সাধের এই মন্দিরের নাম অঙ্কিত। এই মন্দিরে যাঁরা পূর্বে এসেছেন, এখন রয়েছেন বা পরে আসবেন, সকলেরই সর্বদা সর্বত্র ঈশ্বর দর্শনের কথা স্মরণে থাকুক, এই অভিপ্রায়ে অভিজ্ঞানটির শিরোভাগে "ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্" অঙ্কিত আছে। এর উপায়টির কথা শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম এবং বাঁশী চিহ্ন দিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই গ্রন্থের "শ্রীগুরু" শীর্ষক প্রবন্ধে বোঝান হয়েছে যে স্বয়ং বিষ্ণুই শ্রীগুরুরূপে ভক্ত শিষ্যের নিকটে আবির্ভূত হন। এসেই প্রথমে শঙ্খ বাজিয়ে অভয় ও উৎসাহ দেন। পরে বলেন, "ওরে ভয় কি? এই যে আমি তোর জন্যেই এসেছি। এই যে সংসার চক্রে কাটা পড়ার আতঙ্কে ত্রস্ত হচ্ছিস, এযে আমারই চক্র। তাতে কাটা পড়বি কেন? সংসারের গদা নয় রে, আমারই হাতের গদা। সুতরাং ভয় কিসের? বাবা কি ছেলেকে মেরে ফেলবার জন্য মারেন? অন্য উদ্দেশ্য আছেই আছে। তুই বুঝিস বা না বুঝিস। আর এই যে পদ্ম অর্থাৎ পঙ্কজ দেখছিস, এটি তোর কামনা বাসনার পঙ্কোদ্ভূত মন। এটি আমাকে দিলে আমার হাতের শোভা হবে।" এই সব অদ্ভুত কথার ধারণা হয় তাঁর বাঁশীর অদ্ভুত আকর্ষণে। এই অলৌকিক আকর্ষণের বিচিত্র কাহিনী শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে; শ্রীশ্রীঠাকুরও বলেছেন তিনি শুধু রাম নন, তিনি কৃষ্ণও। তিনি কি এতে করে তাঁর আকর্ষণের দিকটার কথাই বলতে চেয়েছেন? অন্য প্রসঙ্গেও শ্রীশ্রীহেমচন্দ্র এই অভিজ্ঞানে অঙ্কিত বাঁশির বিষয়ে বলেছেন, "শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগুরু, আর শ্রীরাধা প্রিয় শিষ্য। রাধাকৃষ্ণের বংশীশিক্ষা মানে শ্রীগুরুর শিষ্যকে অদ্বৈত শিক্ষাদান। বাঁশি অদ্বৈত-জ্ঞানের প্রতীক। শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখের হাওয়া, বাইরের হাওয়া, সবই হাওয়া, একাকার। শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখের হাওয়ার কম্পনই সর্বত্র সঞ্চারিত হচ্ছে। যখন শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর লীলা-চঞ্চল অঙ্গুলি

দ্বারা বাঁশীর ছিদ্রপথ বন্ধ না করছেন, তখন একটাই সুর ধ্বনিত হচ্ছে। আবার লীলা বিস্তারেব সময়ে সেই একই বহু হচ্ছে।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরেব প্রতিষ্ঠাতা "ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্" শীর্ষক এই অভিজ্ঞানেব দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন যে শ্রীগুরুর আকর্ষণে শ্রীগুরুকে ঈশ্বরবোধ কবতে পারলে, সংসারেব এই মাযারূপ আব থাকবে না, অদ্বৈতজ্ঞানের উদয় হবে।

অদ্বৈত উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত যে সর্ব সন্দেহ, সর্ব সংশয় মেটে না, একথা শ্রীশ্রীহেমচন্দ্র বহু প্রসঙ্গে বলেছেন। "জন্মমৃত্যু" শীর্ষক প্রবন্ধেও উল্লিখিত হয়েছে যে অদ্বৈতানুভূতি না হওযা পর্যন্ত জন্মমৃত্যুর রহস্যভেদ হয় না। যেমন জ্ঞানের পথে, তেমনই ভক্তির পথে। "কর্মফল ও সমর্পণ রহস্য" প্রবন্ধে বুঝিয়েছেন যে সর্বার্পণ না হলে সর্ব প্রাপ্তি হতে পাবে না। এবং এও বুঝিয়েছেন যে অন্য কিছুই নাই, শুধু ঈশ্বরই আছেন, এটি না জানা পর্যন্ত অনন্যাভক্তিব উদয় হয় না। "ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্", এই জ্ঞান পরম জ্ঞান ; এই বোধ পরম বোধ ; এই মন্ত্র পরম মন্ত্র ; এই বিদ্যা পরমা বিদ্যা।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন বলতেন, "আগে কালী দর্শন কব্; পবে দান ধ্যান করিস বা না কবিস", শ্রীশ্রীহেমচন্দ্রও তেমনি পরম বা পারমার্থিক বিদ্যা অর্জনের পূর্বে "বিদ্যাব আমি"ব কাজ করা পছন্দ করতেন না। "বিদ্যাব আমি"র কাজ ব্যবহারিক হিসাবে প্রয়োজনীয় হলেও, যদি সে সব কাজ বিদ্যা অর্জনের জন্য না হয় তবে তিনি সেগুলি পারমার্থিক হিসাবে হানিকর বলেই মনে করতেন। একবার বলেছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরেব প্রথম সন্ন্যাসী শিষ্য নারায়ণ শাস্ত্রীব "বিদ্যার আমি"র কাজ কিছু দেখা না গেলেও, তাঁব তীব্র ত্যাগ, কঠোব তপস্যা, প্রগাঢ় শাস্ত্র জ্ঞান এবং অপূর্ব গুরুভক্তি সকলের অলক্ষ্যে অচিন্ত্যভাবে প্রভাব বিস্তার করেছেই। "বিদ্যার আমি"র কাজ বড নয়, বিদ্যাই বড়।

এই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি শহরের গোলমাল থেকে দূরে নির্জন পরিবেশে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য আর একটি ট্রাস্ট গঠন

করেছিলেন। তাঁর সেই শুভ পরিকল্পনা অনুযায়ী কলকেতা থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে ফলতায় গঙ্গাতীরে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমন্দির" নামে একটি আশ্রম সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন ভাবে তাঁর সন্তানদের পূজার্চনা, ধ্যানজপ, পাঠপ্রসঙ্গ, স্তবকীর্তনে সর্বদা ব্যাপৃত রাখতে চাইতেন, শ্রীশ্রীহেমচন্দ্রও সেইরূপ প্রেরণাই তাঁর আশ্রিতদের দিতেন। সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমন্দিরের আশ্রমবাসীরা সাধ্যমত শ্রীভগবানে আত্মনিয়োগে কৃত-সঙ্কল্প। কিন্তু "ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্" তাঁদের কাছে প্রতিভাত হওয়া শ্রীভগবানের কৃপাসাপেক্ষ।

সত্যই এটি তো সামান্য ব্যাপার নয়। সে কথা স্মরণ মাত্রেই সঞ্জয়ের পুনঃ পুনঃ রোমহর্ষণ হচ্ছে। তাই বলি, "ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্" এটি যেন আবৃত্তি করবার মন্ত্র হিসাবে অভ্যাসগত জড়তার সঙ্গে উচ্চারিত না হয়। এটি প্রথার জিনিস না হয়ে যেন প্রাণের জিনিস হয়।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীহেমচন্দ্র বিরচিত একটি কবিতার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হল :—

"যবন চণ্ডাল হিন্দু,
আত্মীয় পরম বন্ধু,
রঙ্গভরা বিশ্বালয়ে হেরে ভগবান।
সার্থক জনম তার ধন্য সে মহান্॥
হৃদি মাঝে বয় সদা সিন্ধুর তুফান।

* * *

পর ভাব নাহি তার,
মিষ্ট স্নিগ্ধ ব্যবহার,
টুটইতে নাহি টুটে মৃণাল যেমন।
আত্মবিসর্জনে পায় আত্মারি সন্ধান॥

———o———

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির, ভবানীপুর, কলিকাতা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমন্দির, ফলতা (২৪ পরগণা)

শ্রীশ্রীহেমচন্দ্র নাথ

স্মৃতি-কথা

সূচনা

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥

দেখিতে পাওয়া যায়,—উদ্ভিদ-জগতে প্রাণের স্পন্দন আছে, কিন্তু ভাষা নাই—বৃদ্ধি আছে, কিন্তু গতি নাই ; উদ্ভিদ প্রাণ থাকিতেও মূক, বৃদ্ধি থাকিতেও পঙ্গু। ইহার পর প্রাণীজগতে—কীট-পতঙ্গের ক্ষেত্রে, ভাষা অস্ফুট,গতির বিকাশ স্বল্প।.তাহার পর—পশুপক্ষী। ভাষা কিঞ্চিদধিক-অর্থব্যঞ্জক শব্দ মাত্র, গতি অধিকতর, কিন্তু একদেশী। হস্তী মন্থরগতি, অশ্ব দ্রুতগামী , পক্ষী শূন্যে যদৃচ্ছা উড়িয়া বেড়ায় কিন্তু মাটিতে চলিতে অনভ্যস্ত। তাহার পর মানুষের ক্ষেত্রে—ভাষা সুপরিস্ফুট, সমধিক ভাব-ব্যঞ্জক, গতি সুদূর-প্রসারী, সুনিয়ন্ত্রিত। কিন্তু মানুষ যাহা ভাবে, ভাষায় তাহা সম্যক্ প্রকাশ করিতে পারে না। যাহা তাহার বুদ্ধিতে নাই, উহা সে ধারণা করিতে অক্ষম। তাহার গতিও তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তির উপরেই নির্ভর করে। বস্তুতঃ তাহার ভাষা তাহার বুদ্ধির গণ্ডি অতিক্রম করিতে পারে না। তাহার গতি দেহের ও মনের ধর্মের দ্বারা সীমাবদ্ধ। মানুষ হইয়াও মানুষের মূকত্ব ঘোচে না, পঙ্গুত্ব থাকিয়াই যায়। যাঁহার কৃপা-শক্তি প্রভাবে মানুষের এই মূকত্ব ঘুচিয়া যায়—এই পঙ্গুত্বের অবসান হয়, উপরোক্ত শ্লোকে তাঁহাকে পরমানন্দ মাধব বলিয়া অভিহিত করা হইতেছে। বৈষ্ণবেরা বলেন—নাম ও নামী অভেদ ; তিনি ও তাঁহার কৃপা-শক্তি অভেদ। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়—অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি অভিন্ন , সমুদ্র হইতে তরঙ্গকে পৃথক করা যায় না ; সাপ ও তাহার তির্যক গতির পৃথক অস্তিত্ব নাই। অতএব বলিতে পারা যায়, যেখানেই এই পরমানন্দের প্রকাশ সেইখানেই ঈশ্বরের বা তাঁহার কৃপা-শক্তির প্রকাশ এবং এই প্রকাশের ফলেই এই অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হয়।

আনন্দ যখন স্ব-প্রকাশ—কার্যকারণ সম্পর্কশূন্য তখনই উহা পরমানন্দ, অন্যথায় উহা বিষয়ানন্দেরই নামান্তর মাত্র। ঈশ্বর স্ব-তন্ত্র, নিজের আনন্দেই নিজেকে সৃষ্টি করেন, অভিব্যক্ত করেন, প্রকাশিত করেন। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি (১) নিবিড় ঝোপ-জঙ্গলে যেখানে সূর্যালোকেরও অবাধ প্রবেশাধিকার নাই, সেইখানে লতাপাতার ঘন আবেষ্টনের মাঝে ঐ যে ফুটিয়া আছে একটি অপরূপ ফুল। কী তাহার কারুকার্য! কী বর্ণ বৈচিত্র্য! কিন্তু এই নিভৃতে এত সাজগোজ কেন? কাহার জন্য? বলিতে গেলে বলিতে হয়,—কাহারও জন্য নয়। ফুল নিজের প্রকাশের আনন্দেই প্রকাশিত হয়,—তোমার আমার ভাল-লাগার অপেক্ষায় নয়। তোমার আমার অজ্ঞাতসারেই কোথায় কত ফুল ফুটিতেছে, কত ফুল ঝরিয়া যাইতেছে, কে তাহার খবর রাখে? ফুলে ফুলে যে মধুর সঞ্চার হয়, উহা মধুলুব্ধ ভ্রমরের অপেক্ষায় নয়। উহা ফুলের ধর্ম, ফুলের স্বভাব, ফুলের স্বাভাবিক পরিণতি। মধুপান করিয়া ভ্রমর কৃতার্থ হয়, কিন্তু ফুলকে সে কৃতার্থ করে না। তাহা যদি করিত, তবে ফুলের এই যে প্রস্ফুটন উহা ফুলের পক্ষে স্বাভাবিক হইত না, আন্তরিক হইত না, অপার্থিব হইত না। তাহার প্রতি মানুষের হৃদয়ের পূজা লোপ পাইত, মানুষের অন্তরের সহিত তাহার যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। সকল পার্থিব বস্তু, সকল পার্থিব ব্যক্তির ন্যায় তাহাকে অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত—নিজের সহজানন্দ, নিজের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ লোপ পাইয়া যাইত। হউক তাহার দান অল্প, হউক তাহার জীবন ক্ষণস্থায়ী,—তবুও জগৎকে তাহার যাহা দিবার আছে, উহাই তাহার বৈশিষ্ট্য, উহাই তাহার সত্যকারের দান; উহা দ্বারাই সে পূর্ণ, সে সুন্দর, সে অতুলনীয়। পুষ্পকে হীরা-জহরতের সাথে তুলনা করিলে তাহার অমর্যাদাই করা হয়—আমাদের সৌন্দর্যবোধেরই অভাব প্রমাণিত হয়; আমাদের অতিমাত্রায় সাংসারিকতার দৃষ্টান্তস্থল হইয়া দাঁড়ায়। অপরপক্ষে

(১) তিনি আনন্দরূপ এবং অবিনশ্বররূপে প্রকাশমান।—মুণ্ডক, ২।২।৭

যদি জুঁই ফুলেব সাথে গোলাপেব তুলনা করি, সূর্যমুখীব সাথে রজনীগন্ধাব তুলনা দিই, তবে উহা আমাদেব একদেশদর্শিতারই প্রমাণ—আমাদেব ঘণ্টাকর্ণত্বেরই নিদর্শন। একটি ছোট্ট জুঁই ফুলও আমরা সৃষ্টি কবিতে পাবি না, সেইরূপ একটি সুন্দব গোলাপ সৃষ্টিও আমাদের আযত্তেব বাহিরে। নাসিকা রুদ্ধ করিয়া না রাখিলে উভয়ই আমাদিগকে সুগন্ধ বিতবণ কবে,—নযন আবৃত করিয়া না রাখিলে উভয়ই আমাদের নযনানন্দেব কারণ হয়। যাঁহাব কথা আজ আমবা বলিতে যাইতেছি, তিনি যেমন বলিতেন, "পিঁপড়েব কাজ হাতীকে দিযে হয় না। সরাটাও পূর্ণ আবাব জালাটাও পূর্ণ।" মাধুর্যেব দিক দিয়া দেখিলে, একটি জুঁই ফুল আর অকটি গোলাপ ফুলে বাস্তবিকই কোন তফাৎ নাই। পূর্ণত্বেব দিক দিয়া দেখিলে একটি পূর্ণ সরা ও একটি পূর্ণ জালা একই। কিন্তু তাই বলিয়া শক্তির তারতম্য অস্বীকাব করা যায় না, ব্যবহারিক ভাব উড়াইয়া দেওয়া চলে না। তবে ইহাকে —এই ব্যবহারিক ভাবকে, এই ছোট বড ভাবকে, নিতান্ত একান্ত করিযা তুলিলে আমাদের ভেদবুদ্ধি প্রবল হইয়া উঠে—সর্বত্র ঈশ্বরেব আনন্দময় প্রকাশ আমাদিগেব নিকট অবলুপ্ত হইয়া যায়। আমবা চক্ষুর সম্মুখে দেওয়াল তুলিয়া ঈশ্ববেব অবাধ আলোক, নিত্য প্রবহমান বাতাসেব প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিই। গৃহেব আবহাওয়া অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে; আধ্যাত্মিক জীবন খর্ব, ক্লিষ্ট হইয়া যায়। জীবন-নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধ হইয়া আসে—দল বাঁধিতে থাকে। যৌবন-যমুনা কালিয়দহে পরিণত হয়—অঘাসুব, বকাসুরের দৌরাত্ম্য বাড়িয়া যায়—প্রাণ রাখিতে প্রাণান্ত হইয়া দাঁডায। ফুলের শোভা দেখিতে গেলে তাহাকে গাছে গাছে সহজ ভাবে ফুটিতে দাও, তাহাকে তুলিয়া আনিয়া সযত্নে পুষ্পাধাবে স্থাপন কবিও না। উহাতে সাময়িক ভাবে তোমাব গৃহের শোভা-বর্ধন হইতে পারে, কিন্তু চিরদিনের মত প্রকৃতির সহিত আনন্দের যোগসূত্র ছিন্ন হইযা যায়। সোনার খাঁচায় যত্ন-পালিত কোকিলেব কুহুরবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অকাল-বসন্তের কল্পনা করা, আব বনে বনে বসন্ত সমীরণে স্বচ্ছন্দ-

বিহারী কোকিলের কুহুস্বরে মন প্রাণ ঢালিয়া দেওয়া কি এক কথা ?

তাই, আজ আমরা যাঁহার কথা বলিতে যাইতেছি তাঁহাকে দেখিতে চাই তাঁহার সেই সহজ ও স্বাভাবিক আনন্দের মধ্যে—তাঁহার সেই সহজ ও স্বাভাবিক ভাবাবেশের মধ্যে—তাঁহার সেই সহজ ও স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে। রূপকথার স্বর্ণকমল চিরদিনের মত বিস্ময়োৎপাদনকারী হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু ঐ যে আমাদের দীঘির কালো জল আলো করিয়া পঙ্কের অঙ্ক হইতে যে পদ্মটি অর্ধ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, সেটি যেন নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতর আসিয়া নিতান্ত আপনার হইয়া আমাদের কাছে ধরা দিয়াছে—সহজ, সরল ভাবে তাহাকে স্পর্শ করিবার, তাহাকে আঘ্রাণ করিবার অধিকার দিয়াছে—তাহাকে লইয়া আনন্দ করিবার, দেবতার পায়ে উৎসর্গ করিবার সুযোগ দিয়াছে। হয়তো তাহার পরমায়ু অল্প, কিন্তু তাহার সুখস্মৃতি আমাদের মনে চিরস্থায়ী। সোনার কমলে দেবতার অধিকার, কুবেরের ভাণ্ডারে তাহার স্থান, কিন্তু মর্ত্যের পঙ্কে যে কমল ফোটে তাহাতে সকলেরই অধিকার। সকল হৃদয়-দ্বারই উহার জন্য উন্মুক্ত।

আমাদের জনৈক ভক্ত-বন্ধু প্রকারান্তরে হেমচন্দ্রের চরিত্র বর্ণনা করিতে গিয়া একস্থলে লিখিয়াছেন :—

"একখানি সাদা কাগজের উপর দুই রকম উপায়ে মানুষের ছবি আঁকা যায়। প্রথমতঃ—সাদা কাগজের উপর ঠিক মনুষ্যাকৃতি একটা জায়গায় তুলি দিয়ে কালি লেপে দিলে মানুষের ছবি আঁকা হল। দ্বিতীয়তঃ—সাদা কাগজের উপর ঠিক মনুষ্যাকৃতি একটা জায়গা বাদ দিয়ে বাকী সর্বত্র কালি লেপে দিলেও মানুষের ছবি আঁকা হল। প্রথম ছবি, মায়ামুগ্ধ সাধারণ মানুষের—মায়ার প্রতীক কালি মানুষকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। দ্বিতীয় ছবিটি মানুষের ছবি হলেও, এটি বস্তুতঃ মায়া-কালির অভাব মাত্র—এই মনুষ্যাকৃতির যাঁকে আমরা প্রকৃতপক্ষে সাদা কাগজটাই দেখতে পাচ্ছি।"

উপমাটি চমৎকার সন্দেহ নাই। কিন্তু উভয় স্থলেই, এরূপ ছবি

আঁকিবার জন্য যে শিল্পনৈপুণ্যেব প্রযোজন, তাহা আমাদেব নাই। আর, প্রকৃত প্রস্তাবে, এ স্থলে হেমচন্দ্রেব জীবনালেখ্য রচনা করাও আমাদের উদ্দেশ্য বা সাধ্য নয। নিজস্ব কোন ভাব বা সিদ্ধান্ত অপরের মাথায় চাপাইয়া দেওয়াব বৃথা চেষ্টা কবাও আমাদেব অভিপ্রেত নয়। অতএব সংক্ষেপে হেমচন্দ্র-জীবনেব কতিপয় মাত্র ঘটনাব উল্লেখ এবং সেই প্রসঙ্গে আমাদেব মনোগত ভাবেব কিঞ্চিৎ আভাস দিযাই আমবা ক্ষান্ত হইব। যদি এই সামান্য সূত্র অবলম্বন করিয়া কাহাবও মনে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাব উদয হয়, এই অস্পষ্ট চলার-পথ ধরিয়া যদি কাহাবও অধিক দূব অগ্রসর হইবার বাসনা জাগে, তাহা হইলেই আমবা আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান কবিব।

হেমচন্দ্রের জীবন ঘটনাবহুল ছিল না। বাহ্য দৃষ্টিতে তাঁহাব জীবনে এমন কিছু চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে নাই বলিলেই চলে যাহা সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ কবিতে পারে। কিন্তু জীবনেব ঘটনাবলীই আধ্যাত্মিক জীবনেব তুলাদণ্ড হইতে পারে না। প্রকৃত আধ্যাত্মিকতাই আধ্যাত্মিক জীবনেব তুলাদণ্ড অথবা মেরুদণ্ড। অবশ্য ইহা স্বীকার্য যে এই আধ্যাত্মিকতা জীবনের ঘটনাবলীব মধ্য দিয়াই প্রকাশিত বা প্রচারিত হয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবন আলোচনা করিতে হইলে ভাবেব দিকেই লক্ষ্য এবং প্রাধান্য দিতে হইবে; ক্ষুদ্র বা বৃহৎ ঘটনাগুলিকে কেবলমাত্র ভাব প্রকাশক হিসাবে গণ্য কবিতে হইবে। অন্যথায় জানিত বা অজানিতভাবে আপন আপন বিষয়-সংস্কাব অনুযায়ী ঘটনাব প্রাধান্য আসিযা পড়িবেই—আমবা শিব গড়িতে হয়তো বানব গড়িযা বসিব। যদি আমরা খ্রীষ্টেব মানসিক অবস্থা বিস্মৃত হইয়া ক্রুশকাষ্ঠে দেহবিসর্জনই খ্রীষ্টত্বের একমাত্র নিদর্শন বলিযা মনে করি তবে উহা দ্বাবা নিশ্চযই খ্রীষ্টত্বেব অবমাননাই করা হইবে। ক্যান্সারের নিদারুণ কষ্ট উপেক্ষা কবিয়া আগন্তুক ভক্তদেব সহিত নিরন্তর বাক্যালাপ করিতে দেখিযা, যদি শ্রীরামকৃষ্ণেব স্বরূপ অবগত হইয়াছি বলিয়া মনে করিযা ফেলি; দিগ্বিজয়ী বাগ্মী "Hindu Monk of India"কে দেখিযাই যদি স্বামী বিবেকানন্দকে চিনিয়া

ফেলিয়াছি মনে করিয়া থাকি তবে উহা আমাদের চরম মূর্খতাই বলিতে হইবে। কাজেই অন্য সকল মহাপুরুষের ন্যায় হেমচন্দ্র-চরিত্র অনুধাবন করিতে হইলেও আমাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলীর সাহায্য লইতে হইবে, তত্ত্বানুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে উহাদিগকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে; ধৈর্য ও শ্রদ্ধার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। এইরূপ করিবার যোগ্যতা যে আমাদের আছে তাহা আমরা বলিতে চাই না, তবে যেরূপ ক্ষেত্রে যেরূপ হওয়া উচিত প্রসঙ্গক্রমে তাহারই আলোচনা করা হইল মাত্র। অবশ্য আমরা মনে করি তত্ত্বতঃ এ বিষয়ে কোন মতভেদ থাকা উচিত নহে।

এক্ষণে হেমচন্দ্রের জীবন-কথা আরম্ভ করিবার প্রাক্কালে দুই একটি কথার অলোচনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে মনে হয় না। কাহারও বিষয়ে কিছু বলিতে বা লিখিতে হইলে সাধারণ নিয়মে প্রথমেই বলিতে হয়—তিনি কবে, কোন্ শুভলগ্নে, কোন্ দেশে জন্মিয়াছিলেন; বাল্যে কোন্ পিতামাতার ক্রোড় আলোকিত করিয়াছিলেন; যৌবনে কাহাকে ধর্মপত্নীরূপে লাভ করিয়াছিলেন ইত্যাদি। আমাদের মনে হয়, সর্বক্ষেত্রেই এ নিয়ম আমাদের নিয়ামক হওয়া উচিত নহে। মহাপুরুষগণ তাঁহাদের শুভ সংস্কার লইয়া যেদিনই ধরাধামে জন্ম-পরিগ্রহ করেন, যে মুহূর্ত তাঁহাদের জন্মলগ্ন, উহাই শুভ, মঙ্গলপ্রদ। মাস, বার বা তিথি-নক্ষত্রের প্রভাবে তাঁহাদের চরিত্র গঠন হয় না, জন্ম সার্থক হয় না, বরং তাঁহাদের পুণ্যাবির্ভাবে সেই বারটিই ধন্য হয়, সেই লগ্নটিই শুভ হয়, সেই দেশটিই পবিত্র হয়। কে ছিলেন তাঁহার পিতা, কে ছিলেন তাঁহার মাতা, উহাই কোনও মহাপুরুষের মহাপুরুষত্বের কারণ নয়। কৃষ্ণকে ক্রোড়ে ধরিয়াই মা যশোদা, যশোদা; কৃষ্ণকে স্তন দান করিয়াই তিনি যশোদা; কৃষ্ণকে যশ দান করিয়া নয়। সেইরূপ কোন মহাপুরুষ বিবাহিত ছিলেন কি না; থাকিলে, কে তাঁহার পত্নী ছিলেন—এ সকল প্রশ্নের উত্তরের উপরও তাঁহার মহাপুরুষত্ব নির্ভর করে না। সত্যকারের মহাপুরুষগণ স্থান কালের সীমা-রেখা দ্বারা আবদ্ধ নন, কোন অবস্থারই দাস নন।

কাজেই, কবে কখন কোথায় কাহার ঘরে তিনি জন্মিয়াছিলেন উহা অজানা থাকিলেও, তাঁহাদের মহাপুরুষত্বের হানি হয় না। তবুও মানুষের কৌতূহল চরিতার্থতার জন্য সে সকল কথার অবতারণা করিতেই হয়। আমরাও সংক্ষেপে উহা করিব।

জন্ম ও বাল্যজীবন

হেমচন্দ্রের পিতার নাম ছিল ভগবানচন্দ্র, মাতার নাম দয়াময়ী। হেমচন্দ্রের পিতার পূর্ব-পুরুষগণ রায়বেরিলী হইতে আসিয়া বাংলা দেশে, প্রথমে হুগলী জেলায়, পরে কলিকাতায় বসবাস করিতে থাকেন। হেমচন্দ্র, পিতামাতার একমাত্র সন্তান বলিলেই হয়—অন্য একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১২৮২ সাল, ৫ই বৈশাখ, শুক্লাত্রয়োদশী তিথি, রাত্রি ৫ দণ্ড ৫৮ পল সময়ে বৃশ্চিক লগ্নে হেমচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার জন্মকালীন অবয়ব এতই ক্ষুদ্র ছিল যে তাঁহার জীবন সম্বন্ধে সকলেই একরূপ হতাশ হইয়াছিলেন। যাহা হউক ক্রমে ক্রমে তাঁহার শরীর সবল ও সুদৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল এবং তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন। বাল্যকালে হেমচন্দ্র অন্য বালকের ন্যায়ই দুরন্ত ছিলেন এবং সেজন্য পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনকে সময়ে সময়ে নানা দৌরাত্ম্যও সহ্য করিতে হইত। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই তাঁহার চরিত্রের কতকগুলি গুণের বিশেষ প্রকাশ লক্ষিত হইত। সত্যবাদিতা, বন্ধুপ্রীতি, শারীরিক কষ্টসহিষ্ণুতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বহু দৃষ্টান্ত তাঁহার চরিত্রে আবাল্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার স্মরণশক্তিও অতীব প্রখর এবং হস্তাক্ষর বিশেষ সুন্দর ছিল। বন্ধুপ্রীতি সময়ে সময়ে তাঁহাকে গুরুতর বিপদে নিক্ষেপ করিয়াছে। সত্যবাদিতার জন্য কখন কখন তাঁহাকে বহুবিধ নির্যাতনও সহ্য করিতে হইয়াছে। প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার বাল্যকালের একটি ঘটনা এ স্থলে উল্লেখ করিলে মন্দ হইবে না। তখন হেমচন্দ্রের বয়স মাত্র সাত-আট বৎসর। মাতুল গোপালচন্দ্র চাকরি উপলক্ষে গোবরডাঙ্গায় বাসা করিয়া আছেন; হেমচন্দ্র মাতুলের নিকট বেড়াইতে গিয়াছেন।

অনতিদূরে জমিদারবাবুদের ফুলের বাগান। একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে বাগানে গিয়া উপস্থিত। সুন্দর সুন্দর গোলাপ ফুটিয়া আছে—দেখিয়া মনে বড় লোভ হইল। কাহাকেও কিছু না বলিয়া একটি গোলাপ ছিঁড়িয়া লইলেন। কিন্তু যেমনি ফুলটি ছিঁড়িয়া লইয়াছেন অমনি জমিদারবাবুর দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হইল। এরূপ ক্ষেত্রে অন্য কেহ হইলে হয়ত ভয়ে কাঁদিয়াই ফেলিত, না হয় ছুটিয়া পালাইবার চেষ্টা করিত। হেমচন্দ্র কিন্তু এতদুভয়ের কোনটিই না করিয়া শান্তভাবে জমিদার মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বলিতে পারেন এ বাগানের মালিক কে? ফুলগুলি দেখিয়া আমার বড ভাল লাগিয়াছিল; কিন্তু আমি মাত্র একটি ফুল লইয়াছি; বাবুদের কাছে চাহিলে নিশ্চয়ই আরও অনেক ফুল আমাকে দিতেন।" বলা বাহুল্য হেমচন্দ্রের এরূপ নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারে ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে জমিদার মহাশয় বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন এবং হেমচন্দ্রের মাতুল মহাশয়ের নিকট এই ব্যাপারের উল্লেখ করিয়া হেমচন্দ্রের উপস্থিত বুদ্ধির বিশেষ প্রশংসাও করিয়াছিলেন। পাঁচ-ছয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে সন্ধ্যাবেলা বিছানায় শুইয়া শুইয়া পিতার মুখে দুই-একবার মাত্র আবৃত্তি শুনিয়াই পাঠ মুখস্থ করিয়া ফেলিবার কথা হেমচন্দ্রের মুখে আমরা শুনিয়াছি এবং বৃদ্ধ বয়সেও শৈশবের পাঠ্যপুস্তকে লিখিত কবিতাগুলি তাঁহাকে অবিকল আবৃত্তি করিতে দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। কিরূপভাবে শৈশবেই হেমচন্দ্র তাঁহার পিতার তৎকালীন বহুল-প্রচলিত মদ্যপানের অভ্যাস পরিত্যাগ করাইবার কারণ হইয়াছিলেন ইহাও হেমচন্দ্রের বাল্যজীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভগবানচন্দ্র বাটীতে বসিয়াই মদ্যপান করিতেন। মদ খাইয়াও তিনি বিশেষ অপ্রকৃতিস্থ হইতেন না। একদিন যখন এইরূপে পিতার মদ্যপান চলিতেছিল, বালক হেমচন্দ্র পিতাকে ধরিয়া বসিলেন—তাঁহাকে একটু মদ খাইতে দিতেই হইবে। কিন্তু পিতা হইয়া কি করিয়া তিনি পুত্রকে মদের অংশ দিবেন? যাহা হউক, হেমচন্দ্র নিরস্ত হইলেন বটে, কিন্তু পিতাকে বলিলেন, বড় হইয়া তিনি নিজের পয়সা দিয়া মদ কিনিয়া খাইবেন।

পিতার মনে ভয় হইল। তিনি হেমচন্দ্রকে বিলক্ষণ জানিতেন—বালক হইলেও একবার কিছু করিব বলিলে, সে তাহা না করিয়া ছাড়ে না। সেইদিন হইতেই ভগবানচন্দ্রের মদ্যপান ত্যাগ হইল। এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া পত্নী দয়াময়ীকে তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমার ছেলে মুষলং কুলনাশনম্।" বস্তুতঃ পিতার এই উক্তি একদিক দিয়া সত্য হইয়াছিল—হেমচন্দ্রই তাঁহার বংশের শেষ বংশধর।

মাত্র সাত বৎসর বয়সে হেমচন্দ্রের পিতৃবিয়োগ হয়। তখন হইতেই নানা দুঃখকষ্ট, বিপদ-আপদের মধ্য দিয়া মাতা ও পুত্রের জীবন কাটিতে থাকে। ইচ্ছা ও আগ্রহ সত্বেও হেমচন্দ্রের বিদ্যাভ্যাস অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। কোনমতে দশম শ্রেণী (তখনকার ফার্স্ট ক্লাস) পর্যন্ত পৌঁছিয়াই তাঁহাকে পড়াশুনা ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। ইহার পর এখানে সেখানে আত্মীয়-স্বজনের আনুকূল্যে কোনরূপে দিন কাটিতে লাগিল। যৌবনের প্রারম্ভে অভিভাবকহীন হেমচন্দ্রকে কখন কখন কুসঙ্গে, বিপদেও পড়িতে হইয়াছিল এবং সে সকল কথা জানিতে পারিয়া সহায়-সম্বলহীন বালককে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট মাতাকে সময় সময় আকুল প্রার্থনা করিতেও দেখা যাইত। ঘটনা-পরম্পরা এবং পরবর্তী কালে হেমচন্দ্রের গুরুদেবের উক্তি হইতে দেখা যায় মাতার এই প্রার্থনা নিষ্ফল হয় নাই।

যৌবন

আমরা অতঃপর দেখিতে পাইব যৌবনের প্রারম্ভেই হেমচন্দ্রের মনে ঈশ্বরলাভের বাসনার উদয় হইয়াছিল। এজন্য এখন হইতেই তাঁহার জীবনের সকল ঘটনাবলীই স্বল্পাধিক ঐ ভাবের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতে দেখা যায়। এমন কি বিবাহ ব্যাপারেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কন্যার আত্মীয়গণের ধর্মপরায়ণতার কথা শুনিয়া উক্ত পরিবারে বিবাহ তাঁহার ঈশ্বরলাভের অনুকূল হইবে ভাবিয়াই যে তিনি বিবাহে সহজে সম্মত হইয়াছিলেন ইহা আমরা তাঁহার নিজমুখ হইতেই শুনিয়াছি।

ঈশ্বর সাধনার নীচেই হেমচন্দ্র সঙ্গীত সাধনার স্থান নির্দেশ করিতেন। সঙ্গীতে হেমচন্দ্রের বরাবরই বিশেষ প্রীতি ছিল ; যৌবনে, বিশেষতঃ গুরুসঙ্গ লাভ করিবার পূর্ব পর্যন্ত, তিনি সঙ্গীতাভ্যাসে বিশেষ উৎসাহী ও শ্রমশীল ছিলেন। পরিণত বয়সেও এ বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যাইত। যৌবন কালে ঈশ্বর সাধনায় বিঘ্ন হওয়ার অশঙ্কায় একবার সঙ্গীত সাধনা পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু মহাকবি ভক্তপ্রবর গিরিশচন্দ্রের আগ্রহাতিশয্যে সে সংকল্প কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। গ্রন্থ-পরিশিষ্টে তাঁহার স্বরচিত কয়েকখানি গান প্রদত্ত হইল।

নাট্যাভিনয়েও এইকালে হেমচন্দ্রের যথেষ্ট দক্ষতা ও অনুরাগ ছিল ; কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনাবলী রুচিবিরুদ্ধ হওয়ায় অনতিকাল মধ্যে তাঁহাকে এ সকল সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

চাকরি উপলক্ষে হেমচন্দ্রকে নানা অফিসে কাজ করিতে হইয়াছিল, নানা লোকের সঙ্গে মিশিতে হইয়াছিল। অফিসে তাঁহাকে যে সকল কাজ করিতে হইত উহাও অধিকাংশ স্থলেই নিতান্ত সাধারণ পর্যায়েরই ছিল। আয়ও মাসিক ১০৷১২ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত মাত্র ৫০৷৬০ টাকায় উঠিয়াছিল। দেখিতে পাওয়া যায়, কি চাকরিস্থলে, কি অন্যত্র, হেমচন্দ্র অতি সামান্য কাজকেও যথোপযুক্ত মর্যাদা দিতেন। লৌকিক ক্ষেত্রেও যাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করা উচিত কখনও উহার ব্যতিক্রম করিতে কেহ তাঁহাকে দেখে নাই। তাঁহাকে আমরা কতবারই না বলিতে শুনিয়াছি, "ছোট ছোট কাজে যার নজর, সেইই বড় বড় কাজ ঠিক ঠিক করতে পারে।" এত অভাব-অভিযোগের মধ্যেও তিনি কখনও আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই। অসৎ উপায়ে অর্থোপার্জনের চিন্তাও কখন তাঁহার মনে উদিত হয় নাই, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বরং এই অতি সামান্য আয় হইতেই তিনি কিছু কিছু ঈশ্বরোদ্দেশ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। তাঁহার এই আজীবনের সঞ্চয়কে ভিত্তি করিয়া যে সকল ধর্মপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে উহারা তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছারই বাহ্য রূপ বলিলেই চলে।

জগতের সকল শুভাশুভ কর্মের ফলই স্থূল অপেক্ষা সূক্ষ্মভাবে অধিক সুদূরপ্রসারী। কাজেই হেমচন্দ্রের এই শুভেচ্ছা ও শুভানুষ্ঠানের পরম ও চরম পরিণাম কি তাহা কে বলিতে পারে? হেমচন্দ্র বলিতেন, "নিঃস্বার্থ ভালবাসাই ভগবানের ভালবাসা বলিয়া জানিবে।" তিনি নিজে গুরুদেবের প্রাণঢালা নিঃস্বার্থ ভালবাসা পাইয়াছিলেন—তাঁহাকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসিয়াছিলেন। ভালবাসার মর্যাদা তিনি জানিতেন —তাই তাঁহার প্রতি কার্যে, প্রতি কথায় ভালবাসাই ছিল মূলমন্ত্র।

মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে সাত বৎসরের কন্যা শ্রীমতী সরোজিনীর সহিত হেমচন্দ্রের শুভপরিণয় সম্পন্ন হয়। পূর্ব হইতেই কন্যার পিতৃবংশীয়দিগের সহিত হেমচন্দ্র ও তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। উঁহারা ঘোষপাড়ার সতীমার সহজিয়া মন্ত্রের সাধক ছিলেন। কন্যার পিতামহ নবীনচন্দ্রের কিছু কিছু সিদ্ধাইও লাভ হইয়াছিল। এ সকল কারণে বিবাহে উভয় পক্ষেরই সানন্দ সম্মতি ছিল। শ্রীমতী সরোজিনী তেজস্বিনী, ধর্মপরায়ণা ও স্বামীগতপ্রাণা ছিলেন। তাঁহার ধর্মানুভূতি ও অলৌকিক কার্যকলাপের বিবরণও কিছু কিছু পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে হেমচন্দ্রের গুরুদেবের সহিত পরিচিত হইবার পরে গুরুদেব ইঁহাকে আপন কন্যার ন্যায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। অল্প বয়সেই সরোজিনী ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুর স্বল্পকাল পূর্বে এক রাত্রিতে তিনি স্বপ্নে দেখিতে পান, ঠাকুর তাঁহাকে লইতে আসিয়াছেন। একথা শুনিয়া হেমচন্দ্রের ধারণা হইল সরোজিনী আর এ জগতে বেশী দিন থাকিবেন না। তথাপি বিশ্বাসী হেমচন্দ্র, সমস্ত মায়া-মোহের ঊর্ধ্বে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে, দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "এখনই, এখনই, কোন আপত্তি নেই আমার; ঠাকুরের কাছে থাকবে, সুখে থাকবে—সেইই আমার সুখ।" বস্তুতঃ ইহার অল্পদিন পরেই সরোজিনী দেহত্যাগ করেন। যাঁহারা পরিণত বয়সে হেমচন্দ্রের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা দেখিয়াছেন হেমচন্দ্রের উপরোক্ত উক্তি তাঁহার সাময়িক মানসিক প্রতিক্রিয়া বা ভাবোচ্ছ্বাস মাত্র নহে। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, সত্য সত্যই তিনি তাহা বিশ্বাস

করিতেন এবং এই বিশ্বাসের ফলেই এরূপ সতীসাধ্বী স্ত্রীকে হারাইয়াও তাঁহাকে কেহ একদিনের জন্য শোক করিতে, এমন কি বিমর্ষ হইতেও দেখে নাই। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিবার বিষয় শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে হেমচন্দ্রের বিশ্বাস, সংসারে অনাসক্তি ও আত্মনির্ভরশীলতা। মনে রাখিতে হইবে, তাঁহার বয়স তখন সবে ত্রিশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, যাঁহাকে আজ তিনি এক কথায় হাসিমুখে চিরবিদায় দিতেছেন, দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া তিনিই ছিলেন তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারের একাধারে দাসী ও সর্বাধীশ্বরী। জুতার ফিতা বাঁধা হইতে আরম্ভ করিয়া স্বামীকে গরম লুচি খাওয়াইবেন বলিয়া দীর্ঘরাত্রি পর্যন্ত এই বালিকাবধূ কিভাবে একাকী উনুনের ধারে বসিয়া বসিয়া সময় কাটাইতেন তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল না। হেমচন্দ্রকে আমরা বরাবরই বলিতে শুনিয়াছি, "বিশ্বাসই দর্শন, বিশ্বাসই ভগবান।" বিশ্বাসের এই সুদৃঢ় অবলম্বন, এই দর্শনলাভ না হইলে মানুষ আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে না। তাঁহার এই ঔদাসীন্যকে নিষ্ঠুরতা মনে করিলে, এই নির্মমতাকে হৃদয়হীনতা মনে করিলে মহা ভুল করা হইবে। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি দেবী সরোজিনীর ব্যবহৃত বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি হেমচন্দ্র যাবজ্জীবন কি যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিতই না রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। তথাপি হেমচন্দ্র সংসার সম্বন্ধে বরাবর উদাসীনই ছিলেন।

পুত্রকে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া সংসারী করিবার মানসে মাতা দয়াময়ী প্রথম প্রথম অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের মনে কিন্তু পুনরায় দার পরিগ্রহের কল্পনা কখনও স্থান পায় নাই। তদুপরি তাঁহার ন্যায় দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া কোন কিছু করাইবার সাধ্য কাহারও ছিল না। কাজেই এ সকল প্রস্তাব অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া গেল।

পুত্রকে সংসার-বিমুখ দেখিয়া মাতা দয়াময়ী একদিন ব্যাকুল প্রাণে প্রার্থনা করিতেছেন—ছেলের সংসারে মন হউক। এই ব্যাপার অবলম্বন করিয়া গুরুদেবের সহিত সেইকালের একদিনের কথোপকথন

হইতে গুরুদেবের প্রতি হেমচন্দ্রের সুমধুর ভাবভক্তির সুমিষ্ট আভাস পাওয়া যায়। গুরুদেব শুইয়া আছেন। হেমচন্দ্রকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "এদিকে আয় তো।" হেমচন্দ্র নিকটে যাইতে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "হেম, তুই আজ ভগবান।" কি ব্যাপার? কৌতূহলী হইয়া সসঙ্কোচে উত্তর দিলেন হেমচন্দ্র—"সে কি কথা?" "না, না, তোকে আজ ভগবান হতেই হবে"—আবেগভবে বলিতে লাগিলেন গুরুদেব—"বিচার করতে হবে। ছেলে সংসারী হয় সেই কামনায় মা আজ ঠাকুরের কাছে হত্যা দিচ্ছে; আর ছেলে সংসার-বৈরাগ্যের জন্য ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করছে। বল, তুই ভগবান, কি করবি বল?" অধিক আর বলিতে হইল না। বুঝিলেন হেমচন্দ্র মর্মে মর্মে কোথাকার কথা হইতেছে। আরও বুঝিলেন, মুখ ফুটিয়া না বলিলেও মনের কথা গুরুদেবের অজ্ঞাত নাই। ভাবের আতিশয্যে কাঁদিয়া ফেলিলেন। "কাঁদলে হবে না, কি করবি বল", জোর করিয়া বলিলেন গুরুদেব। কিন্তু কি আছে আর বলিবার? কোন উত্তরই খুঁজিয়া পাইলেন না হেমচন্দ্র। অথবা বুঝি এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তরই চোখের জল,—মুখের ভাষা তো ভাসা ভাসা! তাই সেদিন নয়নজলে বয়ান ভাসাইয়াই শ্রীগুরুর প্রশ্নের উত্তর দিলেন ও সকল সমস্যার সমাধান করিলেন।

শ্রীমতী সরোজিনীর মৃত্যুর পরেও মাতা দয়াময়ী অনেক দিন পর্যন্ত জীবিতা ছিলেন। হেমচন্দ্র মাতাকে আমরণ যথোপযুক্ত সেবাশুশ্রূষা করিতে ত্রুটী করেন নাই। দেহত্যাগের পূর্বে মাতার নানা প্রকার দিব্য দর্শন ও দিব্য স্বপ্নাদি লাভ হইয়াছিল এবং পুত্রই এ সকলের নিমিত্ত-কারণ জানিয়া বৃদ্ধা পুত্রকে পরম শ্রদ্ধার সহিত প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

শ্রীগুরু লাভ

যৌবনের প্রারম্ভেই হেমচন্দ্রের মনে ঈশ্বর সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ উপস্থিত হয়। এ বিষয়ে পূর্বোক্ত ঘোষপাড়ার মতের সাধকগণের সহিত স্বল্পকালের জন্য তাঁহার আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল। অতঃপর

মাতা দয়াময়ীর আগ্রহে কুলগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণের আয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু কার্যতঃ উহা ঘটিয়া উঠে নাই। হেমচন্দ্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া গুরুদেব স্বীকার করিলেন যে তাঁহার ঈশ্বর দর্শন হয় নাই। ইহার পর তিনি আর হেমচন্দ্রকে দীক্ষাদান করিতে সম্মত হইলেন না। হেমচন্দ্রের বয়স তখন মাত্র কুড়ি বৎসর। এত অল্প বয়সে এরূপ প্রশ্ন করা সহজ কথা নয়। তৎকালে হেমচন্দ্রের মনে সত্যকারের আধ্যাত্মিক জীবনলাভের জন্য যে বাসনা উপস্থিত হইয়াছিল ইহা তাহারই নিদর্শন। এই ঘটনার পরে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়াই হেমচন্দ্র কয়েক স্থলে গুরুকরণ ও আধ্যাত্মিক জীবনগঠন উদ্দেশ্যে যাতায়াত করিতে থাকেন, কিন্তু কোথায়ও তৃপ্তি পাইলেন না। জীবনের যৎসামান্য তিক্ত অভিজ্ঞতাও এইকালে তাঁহার মনের উপর প্রবলভাবে ক্রিয়া করিতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল সংসারে যেন সকলেই তাঁহাকে ফাঁকি দিতেছে।

হেমচন্দ্রের মনের এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন বন্ধু কুমুদচন্দ্রের এক আত্মীয়ের গৃহে একখানি পোষ্টকার্ডে লেখা চিঠির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। মন লেখককে দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইল। অবশেষে স্থির হইল, পরদিনই বন্ধু সমভিব্যাহারে ইটালি শ্রীশ্রীঅর্চনালয়ে যাইয়া লেখকের দর্শনলাভ করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, এই লেখকই হেমচন্দ্রের গুরুদেব—মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যবর্গের অন্যতম।, প্রথম দর্শনের দিন কিন্তু যাহা আশা করা হইয়াছিল ঘটিল তাহার বিপরীত। প্রথমতঃ ঠাকুরের ছবিতে কাপড় পরান রহিয়াছে দেখিয়া হেমচন্দ্রের মনে হইল,—"এ এক মন্দ বুজরুকি নয়।" দ্বিতীয়তঃ হেমচন্দ্র ভবানীপুর হইতে আসিতেছেন শুনিয়া গুরুদেব যখন বলিলেন,—"মা নিজে কিছু করতে পারলেন না বুঝি,—আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।" তখন হেমচন্দ্র আরও বীতশ্রদ্ধ হইলেন, ভাবিলেন,—"এ তো আর এক বুজরুকি। ইনি যেন মাকে সব জানেন—মায়ের সঙ্গে যেন এঁর কত আলাপ-পরিচয়।" এর পর যখন অন্য লোকের সঙ্গে গুরুদেব বেদান্তের

আলোচনা করিতেছিলেন তখন অবশ্য সে সব কথা হেমচন্দ্রের ভালই লাগিতেছিল। কিন্তু পরে যখন গুরুদেব স্বয়ং তামাক খাইয়া তাঁহাকেও খাইতে বলিলেন তখন গুরুদেবের হুঁকায় না খাইয়া অন্যের ব্যবহৃত হুঁকায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও তামাক টানিয়া হেমচন্দ্র নিতান্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া চলিয়া আসাটা অশোভন হইবে ভাবিয়া পূজা-আরতি শেষ না হওয়া পর্যন্ত একরূপ বাধ্য হইয়াই অপেক্ষা করিতে হইল। আরতির সময় ছোট ছোট ছেলেদিগকে সুমিষ্ট কণ্ঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের নামগান করিতে শুনিয়া এবং তৎকালীন নিজ মনের অবস্থা ভাবিয়া হেমচন্দ্রের মনে বিলক্ষণ খেদ উপস্থিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই যখন গুরুদেব তাঁহাকে আরও একটু দেরী করিয়া "কথকতা" শুনিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন তখন হেমচন্দ্র তাহাতে স্বীকৃত হইতে পারিলেন না; বলিলেন, "কথকতা আমি অনেক শুনেছি; এমন কেঁদেছি যে কথক ঠাকুরকে কথা বন্ধ করে এসে আমার কান্না থামাতে হয়েছে—কিন্তু তাতেও কিছু হয় নি।" কাজেই গুরুদেব আর কোন আপত্তি না করিয়া বন্ধু কুমুদচন্দ্রকে তাঁহার সহিত যাইতে বলিলেন। বাড়ী ফিরিবার পথে কুমুদবাবু ভাবিয়াছিলেন হেমচন্দ্র নিশ্চয়ই তাঁহার গুরুদেবের সঙ্গ খুবই ভাল লাগিয়াছে একরূপ কিছু বলিবেন। কিন্তু হেমচন্দ্রের অপ্রত্যাশিত উত্তর তাঁহার মনে সেদিন আনন্দের পরিবর্তে নিরানন্দেরই সঞ্চার করিয়াছিল।

পরদিবস কিন্তু সারাদিন ধরিয়াই থাকিয়া থাকিয়া হেমচন্দ্রের মনে ইটালি যাইবার প্রবল বাসনার উদয় হইতে লাগিল, কিন্তু অভিমানের বাঁধ তখনও "আঁখি-নীর স্রোতে" ভাসিয়া যায় নাই, কাজেই উহা তাহার গতিরোধ করিয়াই রহিল। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া হেমচন্দ্র বলিতেন, "মনে হচ্ছিল যেন বুকের ভেতর বিড়াল আঁচড়াচ্ছে।" যাহা হউক ঠিক করিয়া রাখিলেন, গুরুদেব ডাকিয়া পাঠাইলে তবে যাইবেন। রাত্রিতে সত্যসত্যই ডাক আসিল গুরুদেবের,—বন্ধু কুমুদচন্দ্রের মারফৎ এবং তাহার পর হইতেই শ্রীগুরুসকাশে গমনাগমন

আরম্ভ হইল। সময় নাই, অসময় নাই—বাড়ীতে পুরুষ লোক বলিতে একা—কোনওদিন বা বাজারের পয়সা কোমরে করিয়াই গুরুদেবের কাছে হাজির; সে দিন আর বাজার হইল না। মাতাকে বলিয়া গেলেন, "খাও আলুভাতে আর অড়হর ডাল—যা আছে ঘরে; রোজ রোজ করতে পারব না আমি বাজার।" স্ত্রীও শুনিলেন সেকথা আড়াল হইতে। যাহা হউক ছেলে তো বটে। নাওয়া খাওয়ার ঠিক নাই; কোন দিন সন্ধ্যায়, কোন দিন বা রাত্রি-দুপুরে ফেরে বাড়ীতে, কোন দিন বা ভোরই হইয়া যায়। রাগ করিয়া বলিলেন একদিন দয়াময়ী,—"এটা কি হোটেলখানা পেয়েছ?" "তা নয়তো কি? তোমার মত মা আমার আগে আগে কত হয়েছে, গেছে", কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া রঙ্গ করিয়া বলিলেন মাকে হেমচন্দ্র। আবার কখনও অন্য সুরে বলেন, "দেখ মা, অন্যের সাথে ঝগড়া করতে গেলে সে তো মারবে, তুমি মা তা তো পারবে না।" অনেকস্থলে মাকে উপলক্ষ করিয়া মহামায়াকেই নিবেদন করিতেন হেমচন্দ্র তাঁহার প্রাণের কথা—কখনও রঙ্গ পরিহাস ছলে, কখনও বা ধীর স্থির গম্ভীর ভাবে।

যাহা হউক আবার আমরা পূর্বকথায় ফিরিয়া যাই। এত কথা তো শোনেন কিন্তু ধারণা হয় না কেন সে সকলের? বলিলেন একদিন গুরুদেব, "তোর মনের কথা সব খুলে বলতো?" "আমি এমন ডাক্তারের কাছে রোগ সারাতে চাইনে যিনি রোগের লক্ষণ দেখে নিজে বুঝে ওষুধ দিতে না পারেন।"—ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিলেন হেমচন্দ্র। এ উত্তরে সাধারণ লোকের মুখ বন্ধ হইয়া যায়। তাহা তো বটেই। ইহা যিনি না পারেন তিনি কেমন ডাক্তার? তিনি কেমন গুরু? কিন্তু হেমচন্দ্রের গুরুদেব সাধারণ পর্যায়ের লোক ছিলেন না। তত্ত্বদর্শী গুরুদেবের নিকট হেমচন্দ্রের কাঁচা মনের ফাঁকি ধরা পড়িতে বিলম্ব হইল না। এতটুকুও বিচলিত না হইয়া শিষ্যের মুখের উপরই জবাব দিলেন গুরুদেব,"ডুবে ডুবে জল খেলে শিবের বাবাও ধরতে পারে না। যদি আমাকে সব কথা খুলেই বলতে না পার, তবে এখানে এসেছ কেন?" ইহার পর আবার হাসি ঠাট্টার কথা উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই

গুরুদেব নিজ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—"চিল শকুন খুব উঁচুতে ওঠে, কিন্তু তাদের নজর থাকে গো-ভাগাড়ের দিকে।" হেমচন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন। ঠিক সেই সময়েই তাঁহার মনে হইতেছিল—তাঁহার খুড়িমা তাঁহাকে এত স্নেহ করেন; নিঃসন্তানা বিধবা, নিশ্চয়ই তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি তাঁহাকেই দিয়া যাইবেন। কথা সেইদিন আর বেশী দূর অগ্রসর হইল না বটে, কিন্তু হেমচন্দ্রের মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল—গুরুদেব অন্তর্যামী। আর ইহা কল্পনা করাও কঠিন নয় যে সেইদিন শ্রীগুরুর আলোক সম্পাতে আপনার অন্তরের গুপ্ত কালিমা-রেখা দেখিতে পাইয়া হেমচন্দ্র লজ্জায় অধোবদন হইয়াছিলেন, নিজেকে ধিক্কার দিয়াছিলেন; এবং ইহার পর হইতে বোধহয় জীবনে আর কখনও শ্রীগুরুদেবের কথার প্রতিবাদ করেন নাই।

এই প্রসঙ্গে পুনরায় বলিয়া রাখিতে চাই—অতিমানুষ হিসাবে হেমচন্দ্রের চরিত্র বর্ণনা করিতে আমরা প্রয়াসী হই নাই; সে ক্ষমতাও আমাদের নাই। অপরপক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়, মানুষ হইয়া জন্মিয়া সকল মহাপুরুষই মানুষের ন্যায় আচরণ করেন। সকলকেই কমবেশী আলো-অন্ধকারের মধ্য দিয়াই আপন আপন লক্ষ্যে পৌঁছিতে হয়। ইহাতে তাঁহাদের মহাপুরুষত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না। বরং তাঁহাদের ঈদৃশ আচরণ ইতর সাধারণের পক্ষে পরম আশাপ্রদ ও শিক্ষাস্থল হইয়াই দাঁড়ায়। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গকার শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ লীলাপ্রসঙ্গের একস্থলে যাহা লিখিয়াছেন উহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

"নরদেহ ধারণ করিয়া নরবৎ লীলায় অবতার পুরুষদিগকে আমাদিগের ন্যায় অনেকাংশে দৃষ্টিহীনতা, অল্পজ্ঞতা প্রভৃতি অনুভব করিতে হয়। আমাদিগের ন্যায় উদ্যম করিয়া তাঁহাদিগকে ঐ সকলের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার পথ আবিষ্কার করিতে হয় এবং যতদিন না ঐ পথ আবিষ্কৃত হয় ততদিন তাঁহাদিগের অন্তরে নিজ দৈবস্বরূপের আভাস কখনও কখনও অল্পক্ষণের জন্য উদিত হইলেও উহা আবার প্রচ্ছন্ন

হইয়া পড়ে। এইরূপে "বহুজনহিতায়" মায়ার আবরণ স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহাদিগকে আমাদিগেরই ন্যায় আলোক-আঁধারের রাজ্যের ভিতর পথ হাতড়াইতে হয়। তবে স্বার্থসুখ চেষ্টার লেশমাত্র তাঁহাদিগের ভিতরে না থাকায় তাঁহারা জীবন-পথে আমাদিগের অপেক্ষা অধিক আলোক দেখিতে পান এবং আভ্যন্তরীণ সমগ্র শক্তি সহজেই একমুখী করিয়া অচিরেই জীবন-সমস্যার সামাধান করতঃ লোককল্যাণ সাধনে নিযুক্ত হন।

"নরের অসম্পূর্ণতা যথাযথভাবে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন বলিয়া দেব-মানব ঠাকুরের মানবভাবের আলোচনায় আমাদিগের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয় এবং ঐজন্যই আমরা তাঁহার মানব ভাবসকল সর্বদা পুরোবর্তী রাখিয়া তাঁহার দেবভাবের আলোচনা করিতে পাঠককে অনুরোধ করি। আমাদের মতন একজন বলিয়া তাঁহাকে না ভাবিলে, তাঁহার সাধন কালের অলৌকিক উদ্যম ও চেষ্টাদির কোন অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। মনে হইবে যিনি নিত্যপূর্ণ তাঁহার আবার সত্যলাভের জন্য চেষ্টা কেন? মনে হইবে তাঁহার জীবনপাতী চেষ্টাটা একটা লোকদেখান ব্যাপার মাত্র। শুধু তাহাই নহে, ঈশ্বরলাভের জন্য উচ্চাদর্শসমূহ নিজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহার উদ্যম, নিষ্ঠা ও ত্যাগ আমাদিগকে ঐরূপ করিতে উৎসাহিত না করিয়া হৃদয় বিষম উদাসীনতায় পূর্ণ করিবে এবং ইহজীবনে আমাদিগের আর জড়ত্বের অপনোদন হইবে না।"

অভ্যাসযোগ

আর একদিনের কথা। হেমচন্দ্র আফিসের ছুটির পরেই নিত্য-নিয়মিত গুরুদেবের নিকট গমনাগমন করেন। একদিন গুরুদেব বলিলেন, "রোজ রোজ আসিস্, যাস্, কিছু করিস্ নে ; একটু একটু ধ্যান করতে হবে যে।" তাহাই হইল। অন্যদিনের ন্যায় সেদিনও সন্ধ্যাবেলা হেমচন্দ্র অর্চনালয়ে উপস্থিত হইলে গুরুদেব তাঁহাকে ধ্যান করিতে বসাইয়া দিয়া বহির্গমন করিলেন। ইতিপূর্বে হেমচন্দ্র ধ্যানা-

ভ্যাসে অভ্যস্ত ছিলেন না। ধ্যান করিতে বসিয়া তাঁহার মনে নানারূপ বিশৃঙ্খল চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। তদুপরি সু-মন কু-মনের দ্বন্দ্ব তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। ধ্যানের শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ-সমূহের সহিত তুলনা করিয়া, নানারূপ যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া তাঁহার মন বুঝাইয়া দিতে চেষ্টিত হইল—ধ্যান তাঁহার কিছুই হইতেছে না, ধ্যানের চেষ্টাও তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। যাহা হউক পর পর তিনদিন এইরূপ ভাবে কাটিবার পরে বলিলেন গুরুদেব, "আর ধ্যান করতে হবে না। কিন্তু তুই আর দুষ্টুমনটার কথা শুনবি না।" হেমচন্দ্রের তৎকালীন মানসিক অবস্থা গুরুদেবের অজ্ঞাত ছিল না; কাজেই ধ্যান করিতে গিয়া এরূপ বিপর্যয় ঘটিবে ইহা অনুমান করা তাঁহার পক্ষে কিছু আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। তবুও সব জানিয়া শুনিয়া কেন যে তিনি হেমচন্দ্রকে ধ্যান করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, আবার তিনদিন যাইতে না যাইতে ধ্যান বন্ধ করিয়া দিয়া দুষ্টুমনের কথা শুনিতে বারণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন, উহা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। এ বিষয়ে যথাযথ কারণ নির্ধারণের চেষ্টাও অন্যের পক্ষে অনধিকার-চর্চা মাত্র। বস্তুতঃ গুরুশিষ্যের ভাব, কিসে শিষ্যের আধ্যাত্মিক মঙ্গল হইবে, উহা একমাত্র শ্রীগুরুরই বোধগম্য। কখনও কখনও শিষ্যের প্রতি শ্রীগুরুর নির্দেশ, শিষ্যের প্রতি তাঁহার আচরণ, শাস্ত্র-নির্দিষ্ট পথেই আসিয়া থাকে, আবার কখনও কখনও উহা ভিন্ন পথ বাহিয়াও শিষ্যের নিকট উপস্থিত হয়। তাহার আজন্ম সংস্কারে আঘাত করে। শুধু অধর্ম নয়, তাহার তথাকথিত ধর্ম-বিশ্বাসের মূলেও কুঠারঘাত করে। একমাত্র দৃঢ়-বিশ্বাসী ভক্তই এই আঘাত সহ্য করিতে পারে, এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে; এই নূতন বেশেও তাহার প্রভুকে চিনিতে পারে। এই ঘাত প্রতিঘাতের ফলে নূতন করিয়া তাহার ধর্মজীবন গঠিত হইতে আরম্ভ হয়। হেমচন্দ্রের গুরুদেব তাঁহাকে ধ্যান করিতে বারণ করিলেন বটে, কিন্তু যাহা করিতে বলিলেন তাহা বড়ঃসহজ ছিল না। ভালই হউক মন্দই হউক যাহার যেমন মন। মনের কথা না শুনিয়া লোকে আর কাহার কথা শুনিবে?

বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে মাত্র দুই এক ফুট জায়গা জুড়িয়াই আমরা দাঁড়াইয়া থাকি। কিন্তু এই এতটুকু জায়গা পায়ের তলা হইতে সরিয়া যাওয়ার অর্থ—হয় মহাশূন্যে উৎক্ষেপণ নতুবা অথৈ জলে নিমজ্জন। গুরুদেব কি বুঝিয়াছিলেন এই অত্যল্প কালের মধ্যেই হেমচন্দ্র এমন কিছু পাইয়াছিলেন যাহাকে অবলম্বন করিয়া এহেন মনের কথা না শুনিয়াও চলিতে সমর্থ হইবেন? তাই কি তিনি এরূপ আদেশ করিলেন? সে যাহা হউক সেইদিন হয়তো এত কথা বুঝিতে না পারিলেও, হেমচন্দ্র গুরুবাক্য শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সহিতই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের বীজ কালে কিরূপ বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়াছিল তাঁহার পরবর্তী জীবনই উহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে।

ইহার পরের ঘটনা। একদিন হেমচন্দ্র গুরুদেবকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ গুরুদেব পা দুইখানি সরাইয়া লইলেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে হেমচন্দ্র মনে বিশেষ আঘাত পাইলেন, ভাবিলেন— আমার অশুদ্ধ দেহ, কামনাবদ্ধ মন, আমি তাঁহার চরণস্পর্শের অযোগ্য, তাই এরূপভাবে গুরুদেব পা দুইখানি সরাইয়া লইলেন। অন্তর্যামী গুরুদেব সেই কথা বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "না, না, সেজন্য নয়। তুই কষ্ট করে এতদূর আসিস, তোর কিছু হওয়া উচিত; তখন কত প্রণাম করতে পারিস্ করিস্।" এরূপ ঘটনা হেমচন্দ্রের জীবনে আরও কয়েকবার ঘটিয়াছিল এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে প্রায় প্রত্যেকবারেই এরূপ ঘটনার অব্যবহিত পর হইতেই জাগরণে বা স্বপ্নে তাঁহার নানারূপ দিব্যদর্শন ও অনুভূতি হইতে থাকিত। এই ব্যাপারের কোন তাৎপর্য আছে কিনা তাহা পণ্ডিতগণের বিবেচ্য। আমরা কিন্তু উত্তরকালে এইরূপ কোন ঘটনার উল্লেখ হইলে হেমচন্দ্রের মুখে নিম্নলিখিত গানের পদটি প্রায়ই শুনিতে পাইতাম :—

"চোখ বেঁধে ভবের খেলায় বলছ হরি আমায় ধর।
আঘাত দিয়ে বল মোরে এইতো আমার কর॥"

উপরোক্ত ঘটনার পর হইতে একাদিক্রমে হেমচন্দ্রের নানারূপ

অলৌকিক স্বপ্নদর্শন ও দিব্যানুভূতি হইতে লাগিল। হেমচন্দ্রের স্বপ্নবৃত্তান্তসকল এতদূর সামঞ্জস্যপূর্ণ ও গভীর তত্ত্বব্যঞ্জক যে কোন্‌টিকে বাদ দিয়া কোন্‌টির উল্লেখ করা যাইবে উহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। অতিবিস্তারের ভয়ে মাত্র কয়েকটির বিষয় এস্থলে উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে নিরস্ত হইতে হইল।

স্বপ্নদর্শন ও দিব্যানুভূতি

একদিন দেখিতেছেন,—উড়িয়া উড়িয়া দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দিরে গিয়াছেন। মন্দিরমধ্যে অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী কিশোরী নানা রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া হাত মুখ নাড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত অনেক কথা কহিতেছেন। হেমচন্দ্র এ সকল কথার একবর্ণও বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু কথা শেষ হইতেই যেমন বালিকা প্রস্তরমূর্তিতে ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন, অমনি হেমচন্দ্র বাধা দিয়া বলিলেন, "বেটি, আমি সেই ভবানীপুর থেকে ছুটতে ছুটতে আসছি, আমার সাথে একটি কথাও কইতে পারলিনি, যত কথা ঐ বামুনের সঙ্গে।" আমরা এই প্রসঙ্গে হেমচন্দ্রের নিজমুখে অপরূপ ভঙ্গীতে বলিতে শুনিয়াছি,—এই কথা শুনিয়া দেবী তাঁহার ক্ষুদ্র রক্তাভ বামহাতখানি ঈষৎ উত্তোলন করিলেন এবং ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে তিনবার বলিলেন, "কথা কইব—কথা কইব—কথা কইব।" এই "কথা কওয়া" বা "কথা না কওয়ার" ঠিক ঠিক অর্থ যে কী তাহা তত্ত্বদর্শিগণই বলিতে বা বুঝিতে পারিবেন। আমরা শুনিয়াছি পরদিবস এই স্বপ্নবৃত্তান্ত গুরুদেবকে নিবেদন করিবামাত্র তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং পরে পরম স্নেহভরে হেমচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "তুই আমাদের নিজজন।" এস্থলে "আমাদের নিজজন" একথা দুইটি দ্বারা কি গুরুদেব "গুরুপরম্পরার" কথাই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন?

আবার একদিন দেখিলেন,—শ্রীরামচন্দ্রের সভায় লবকুশ গান করিতেছে। হেমচন্দ্র বলিতেন তেমন গান তিনি জীবনে কখনও শোনেন নাই।

অপব একদিন। দেখিলেন, তিনি যেন মহাবীব হনুমানের ন্যায় সমুদ্র পার হইতে উদ্যত। শবীরটা এত বিবাট হইষাছে যে, তাহার তুলনায সমুদ্র গোষ্পদ বলিয়া মনে হইতেছে। সম্মুখে দেখিলেন কযেকটি পূর্ণযৌবনা স্ত্রী এক একটি শিশুব হাত ধবিযা সমুদ্র পাব করিয়া দিতেছে। আব গুরুদেব এই রূপকেব ব্যাখ্যা কবিযা বুঝাইয়া দিতেছেন,—কলিতে নাবদীযা ভক্তি। অল্পজ্ঞান মানুষ পূর্ণ ভক্তির সাহায্যে দুস্তব ভবসাগব পাবে যাইতে সমর্থ হইতেছে।

অন্যদিন। স্বপ্নে গুরুদেব হেমচন্দ্রকে বলিতেছেন, "তোকে আজ বুদ্ধদেবেব সমাধি দেখাব।" এই কথা বলিযাই গুরুদেব তাঁহাব দেহ স্পর্শ কবিলেন। অমনি হেমচন্দ্রের মনে হইল—সকল অস্তিত্ব, এমন কি তাঁহাব নিজেব দেহ পর্যন্ত লুপ্ত হইযা গিয়াছে। আছে মাত্র দৃষ্টি। গুরুদেব দ্বিতীয়বার স্পর্শ করিলেন। এবাবে সবই মাটি। কেবল মাটি, আর মাটি। মাটি ছাডা আর কিছুবই অস্তিত্ব নাই। তৃতীয়বাব স্পর্শ। জল—জল; জল ছাডা আব কোথাও কিছু নাই। এইরূপে স্পর্শেব পর স্পর্শে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ক্রমান্বয়ে তেজ, মরুৎ ও মহাব্যোমে পর্যবসিত হইল। ব্যোমের পব কি, কে বলিবে? তাহার পর একটি স্পন্দন—যেন নিদ্রাব আবেশ ভাঙ্গিয়া গেল। আবাব ক্রমে ব্যোম হইতে মরুৎ, মরুৎ হইতে তেজ, তেজ হইতে অপ্ এবং অপ্ হইতে ক্ষিতিব অনুভবে উপনীত করাইযা, গুরুদেব বুঝাইয়া দিলেন—সূক্ষ্মেরই স্থূল, আবাব স্থূলেরই সূক্ষ্ম।

অন্য দিনেব কথা। দেখিতেছেন, অতি প্রত্যূষে গুরুদেব তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বালীগঞ্জেব মাঠে উপস্থিত। মাঠে পৌঁছিযাই গুরুদেব অনেক রকম খেলনা মাঠময় ছডাইয়া দিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে বেলা বাডিতে থাকিল। যাহাবা মাঠে বেডাইতে আসিল সকলেই ২।১ টা করিয়া খেলনা লইয়া গেল। ধীবে ধীবে বেলা পডিযা আসিল। লোক কমিয়া গেল। কিন্তু খেলনা তখনও ফুবায় নাই। অবশেষে গুরুদেব নীচেব মাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি প্রকাণ্ড "হাঁ" করিলেন এবং যাহা কিছু খেলনা অবশিষ্ট

ছিল একত্রে মুখগহ্বরে পুরিয়া দিলেন। এ স্বপ্নটির তাৎপর্য অতি সুস্পষ্ট। হেমচন্দ্র গুরুদেবকে ভগবান বোধে পূজা করিতেন। গুরুদেব দেখাইতেছেন ভব-রঙ্গমঞ্চে এই খেলার অবতারণা তিনিই করিতেছেন। এখানে যাহা কিছু সকলই তাঁহার ক্রীড়নক মাত্র। কেহ কেহ দিনের আলোয় কেনাবেচা সারিয়া "ফিরে যায় আপন ঘরে।" যাহাদের দিন থাকিতে খেলিবার সাধ মিটে না, অথচ জীবনের অন্ধকার ঘনাইয়া আসে, তাহারাও শেষ পর্যন্ত বাদ পড়ে না। অন্নপূর্ণার দুয়ার হইতে কেহই অভুক্ত ফিরিয়া যায় না। খোসা, বিচি সব লইয়াই বেলটি পূর্ণ। যাহারা পড়িয়া রহিল তাহারা ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরীর উদরে স্থান পাইয়া তাঁহারই অঙ্গে অঙ্গীভূত হইয়া গেল। তবে তফাৎ কি নাই? আছে বই কি! বলিতেন হেমচন্দ্র, "কেউ সকাল সকাল স্নানাহার সেরে নিয়ে, ভিজে গামছা মাথায় জড়িয়ে হরিনাম করতে করতে চলেছে। কেউ বা দুপুর রৌদ্রে খোলা মাথায় তেপান্তরের মাঠ দিয়ে 'বাপ্‌রে' 'মারে' করতে করতে ছুটে চলেছে। পরিণামে সবাই এক জায়গায় পৌছুবে সত্য; কিন্তু এ যাওয়ার পথে কি তফাৎ নেই?"

আর একদিন। হেমচন্দ্র স্বপ্নে দেখিতেছেন, গুরুদেব ও তিনি পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছেন। সামনে একখণ্ড বৃত্তাকার ভূমি, সার্কাসের ক্রীড়া প্রাঙ্গণের ন্যায়; কেন্দ্রস্থলটি শূন্য। চক্রাকার পরিধির উপর নানা সম্প্রদায়ের ভক্তগণ উপবিষ্ট। গুরুদেবের নির্দেশক্রমে, হেমচন্দ্র প্রথমে শ্রীহনুমানের নিকট গিয়া দেখিলেন,—শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া বৃত্তের মধ্যস্থলে রামসীতা উপবিষ্ট। অতঃপর গাণপত্য সম্প্রদায়ের ভক্তের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—রামসীতা স্থলে শ্রীগণেশের আবির্ভাব হইয়াছে। এইরূপে প্রতি ভক্তের নিকট যাইয়া যাইয়া বৃত্তের মধ্যস্থলে সেই সেই ভক্তের অভীষ্ট মূর্তির দেখা পাইতে লাগিলেন। আবার মণ্ডলের বাহির হইতে দৃষ্টি করিয়া মধ্যস্থলটি শূন্যই দেখিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিতেন,—"তিনিই নিরাকার তিনিই সাকার, তাঁরই নানারূপ।" জলের কোন নির্দিষ্ট আকার নাই, যে পাত্রে রাখ, তদাকারে আকারিত হয়।

অন্য একদিন হেমচন্দ্র স্বপ্নে গুরুদেবের পদসেবা করিতে করিতে তাঁহাকে বলিতেছেন,"এ তো স্বপ্নে হচ্ছে, আমি বেশ জানি ; যদি আপনি আমাকে জাগিয়ে দেন তো বেশ হয়।" উত্তরে সে দিন গুরুদেব হেমচন্দ্রকে যাহা বলিযাছিলেন সে কথা শুনিযা হেমচন্দ্র স্বপ্নে অধোবদন হইযাছিলেন সত্য ; কিন্তু সে কথা ভাবিযা জাগ্রতে মুখ উঁচু করিয়া চলিতে পারে এমন লোকও বুঝি দুর্লভ। বলিলেন গুরুদেব, "দেখ, তোকে আমি এক্ষুনি জাগিয়ে দিতে পারি। কিন্তু তুই জাগতে চাচ্ছিস কেন বলতো ? আমার পা টিপছিস, বাইরেতে মন একেবারেই নেই, সমস্ত মনটা দিয়েই সেবা করতে পারছিস, আনন্দ পাচ্ছিস। তবুও জাগতে চাচ্ছিস কেন বলব ? সবাইকে বলবি আমি ঘুমিয়েছিলাম, গুরুদেব জাগিয়ে দিয়েছেন এই তো ?" গুরুদেব কি তাঁহার দৃষ্টির সন্ধানী-রশ্মি-পাত করিযা হেমচন্দ্রের মনের অগোচরে তখনও যে লোকৈষণা লুক্কায়িত ছিল তাহারই ইঙ্গিত করিতেছেন ? তাই কি বলা হয় গুরু-দর্পণ ? মনের এই অন্ধকার নাশ করেন বলিয়াই তো তিনি গুরু। আর তাঁহার এই অলৌকিক শাসন মানিয়া লন বলিয়াই শিষ্য, শিষ্য-পদবাচ্য।

আর একটি মাত্র স্বপ্নের উল্লেখ করিয়াই আমরা বর্তমান প্রবন্ধে হেমচন্দ্রের স্বপ্নকথা শেষ করিব। ইতঃপূর্বে গুরুদেব দুইবার শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন। কিন্তু একবারও বিমলাদেবীর মন্দির দর্শন করেন নাই। একদিন গুরুদেব স্বপ্নে হেমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হ্যাঁরে, বিমলাদেবীকে দেখেছিস ?" হেমচন্দ্র উত্তর দিলেন "আজ্ঞে, না।" এই কথার পরে শিষ্য সমভিব্যাহারে বিমলাদেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইতেই দেখা গেল মন্দিরদ্বার রুদ্ধ। রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে পুরোহিত উপবিষ্ট। "একবার মুহূর্তের জন্যেও কি রুদ্ধদ্বার মুক্ত করা যায় না ?"—শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করেন গুরুদেব—"বড্ড তাড়াতাড়ি, একবার মাকে দর্শন করতে চাই যে।" "উপায় নেই বল্লেই চলে," উত্তরে বলিলেন পুরোহিত। "নেই বল্লেই চলে ? তবে আছে, আছে কোন নিরুপায়ের উপায় ?" রুদ্ধ-কণ্ঠে প্রশ্ন করেন গুরুদেব। "সে বড় কঠিন উপায়", অনন্যোপায় হইয়া

বলিতে লাগিলেন পুরোহিত, "যদি কেউ দিতে পারে নববলি মায়ের রুদ্ধ-দ্বারের সামনে, তখনই কেবল তখনই খুলতে পারে, পারে কেন নিশ্চয়ই খুলবে রুদ্ধদ্বারের বদ্ধ কপাট। নেই তার কোন কালাকাল, নেই তার কোন যোগ্যতা অযোগ্যতার বিচার।" কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল! হেমচন্দ্র বলিতেন, "পুরোহিত মানে কি জান? পুরো-হিত অর্থাৎ কিনা যিনি শিষ্যের পুরোপুরি হিত করেন।" সাময়িক দুঃখ-নিবৃত্তি নয়, একেবারে আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির কথা। যাহা হউক, আবার স্বপ্নের কথাতেই ফিরিয়া যাই। কিন্তু, এ কি? পুরোহিতের মুখের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে চক্ষের পলকে নববিবাহিত বিংশ বৎসরের যুবক অম্লান বদনে স্থাপন করিল যূপকাষ্ঠে আপন কণ্ঠদেশ, দেখিতে না দেখিতে ঝলসিয়া উঠিল বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ গুরুদেবের হাতে বলির খড়গ। দ্বিধা নাই সঙ্কোচ নাই, আত্মপর ভেদ নাই। গুরুশিষ্য,—একপ্রাণ, এক আত্মা। "রক্তধারা পান কর, মা, আপনার গলা কাটি।" কিন্তু গলা আর কাটিতে হইল না। হন্ হন্ ঝন্ ঝন্ শব্দে রুদ্ধদ্বার মুক্ত করিয়া জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন দেবী স্বয়ং; বিদ্যুৎগতিতে চাপিয়া ধরিলেন গুরুদেবের উদ্যত-খড়গ-হস্ত,—বন্ধ হইল নববলি। স্বপ্ন হইলেও ইহা সামান্য নয়। গুরু-শিষ্যের এই একপ্রাণতা, শ্রীগুরুর সামান্য ইচ্ছা পূরণের জন্য শিষ্যের মনের এই যে প্রাণপণ আগ্রহ, যাহা এই স্বপ্নাবলম্বনে সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, উহাকে হেমচন্দ্র-জীবনের এই কালীন ও পরবর্তী ঘটনাবলীর সহিত একত্র করিয়া দেখিলে স্বভাবতঃই মনে হয়, আধ্যাত্মিকতার যে উচ্চশিখরে আরোহণ করিলে, "গুরোঃ পরতরং নাস্তি" ইহা ঠিক ঠিক অনুভূত হয়; যে অবস্থায় পৌঁছিলে গুরু শুধু 'ইষ্ট' নন, তিনিই 'যথেষ্ট', মনে প্রাণে বোধ করিতে পারা যায়, জীবনের মধ্যাহ্নেই হেমচন্দ্র তথায় উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

গুরু সকাশে শিক্ষা

শ্রীশ্রীঠাকুর-শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "সখি! যাবৎ বাঁচি, তাবৎ শিখি।" আমাদের মনে হয়, সৎগুরু শুধু যে যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখিতেই চান

তাহা নহে, অনুগত ভক্তশিষ্যকে যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখাইবারও তাঁহার সাধের অন্ত নাই। গুরুসঙ্গের ফলে ক্রমে ক্রমে হেমচন্দ্রের ধ্যান ধারণা কিরূপ গভীরতা প্রাপ্ত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে অনেক কথা ও কাহিনী আমাদিগের পক্ষে জানিবার অবকাশ হইয়াছিল এবং এ বিষয়ে কিছু কিছু অতঃপর সংক্ষেপে বর্ণিতও হইবে। এমনও হইয়াছে, কোনদিন ভাত খাইতে বসিয়া ভাতের থালা আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব পর্যন্ত যেটুকু অবসর তন্মধ্যেই মন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। গুরুদেবের সান্নিধ্য অনুভব করিয়া পাত্রইখানি ধরিতে গিয়া পড়িয়া গিয়াছেন। জিজ্ঞাসিত হইয়া হয়তো বলিলেন,—"ও কিছু নয়।" পরদিন গুরুদেবের সহিত দেখা হইলে, তিনি রহস্য করিয়া বলিলেন, "কি! গিয়েছিলাম তো; ধরতে তো পারলিনি।"

বাড়ীতে হেমচন্দ্র যখনই সময় পাইতেন, নিজ অভিরুচি মত নানারূপে শ্রীশ্রীঠাকুরকে সাজাইতেন; তাঁহার পূজা অর্চনা ও ধ্যান ধারণায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিতেন। এইরূপ ভাবে কিছুদিন চলিবার পর হইতে সন্ধ্যাবেলা হেমচন্দ্রের নিকটে ভক্ত সমাগম আরম্ভ হইল। স্থানীয় ভক্তগণ ইটালীতে অর্চনালয়ে না গিয়া হেমচন্দ্রের নিকটেই আসিতে লাগিলেন। এইরূপে কয়েকদিন যাইতে না যাইতে প্রসঙ্গক্রমে এইকথা জানিতে পারিয়া একদিন হেমচন্দ্র অর্চনালয়ে উপস্থিত হইতেই গুরুদেব ভৎ সনার সুরে তাঁহাকে বলিলেন, "ভারি কাপ্তেন হয়ে উঠেছিস যে! আগে শক্তিলাভ কর, তারপর হবে। আজ থেকে তোর ঠাকুরপূজো বন্ধ।" এই অপ্রত্যাশিত আদেশে উপস্থিত কেহ কেহ মৃদু আপত্তি জানাইলেন। কিন্তু গুরুদেব বলিলেন, "আমি হেমকে বলেছি, তোমাদের তো বলিনি; যাকে বলেছি, সে বুঝেছে।" বস্তুতঃ দেখা যায় এই কথার অর্থ হেমচন্দ্র সত্য সত্যই মনে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন, এবং বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই এই আদর্শ শিষ্য পরে আদর্শ গুরু হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছিলেন। আমরা দেখিয়াছি, গুরুর নিকটে তিনি যে সকল প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন, যে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, সে সকল অপেক্ষাও ক্বচিৎ কখনও যে

মৃদু তিরস্কার, স্নেহপূর্ণ ভৎর্সনা তাঁহার ভাগ্যে জুটিয়াছিল উহার বর্ণনাই করিতেন তিনি সমধিক আগ্রহ ও উল্লাসের সহিত।

শ্রীগুরু-সঙ্গের ফলে জাগ্রতে ও স্বপ্নে হেমচন্দ্রের যে সকল দিব্যানুভূতি লাভ হইয়াছিল উহার কিছু কিছু আমরা ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি; সকল কথা বিস্তার করিয়া বলা সম্ভব নহে। গুরুদেবের বাহ্য আচরণও হেমচন্দ্রকে মুগ্ধ করিয়াছিল। "আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখায়"— এ কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছিলেন তিনি গুরুদেবের জীবনে, তাঁহার প্রতি আচরণে। এ বিষয়েরও দুই একটি দৃষ্টান্ত এ স্থলে উল্লিখিত হইল। একদিন যথারীতি ঈশ্বর-প্রসঙ্গ চলিতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ গুরুদেব উঠিয়া গেলেন। অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইল, তবুও তিনি ফিরিতেছেন না দেখিয়া হেমচন্দ্র কথঞ্চিৎ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন: অবশেষে তাঁহার সন্ধানে গিয়া দেখেন এক অন্ধকার, অপরিচ্ছন্ন স্থানে যেখানে তাঁহাদের জুতাগুলি রাখা হইত, উহারই মাঝখানে গুরুদেব বসিয়া আছেন এবং এক এক করিয়া জুতাগুলি লইয়া মাথায় ও বুকে ঠেকাইতেছেন ও এক একবার উহাদের তলদেশ জিহ্বা দ্বারা স্পর্শ করিতেছেন। এ দৃশ্য দেখিয়া হেমচন্দ্রের বাক্যস্ফূর্তি হইল না। হঠাৎ হেমচন্দ্রকে দেখিতে পাইয়া গুরুদেব প্রথমে ধমক দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুই আবার এখানে কেন?" আবার পরক্ষণেই সুর নরম করিয়া বলিলেন, "না, না, তোর থাকা দরকার, তোর দেখা দরকার। দেখ, আমি জানি, নিশ্চিত জানি, আমার ঠাকুর স্বয়ং তোদের সব মূর্তি ধরে আমার কাছে এসেছেন। তোরা সব জানিস না এমন নয়; সব জানিস, কিন্তু না জানার ভান কচ্ছিস। এ ভান কেন? যে যে জিনিষগুলি তিনি অন্য মূর্তিতে আমার কাছে রেখে গেছেন, এখন তোদের মূর্তিতে এসে দেখছেন, সে সব আমি ঠিক ঠিক মনে করে রেখেছি কিনা। তোদের কাছে আমার পড়া মুখস্থ দিই। আমার বড় ইচ্ছে হয় তোদের প্রণাম করি, কিন্তু তোরা তো তা করতে দিবিনি। তাই তোদের জুতোগুলো নিয়ে যা হয় কচ্ছি।" আমরা জানি না কিরূপে এই ঘটনাকে আখ্যাত করিব। বিনয়? না, না, বিনয়

এ নয়; বিনয় বলিলে ইহাকে ভুল বোঝা হইবে, অমর্যাদা করা হইবে। বৈদান্তিকের দৃষ্টিতে ইহাই বোধ হয় Practical বেদান্ত। আর বৈষ্ণবের কথায় স্মরণ করাইয়া দেয় "গীত-গোবিন্দের" সেই চরণটি "দেহি পদপল্লবমুদারম।"* এ স্থলে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। গুরুদেব এ অবস্থায় হেমচন্দ্রকে দেখিয়া প্রথমে যেন বিরক্তি-ব্যঞ্জক ভাবে বলিতেছেন, "তুই এখানে কেন ?" আবার তৎক্ষণাৎ বলিতেছেন, "না, না, তোর থাকা দরকার, তোর দেখা দরকার।" এই কথা দ্বারা ইহাই কি মনে হয় না—গুরুদেব তাঁহার মানসচক্ষে দেখিতেছেন, সেই অদূর ভবিষ্যতের ছবি, যখন প্রিয় শিষ্যের মধ্যেও গুরুভাবের স্ফুরণ হইয়াছে ? সেও সর্বজীবে ঈশ্বর দর্শন করিয়া তাঁহার ন্যায়—তাঁহার গুরুদেবের ন্যায়—পূর্বাপর সকল ঈশ্বরদর্শী মহাপুরুষগণের ন্যায় আচরণ করিতেছে।

শ্রীগুরুদেবের সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শনের অপর একটি দৃষ্টান্তও হেমচন্দ্রের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। গুরুদেবের আয় ছিল সামান্য; কাজেই তিনি শহরের এমন স্থানে বাস করিতেন, যাহার

* কথিত আছে শ্রীযুক্ত জয়দেব গোস্বামী "গীত-গোবিন্দ" রচনা-কালে "স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্" এই পর্যন্ত লিখিয়া আর লিখিতে পারিতেছেন না। শ্রীমতীকে স্তব করিতে গিয়া ইহার অধিক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মুখ দিয়া ব্যক্ত করিতে গোস্বামী ঠাকুরের আর সাধ্য হইতেছে না, অথচ না বলিলেও শ্লোক অপূর্ণ থাকিয়া যায়। এ অবস্থায় চিন্তাকুল হৃদয়ে তিনি যখন গঙ্গাস্নানে গমন করেন সেই অবকাশে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ জয়দেবের রূপ ধরিয়া আসিয়া "দেহি পদপল্লবমুদারম্" এই পদটি নিজ হস্তে লিখিয়া দিয়া শ্লোকটি সম্পূর্ণ করিয়া যান। ঘটনা হিসাবে ইহার বাস্তবতা বা অবাস্তবতা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের বক্তব্য এই যে মানুষের মন সম্পূর্ণ ভেদবুদ্ধি রহিত হইয়া পরম এবং চরম অদ্বৈততত্ত্বে পৌঁছিতে না পারিলে, তাহার মনে ভেদভাবের লেশমাত্র থাকিতে, তাহার পক্ষে মনে প্রাণে এরূপভাব ব্যক্ত করা সম্ভব নহে। আমরা জানিনা স্বয়ং গোস্বামী ঠাকুরই কৃষ্ণভাবে ভাবিত হইয়া সকল লৌকিক ভাবের ঊর্ধ্বে উঠিয়া কৃষ্ণের ন্যায়ই এরূপ আচরণ করিয়াছিলেন কিনা।

আশে পাশে সকলেই খোলার ঘরে কষ্টেসৃষ্টে দিন কাটাইত। দেখা গেল একদিন কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে গুরুদেবের ঘরের নিকটে খেলা করিতে করিতে মুড়ি খাইতেছে। দুই চারিটি মুড়ি যাহা হাত ফস্কাইয়া মাটিতে বা খোলা ড্রেনের পাশে পড়িয়া যাইতেছে তাহাও তাহারা তুলিয়া তুলিয়া খাইতেছে। ইহা দেখিয়া গুরুদেব হেমচন্দ্রকে চার পয়সার জিলাপি কিনিয়া আনিতে বলিলেন। তখন পয়সায় দুইখানি করিয়া তেলেভাজা জিলাপি পাওয়া যাইত; হেমচন্দ্র উহাই কিনিয়া আনিলেন। গুরুদেব সকল ছেলেমেয়ের হাতে এক একখানা করিয়া জিলাপি দিলেন। জিলাপি পাইয়া তাহাদের এত আনন্দ যে, আনন্দের বেগে জিলাপিতে কামড়ও দিতে পারিতেছে না। এ দৃশ্য দেখিয়া গুরুদেবের ভাবাবেশ হইয়াছে। নয়ন যুগল বাষ্পাকুল। ভাবের আবেগে বদন রক্তিমাভ। হেমচন্দ্র অবাক্ হইয়া গুরুদেবের মুখের প্রতি চাহিয়া আছেন। এমন সময় শুনিতে পাইলেন ছেলেমেয়েদের লক্ষ্য করিয়া গুরুদেব আপন মনে বলিতেছেন, "মর্‌তে এখানে এসেছ কেন? যাওনা ধনীর বাড়ীতে, সেখানে সোনার বাটিতে দুধ নিয়ে সাধ্য সাধনা কচ্ছে।" বলা বাহুল্য এ সকল ঘটনা আমরা হেমচন্দ্রের নিজ মুখেই শুনিয়াছি। বলিতে বলিতে তাঁহার মুখমণ্ডলও ভাবাবেশে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত—বার্ধক্যের কথা ভুল হইয়া যাইত, স্থান-কাল-পাত্রের বোধ অস্পষ্ট হইয়া উঠিত। আর অন্ততঃ সেই সময়ের জন্যও আমাদিগকে রুদ্ধবাক্ নিস্পন্দ চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হইত।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি, হেমচন্দ্র যখনই যে কাজ করিতেন উহা মনপ্রাণ দিয়া করিতেন, গভীর শ্রদ্ধার সহিতই করিতেন। কিন্তু ইদানীং সময়ে সময়ে এমন তন্ময়তার ভাব আসিয়া তাঁহার মনপ্রাণ অধিকার করিয়া ফেলিতে লাগিল যে নিতান্ত অভ্যস্ত দৈনন্দিন কাজ কর্মেও কখনও কখনও ভুল ভ্রান্তি ঘটিতে লাগিল। এইরূপে একদিন অফিসে একখানি মূল্যবান দলিল প্রস্তুত করিতে করিতে উহার কিয়দংশ বাদ পড়িয়া গেল। ফলে হেমচন্দ্র সেদিন বিশেষ লজ্জা বোধ করিলেন।

সন্ধ্যাবেলায় অন্যদিনের ন্যায় সেদিনও গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইবার পরে লজ্জা ও অভিমানের সুরে তাঁহাকে বলিলেন, "আচ্ছা, চৈতন্যের চিন্তা করে কি মানুষ অচৈতন্য হয়?" তাহার পর সকল কথা শুনিয়া গুরুদেব সেদিন হেমচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "কেন তুই মনে করলি যে যতীন মুখার্জীর* কাজ করছিস? কেন মনে করলি নি যে আমারই কাজ করছিস? তা হলে তো ধ্যান ও কাজ এক সঙ্গেই হত।" "যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।" গুরুদেব কি তাই এখানে শিষ্যকে হাতে নাতে সেই কর্মকৌশল, কর্মযোগ শিক্ষা দিতেছেন?

তাঁহার প্রতি হেমচন্দ্রের ভালবাসার আকর্ষণের কথায় বলিলেন একদিন গুরুদেব স্বয়ং, "তোর মন আজ যেমন কর্ কর্ করছিল আমার জন্য, বাধাবাধীর অহর্নিশি ঐ রকমটা হত ঠাকুরের জন্য।" যে ঘটনাটি উপলক্ষ করিয়া এই কথা, উহা এইরূপ। কুমুদচন্দ্রের বাড়ীতে উৎসব সারিয়া সেদিন গভীর রাত্রিতে গুরুদেব একাকী ঘোড়াগাড়ী করিয়া অর্চনালয়ে ফিরিয়া গেলেন। বাড়ীতে ফিরিবার পরে হেমচন্দ্রের সবে একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। রাত্রি প্রায় ১টা। হঠাৎ মনে হইল—গুরুদেব বাতের রোগী, একাকী গাড়ী হইতে নামিতে পারিবেন না। গাড়োয়ান হয়তো তখনও তাঁহাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দেয় নাই। কাহাকেও ডাকিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ী যাইবেন এত রাত্রিতে সে সুযোগও নাই। হায়! হায়! তাহা হইলে বোধ হয় এখনও তিনি গাড়ীতেই বসিয়া আছেন। একথা মনে হইতেই হেমচন্দ্র অস্থির হইয়া উঠিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া, একরূপ ছুটিতে ছুটিতেই ভবানীপুর হইতে ইটালি অর্চনালয়ে উপস্থিত হইলেন। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। বলা বাহুল্য, বহু পূর্বেই গুরুদেব স্বগৃহে পৌঁছিয়া গিয়াছেন। তখনও ঘুমান নাই, বসিয়া বসিয়া তামাক খাইতেছেন। এ সময় হঠাৎ হেমচন্দ্রকে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উপস্থিত হইতে দেখিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে কারণ জিজ্ঞাসা

---

* শ্রীযুত যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায়—এটর্ণি।

করিলেন। পরে সমস্ত কথা শুনিয়া যাহা বলিলেন উহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীরামকৃষ্ণ হেমচন্দ্রের গুরুদেবের সম্বন্ধে বলিতেন, "ওর সখিভাব।" কাজেই হেমচন্দ্রের চরিত্রে শ্রীমতীর ভাবের স্ফুরণ অন্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না বলিলেও চলে।

মীরাটে ও তীর্থে

হেমচন্দ্রের গুরুদেব সেবারে মীরাটে বেড়াইতে গিয়াছেন। সেখান হইতে হেমচন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া মাত্র পাঁচটি খরচের টাকা বৃদ্ধা মাতার হাতে দিয়া অনির্দিষ্ট কালের জন্য রওয়ানা হইলেন হেমচন্দ্র মীরাট অভিমুখে। ভাঙ্গাবাড়ী। পাড়ায় দুষ্টলোকের অভাব নাই। কে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে যুবতী স্ত্রীকে? কে দেখিবে বৃদ্ধা মাতাকে? সেদিকে আদৌ ভ্রূক্ষেপ নাই। শ্রীগুরুদেবের সংসার, যাহা করিবার করিবেন তিনিই। পরবর্তী কালে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া জনৈক ভক্ত-শিষ্যকে বিস্ময় প্রকাশ করিতে দেখিয়া হেমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "তখন কিন্তু বাবা, পুরুষকার লাগিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, ঠাকুর তো সব জেনে শুনেই ডেকে পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমাকে যেতেই হবে যত বাধা বিপত্তিই আসুক না কেন! এখন বুঝতে পারছি, এই যে পুরুষকার এও তাঁরই দেওয়া।" এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, হেমচন্দ্র "ঠাকুর" কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিতেন। কখনও শ্রীরামকৃষ্ণদেব, কখনও নিজের গুরুদেব, কখনও বা অন্য কোন ঈশ্বরকল্প মহাপুরুষ এবং সময়ে সময়ে আত্মোপলব্ধ সগুণ বা নির্গুণ ঈশ্বরতত্ত্বই ইহার লক্ষ্য হইত।

মীরাটে হেমচন্দ্রের দিন বড় সুখের ছিল না। সামান্য আয় হইতে মেসের খরচা দিয়া বিশেষ কিছুই উদ্বৃত্ত থাকিত না। একজন যুবকের এরূপ স্বাস্থ্যকর স্থানে কিরূপ ক্ষুধার উদ্রেক হইতে পারে ইহা সহজেই অনুমেয়। সময়ে সময়ে ক্ষুধার জ্বালায় জলপান করিয়াই উদর

পূরণ করিতে হইত। * তাহার পর গুরুদেবের নিকটে যাঁহারা আসিতেন তাঁহারাও ভগবৎ প্রসঙ্গ ছাড়িয়া নানা বৈষয়িক কথা লইয়াই সময় কাটাইতেন অথচ অফিসের পরে প্রতি সন্ধ্যায় তাঁহাদের জন্য, আসিবার সময় "আউতি গুড়ুক" ও বিদায়ের সময় "বিদায় গুড়ুক" সরবরাহ করা ছিল হেমচন্দ্রের নিত্য কর্ম। কিছুদিন এইভাবে চলিবার পরে, একদিন হেমচন্দ্রের ধৈর্যচ্যুতির উপক্রম হইল। ভাবিলেন, আজ গুরুদেবকে তাঁহার মনের সকল কথা খুলিয়া বলিবেন। কি আশ্চর্য! যেমনি হেমচন্দ্রের মনে এইরূপ জল্পনা কল্পনার উদয় হইয়াছে, অমনি মনে হইল কে যেন তাঁহার পৃষ্ঠে সুকোমল করস্পর্শ করিতেছে। ফিরিয়া দেখিলেন, আর কেহ নন, স্বয়ং গুরুদেব। শুনিতে পাইলেন মৃদু-মধুর অনুচ্চ কণ্ঠে, "ও তামাক আমিই খাচ্ছি।" "তাই নাকি? দেখব, এবার কত তামাক খেতে পার তুমি! করব এবার প্রাণপাত তোমার জন্য তামাক সেজে সেজে",—মনে দৃঢ় করিলেন হেমচন্দ্র। বলিলেন না কিছু মুখে, কিন্তু উৎসাহ বাড়িয়া গেল চতুর্গুণ। ইহার মাত্র কয়েক দিন পূর্বে বিদ্রোহী মনকে ধমক দিয়া বলিয়াছিলেন, "দোব না ফিরে যেতে তোমাকে কলকাতায়, মরতে হয় তো এইখানেই মর।" আজও সেই কথা বলিলেন মনকে, কিন্তু ভাবের কি তফাৎ! সে দিনের কথাকে, সে দিনের কাজকে যদি বলি সাধনা; আজকের কথাকে, আজকের কাজকে বলিতে হয় সিদ্ধি। "ভাবেন লভতে সর্বম্", এ কথার আর উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত কি হইতে পারে? আর শ্রীগুরুর স্পর্শ মাত্রেই কখনও কখনও শিষ্যের মনের ভাবের যে কী আমূল পরিবর্তন ঘটিতে পারে, তাহাও এ স্থলে লক্ষ্যণীয়।

আমরা ইতঃপূর্বে একাধিক প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়া গুরুদেব কর্তৃক ছোট বড় সকল বিষয়েই হেমচন্দ্রকে সুচারুরূপে শিক্ষাদানের কথা বলিয়াছি। এ সম্বন্ধে বহু বহু ঘটনা আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু সে

---

* গুরুদেব পরে কাহাকেও কিছু না বলিয়া তাঁহার কৌটা হইতে পয়সা লইয়া যখন যাহা দরকার খাইতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু হেমচন্দ্র তাঁহার কথা রক্ষা করিয়া সামান্যমাত্র কিছু জলযোগ করিয়াই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন।

সম্বন্ধে সকল কথা এ স্থলে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। কয়েক বৎসর কাল শ্রীগুরুদেবের সঙ্গলাভের পরেও এবং নিজ জীবনে নানা দর্শনাদি ও দিব্যানুভূতি সত্ত্বেও একবার হেমচন্দ্রের মনে যে সংশয় সন্দেহের উদয় হইয়াছিল এবং কি করিয়া গুরুদেব উহার নিরসন করিয়াছিলেন, এক্ষণে সংক্ষেপে সে কথার অবতারণা করিয়া আমরা বিষয়ান্তরে গমন করিব। শীতকাল। জনৈক ভক্তের অনুরোধে গুরুদেব সেবারে ৺পুরীধামে গমন করেন। এবারে হেমচন্দ্র সঙ্গে ছিলেন না। অন্য লোকের সহিত তিনি প্রয়াগ, শ্রীবৃন্দাবন, ৺কাশীধাম প্রভৃতি তীর্থ-সকল দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তীর্থ দর্শন করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়াই হেমচন্দ্রের মনে গুরুদর্শনের প্রবল বাসনার উদয় হইল। মনে হইতে লাগিল—যদি গুরুদেব এখনই এখানে আমাকে দর্শন দেন তবেই বুঝিব আমার সব ঠিক ঠিক হইতেছে, অন্যথায় বুঝিব সবই ভুল। বলা বাহুল্য, গুরুদেব তখনও ৺পুরীধামেই রহিয়াছেন, তাঁহার আশু কলিকাতায় ফিরিবার কোনও সম্ভাবনা নাই, হেমচন্দ্র ইহা বিলক্ষণই জানিতেন। আমরা দেখিতে পাই, এইরূপ অলৌকিক পরীক্ষা দ্বারা নিজ নিজ ধর্মজীবনের সত্যতা যাচাই করিয়া লইবার ইচ্ছা হেমচন্দ্রের পূর্ববর্তী প্রায় সকল মহাপুরুষের মনেই কখনও না কখনও উদয় হইয়াছে। কাজেই ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই; বরং সাধক-জীবনের উহা একরূপ সুপরিচিত ঘটনা বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অন্যত্রও প্রায়ই যেরূপ ঘটিতে দেখা গিয়াছে, শ্রীগুরুর কৃপায় হেমচন্দ্রেরও ধর্মবিশ্বাস এ যাত্রায় শুধু যে রক্ষা পাইয়াছিল তাহা নহে, উহা এই উপলক্ষে আরও উজ্জ্বল ও দৃঢ়তর হইয়াছিল। ঘটনাটির শেষার্ধ এইরূপ। সেদিন রবিবার। গুরুদেবের ব্যবস্থা মত সকাল সকাল চাল আদায় করিতে যাইতে না দেখিয়া মাতা দয়াময়ীর মনে সন্দেহ হইল; জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ যে চাল আদায় করতে গেলিনি, শরীর ভাল আছে তো?" হেমচন্দ্র নিরুত্তর। তাঁহার মনে তখন যে কী ঝড় বহিতেছে, অন্যে তাহার কী বুঝিবে? গুরুদেব কি আসিবেন না? তবে কি তাঁহার এত দিনের সাধনা সবই

ব্যর্থ হইয়া যাইবে ? তিনি যাহা শুনিয়াছেন, তিনি যাহা দেখিয়াছেন, তিনি যাহা বুঝিয়াছেন, সবই কি তবে মিথ্যা ? কে এ প্রশ্নের উত্তর দিবে ? ইহকাল বল, পরকাল বল, তিনি বুঝিতেন শ্রীগুরু। ঈশ্বর বল, অবতার বল, তিনি জানিতেন শ্রীগুরু। বিপদে বল, সম্পদে বল, তিনি দেখিতেন শ্রীগুরু।

"উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী, কিশোরী গলার হার।
কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন, কিশোরী করেছি সার॥"

হায়! হায়। তবে কি সব সার আজ অসার হইয়া যাইবে ? এই বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের সন্ধিক্ষণে কে তাঁহাকে পথ দেখাইবে ? তাঁহার দোদুল্যমান চিত্তকে চিরদিনের মত কে প্রশান্ত করিয়া দিবে ? কে জানে এই অবস্থার কথাই ভক্ত কবি গাহিয়াছিলেন কিনা—

"সখিরে, সকলি গরল ভেল।
(আমি) বড় আশা করে সাগর ছেঁচিনু মাণিক পাবার আশে,
সাগর শুকাল, মাণিক লুকাল, অভাগীর করম দোষে।"

কিন্তু, "কৌন্তেয়। প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" *। হইলও তাহাই। গুরুদেব ৺পুরীধাম হইতে ফিরিয়াছেন—শুধু ফিরিয়াছেন নয়, সেই মুহূর্তেই হেমচন্দ্রের গৃহের সন্নিধানে উপস্থিত। খবর লইয়া আসিয়াছে গোপী—গুরুদেবের আর একটি ভক্তশিষ্য। লম্ফপ্রদান করিয়া গুরু সকাশে উপস্থিত হইলেন হেমচন্দ্র। মাথায় আঘাত লাগিয়া গেল, লাগে লাগুক—মাথা বাঁচিয়া গেল ইহাই যথেষ্ট। অবস্থা দেখিয়া পাঠাইয়া দিলেন গুরুদেব গোপীকে কৌশলে অন্য কার্য-ব্যপদেশে। তাহার পর একা পাইয়া সেইদিন গুরুদেব হেমচন্দ্রকে যাহা বলিয়াছিলেন উহা আমরা হেমচন্দ্র প্রমুখাৎ যেরূপ শুনিয়াছি "সাধকানাং হিতার্থায়" নিম্নে তাহার হুবহু উল্লেখ করিলাম; "তুই আর কখনও এমন করবিনি বল। আমি যদি আজ কোনও কারণে পুরী থেকে এসে

---

* হে কৌন্তেয়। আমার ভক্ত কখনই বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, তুমি ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পার।—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৯।৩১

না পৌঁছুতে পারতুম, তবে কি সর্বনাশটাই হত। দেখ, আমিও একদিন মনুমেণ্টের পাশে বেড়াতে বেড়াতে সঙ্কল্প করেছিলাম যে মাষ্টার মশাই যদি আজ আমাদের বাড়ীতে আসেন তবেই বুঝব আমার সব ঠিক, নইলে সব ভুল। সেদিন বাড়ী ফিরে দেখি সত্য সত্যই মাষ্টার মশাই এসেছেন। ঠাকুর একথা শুনে, এ রকম করতে আমাকে বারণ করেছিলেন। তুই আর কখনো এ রকম করবিনি।" বাস্তবিকই হেমচন্দ্র গুরুদেবকে আর কখনও এরূপ পরীক্ষা করেন নাই।

হেমচন্দ্র গুরুদেবকে নানাভাবে পাইযাছিলেন। সকল শ্রেষ্ঠ ভাবের অভিব্যক্তি শ্রীগুরুর মধ্যে পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিযাছিল শ্রীগুরুতেই সকল ভাবের অধিষ্ঠান ; এবং অন্যপক্ষে সর্বত্রই শ্রীগুরুরই প্রকাশ। একদিন অর্চনালযে। সকলেই ভক্তপ্রবর গিরিশচন্দ্রের "চৈতন্যলীলা" অভিনয় দর্শন করিতে গিযাছেন। মাত্র গুরুদেব ও হেমচন্দ্র বাড়িতে রহিয়াছেন। নির্মল আকাশ। জ্যোৎস্না-পুলকিতা যামিনী। চাঁদের আলোয় গৃহ, প্রাঙ্গণ, পথ, ঘাট, মাঠ সব একাকার। গুরুদেব হেমচন্দ্রকে সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া গান করিতে বলিলেন। নিজে তক্তপোষের উপর বসিলেন। মন্দিরের চাতালে বসিয়া হেমচন্দ্র গান ধরিলেন ঃ—

"সুখ বৃন্দাবনে বহে প্রেমলহরী।
লীলাছলে আসি, লয়ে ব্রজবাসী
আপনা পাসরি আছেন শ্রীহরি ॥
নব জলধর বরণ সুন্দর,
কিবা নটবর বেশ মনোহর
চাঁদের নিছনি জিনিয়া লাবণী
প্রেম পীযুষখনি বদনে বাঁশরী ॥
দিবসে রাখাল, চরান গোপাল,
নিশি আগমনে ব্রজবধূ সনে
প্রেমের মিলনে লীলা নিধুবনে
থির বিজলী বামে রাধা রাসেশ্বরী ॥"

গান কিছুদূর অগ্রসর হইতে না হইতেই, গুরুদেব ভাবাবেশে উচ্চ তক্তপোষ হইতে লম্ফপ্রদান করিয়া সবেগে হেমচন্দ্রের সম্মুখে চত্বরের উপর আসিয়া পড়িলেন। আর একটু হইলেই মাথাটি ফাটিয়া যাইত—কিন্তু মুহূর্ত মধ্যে তানপুরা ফেলিয়া দিয়া ধরিয়া ফেলিলেন হেমচন্দ্র গুরুদেবকে। ভাবাবেশ কিন্তু প্রশমিত হইল না। ভাবাবেশে কেবলই সমীপবর্তী প্রাঙ্গণে আসিবার চেষ্টা। মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়া ধীরে ধীরে ধরিয়া আনিয়া উপস্থিত করিলেন হেমচন্দ্র প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে গুরুদেবকে। সুরু হইল ভাবাবেশে অভিনব নৃত্য। ভাসিয়া গেল বৃদ্ধ বয়স, জীর্ণ দেহের কথা। যেন রাধারাণী স্বয়ংই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের দেহ মন অধিকার করিয়া অপরূপ ভঙ্গীতে নৃত্য করিতেছেন। বহুক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইবার পরে ক্রমে ক্রমে ভাব প্রশমিত হইয়া আসিতে লাগিল। প্রাঙ্গণের ধূলি মাথায়, বুকে ও সর্বাঙ্গে মাখিতে মাখিতে প্রশ্ন করিলেন, "তুই কে ? আমি কোথায় ?" তাহার পর ভাব প্রশমনের পরে হেমচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আজ তোর সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দর্শন হল।"

ইহার পর পঞ্চম দোলের উৎসব। হেমচন্দ্র গাহিতেছেন :

"আবেশে চমকি চাই, বল কোথা দেখা পাই ?
মনব্যথা মনে গাঁথা থাকে।
মরমে যে ছবি আঁকি, অনিমেষে চেয়ে থাকি ;
দেখা দিবে দিতে ফাঁকি কে শিখাল তাঁকে ?"

"মরমে যে ছবি আঁকি, অনিমেষে চেয়ে থাকি", এ কলিটি গীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখে উপবিষ্ট গুরুদেব ভাবাবেশে তাঁহার পদযুগল হেমচন্দ্রের বুকে ন্যস্ত করিলেন। পাদস্পর্শে হেমচন্দ্রও ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। গান বন্ধ হইয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া হেমচন্দ্র নিম্নোক্ত গানখানি গাহিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার তৎকালীন মনোভাবের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

"নবভাবে ভরিল জীবন,
ঘুচিল বিষাদ ঘোর, পুলকিত মন।

লৌকিক সুখ যত সকলি হইল হত।

*　　*　　*

নবীন জলদ শ্যাম দিল দরশন।"

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—মীরাটে অবস্থানকালীন একদিন গুরুদেব হেমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুই ভগবান সম্বন্ধে কি বুঝেছিস বল।" উত্তরে হেমচন্দ্র নিম্নলিখিত পদটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন ঃ—

"কেউ তো ভাই ভজে না তাঁরে,
যে করেছে সৃজন, সেই তো ভজে সবারে।"

এই কথা শুনিবামাত্র গুরুদেব সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। বাস্তবিকই কথাটি যে সুগভীর তত্ত্বপূর্ণ ও অদ্বৈতভাবব্যঞ্জক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেদিন যে মন দিয়া যে অনুভবের সহিত হেমচন্দ্র উহা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা গুরুদেবের অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল, তাঁহাকে সমাধিস্থ করিয়াছিল। আর ইহাও বুঝাইয়া দিয়াছিল, আদর্শ গুরু যেরূপ সমবেদনা বশে আপন ভাব শিষ্যে সঞ্চারিত করেন, আদর্শ শিষ্যের ভাবের যথার্থ অভিব্যক্তিও সেইরূপ গুরুর মহাভাবের উদ্দীপক হইয়া থাকে।

গুরুভাব

গুরুদেব হেমচন্দ্রকে কোন মন্ত্রদীক্ষা দেন নাই। আমরা দেখিয়াছি গুরুদেব স্থূল শরীরে বিদ্যমান থাকিতে থাকিতেই হেমচন্দ্রের জীবনে গুরুভাবের স্ফুরণ আরম্ভ হইয়াছিল। পরে ঐ ভাবে আকৃষ্ট হইয়া যাঁহারা তাঁহার সমীপে আগমন করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগের কাহাকেও কোন প্রকার মন্ত্রদীক্ষা দেন নাই। এই সকল ভক্তদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার পুণ্যসঙ্গ প্রভাবে গতানুগতিক সংসারপথ পরিত্যাগ করতঃ যথাসাধ্য শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শ অনুসরণ করিয়া নিজ নিজ ধর্মজীবন গঠনে চেষ্টিত, আবার কাহারও জীবনধারা আপাতদৃষ্টিতে এখনও পূর্বপথ বাহিয়াই চলিয়াছে। এ বিষয়ে কার্যকারণের

অবতারণা না করিয়া আমরা গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা সারিয়া লইতে ইচ্ছা করি। হেমচন্দ্র বলিতেন, "দেখ বাবা, যদি কেহ শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় বা ভাবে আকৃষ্ট না হয়, জানবে তিনি স্বয়ংই ঐরূপ করছেন, আর বলতে চাইছেন, 'আমি সবই জানি, কিন্তু আমার যে এখনও খেলার সখ মেটেনি। তাই তো শুনেও শুনছিনি, জেনেও জানছিনি, দেখেও দেখছিনি।' তিনি যে ভগবান! তাঁর ইচ্ছা না হলে, জোর করে কে তাঁকে এ খেলা থেকে নিবৃত্ত করবে?"

যে সকল ভক্ত তাঁহার যৌবনকালেই অথবা পরিণত বয়সে হেমচন্দ্রকে গুরুরূপে বরণ করিয়াছিলেন, অনেক ক্ষেত্রেই হেমচন্দ্র-চরিত্রে গুরুভাব প্রকাশক ঘটনাবলীর সহিত তাঁহাদের জীবন অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। তাঁহাদের জীবদ্দশায় এ সকল ঘটনাবলীর বিস্তৃত আলোচনা নীতি এবং রুচি বিরুদ্ধ হইবে আশঙ্কায় এ বিষয়ে আমরা অধিক দূর অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করি না। ঈশ্বরেচ্ছায় ভবিষ্যতে কেহ এ ভার গ্রহণ করিয়া আমাদিগের আরব্ধ কার্য সুসম্পন্ন করিবেন ইহাই আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা। অতএব আনুষঙ্গিকভাবে মাত্র দুই একটি কথার উল্লেখ করিয়া আমরা এ বিষয়ে নিরস্ত হইব। যে সকল ভক্ত হেমচন্দ্রের সংস্পর্শে আসিয়া আধ্যাত্মিক জীবনের প্রেরণা লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন তন্মধ্যে ছিলেন—বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত, নিরক্ষর মূর্খ; সত্ত্বগুণী সাধু, তমোগুণী সংসারী, ছিলেন শিক্ষক, ছাত্র; বালক, যুবা, বৃদ্ধ; পুত্র, কন্যা, পিতামাতা। হেমচন্দ্র সকলকেই যথোচিত সমাদর করিতেন। আমরা দেখিয়াছি তাঁহাকে ধনীভক্তের গৃহে, প্রাসাদোপম অট্টালিকায়, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুইয়া আনন্দে রাজভোগ প্রসাদ গ্রহণ করিতে; আবার দীন, দরিদ্র ভক্ত সন্তানের পর্ণকুটীরে সামান্য আহার্যেই পরম পরিতুষ্ট হইয়া সকলকে লইয়া আনন্দ-স্রোতে গা ভাসাইয়া দিতে। দেখিয়া শুনিয়া আমাদের অনেকেরই মনে হইত—ঈশ্বরের নামই তাঁহার যথার্থ আহার, ঈশ্বরের ভাবই তাঁহার যথার্থ বিহার, আর "যে জন গোবিন্দ ভজে" সেইই তাঁহার সত্যকারের আপনার।

হেমচন্দ্রের গুরুদেব দেন নাই তাঁহাকে কোন মন্ত্র; তেমনি দেন নাই তাঁহাকে কোন গৈরিক বস্ত্র। ছিল না তাঁহার বৈরাগ্যের কোন বাহ্য চিহ্ন—ছিলেন তিনি সম্পূর্ণ অনিকেত। গুরুদেব একদিন কৌতুকচ্ছলে বলিয়াছিলেন, "হেম, তোকে আমি লাল পাড় কাপড় পরিয়ে শহরের মাঝে বসিয়ে রাখব।" করিয়াছিলেনও তাহাই।

হেমচন্দ্রকে আমরা কথাপ্রসঙ্গে অনেকবার বলিতে শুনিয়াছি—হাতীর দুইরকম দাঁতের কথা। এক রকম দাঁত দিয়া সে খায়, আর এক রকম দাঁত—বাহিরের দাঁত, যাহাকে বলে show teeth। যে দাঁত দিয়া হাতী খাইয়া বাঁচিয়া থাকে উহা যেমন চিরদিনই লোকচক্ষুর অজ্ঞাতেই থাকিয়া যায় তেমনি সকল লৌকিকতা, সকল লোকাচার, সকল ব্যবহারিক ভাবের পশ্চাতে লুকায়িত থাকিত হেমচন্দ্রের নিজস্ব দৃষ্টি, নিজস্ব ভাব, যাহার বিদ্যুৎচমক কখনও কখনও আমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টিকে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে, বজ্রনির্ঘোষ অনেক স্থলে আমাদের বিচার-বুদ্ধিকে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছে। এমনি একদিনের কথা। সেদিন জনৈক যুবক, সবেমাত্র কিছুদিন হইল হেমচন্দ্রের নিকট যাতায়াত করিতেছে,—কথাপ্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় হেমচন্দ্রের একজন পরম পণ্ডিত, নিতান্ত অনুরক্ত ভক্তশিষ্যের কথা উল্লেখ করিয়া হেমচন্দ্রকে বলিল, "হাঁ, এরূপ হতে পারলেই জীবন ধন্য হয়, সকলই সার্থক হয়।" যুবকটি ভাবিয়াছিল হেমচন্দ্র নিশ্চয়ই তাহার উপরোক্ত কথা সর্বতোভাবে সমর্থন করিবেন এবং বলিবেন—"সত্যই তো তাই।" ইহা ছাড়া আর কি উত্তরেরই বা আশা করা যাইতে পারিত? যাঁহার কথা হইতেছে, বস্তুতঃ তিনি সকল শ্রেষ্ঠ প্রশংসারই যোগ্যপাত্র। হেমচন্দ্র নিজেও তাঁহাকে বহু সমাদর করিতেন। বিশেষ ভালবাসিতেন এবং জ্ঞানভক্তির আদর্শস্থল বলিয়া সকলের নিকটে তাঁহার অকুণ্ঠিত প্রশংসাও করিতেন। অতএব যুবকটির পক্ষে এরূপ উত্তরের প্রত্যাশা করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছিল। কিন্তু উত্তর আসিল অন্যরূপ। ভাবিয়া চিন্তিয়া নয়, কাহারও মুখের দিকে তাকাইয়া নয়, সম্পূর্ণ অকস্মাৎ, সম্পূর্ণ স্বাধীন, সম্পূর্ণ স্পষ্টভাবে উত্তর দিলেন

হেমচন্দ্র সেই স্বল্পপরিচিত, স্বল্পজ্ঞান যুবকের কথায়; বলিলেন, "অনুকরণ করিও না, original হও।" স্তম্ভিত হইল যুবক এই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত উত্তরে। চিন্তাধারা অর্ধপথে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ভিন্নপথে ধাবিত হইল। কে সে? কোথায় তাহার স্থান? জানি না ধর্মজগৎ হইতে কত দূরে কোন্ স্তরে পড়িয়া আছে সে। জীবনের ঘোর অন্ধকার ভেদ করিয়া ধর্মের ক্ষীণ দীপালোক হয়তো তখনও তাহার নিকট আসিয়া পৌঁছায় নাই; কখন আসিবে কে জানে। তাহাকে বলা হইতেছে কিনা, "অনুকরণ করিও না, original হও।" কি সে orginality? আর যিনি এমন কথা বলিতে পারেন—জগতের সমস্ত ভেদাভেদ, ভালমন্দ, পাপপুণ্য, জ্ঞান-অজ্ঞান, এমন কি ভক্তি-অভক্তিরও সমস্ত ব্যবধান ভেদ করিয়া কোথায় তাঁহার দৃষ্টি পৌঁছিয়াছে? যেমন তিনি বলেন, সত্যই কি তিনি অনুভব করেন সকলের মধ্যেই সেই এক নিত্য, বুদ্ধ, শুদ্ধ আত্মাকে? বাস্তবিকই কি তাঁহার দৃষ্টি এই মায়ার জগতের ছোটবড়, ভালমন্দের দ্বারা এক মুহূর্তের জন্যও প্রতিহত হয় না? তাহা না হইলে একথা কেমন করিয়া বলা সম্ভব? এ জোর কোথা হইতে আসে? এ অপার্থিব দৃষ্টি কি করিয়া লব্ধ হয়? মানের প্রত্যাশায়, ধনের প্রত্যাশায়—অপরের মুখ চাহিয়া তাহার মনোমত কথা বলা অন্য কথা। এই যুবকের নিকট কি প্রত্যাশাই বা করিবার আছে? তাহার মনোরঞ্জনের চেষ্টাতেই বা কি লাভ? সে দিন অন্ততঃ যুবকটির মনে হইয়াছিল, সত্যই আমরা নিজেদের সম্বন্ধে যতটা জানি মহাপুরুষেরা তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী জানেন। আর তাঁহাদের এই জানা—এই স্বরূপজ্ঞান অব্যাহত থাকে বলিয়াই তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া মানুষ আত্মবিশ্বাসী হইতে শিখে। তাহার পক্ষে হয়তো কোন দিন আত্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হইয়া ওঠে।

আমাদের মধ্যে হয়তো কাহারও বিচারশীল মন, ভক্তিবিহীন চিত্ত, নিরন্তর এটা সেটা ভাবিয়া ভাবিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে; মৃদু তিরস্কার সহকারে বলিলেন তাহাকে হেমচন্দ্র, "সেই বিচারই বিচার, যা দিয়ে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, আর সব অবিচার।" আর না হয় স্নেহার্দ্র কণ্ঠে

বলিলেন, "ঈশ্বরের দযা বলেও তো একটা জিনিস আছে।" বোধ হয তাহাব মনে হইল—বাস্তবিকই কত কথাই তো ভাবিযা, কত কার্যকাবণেব যুক্তিই লাগাইয়া দিন কাটিতেছে। কিন্তু কই, ভগবানেব দয়া বলিয়া কিছু আছে এ কথা তো একবারও ভাবা হয় নাই। সে দিক দিয়া তো কখনও দেখিবার চেষ্টা কবা হয় নাই। আবার সময়ান্তবে কোন ভক্তসন্তানকে ত্যাগ বৈরাগ্যেব জন্য দুর্বলভাবে প্রার্থনা করিতে দেখিয়া নির্মমভাবে বলিতেছেন, "ত্যাগেব জন্য আবাব প্রার্থনা কি? ত্যাগ কবতে হয়।" এমনি ভাবে হেমচন্দ্রের কথাবার্তা, কাজকর্ম, সকল উপদেশেব মধ্যেই ফুটিযা উঠিত তাঁহাব জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মেব সামঞ্জস্য বিধাযক ভাব। আমরা তাঁহাকে শ্রীশ্রীঠাকুরেব কথাব পুনরুক্তি করিয়া সময়ে সময়ে কথাপ্রসঙ্গে বলিতে শুনিতাম, "আমি এক-ঘেয়ে হ'তে যাব কেন? আমি ঝোলে খাব, ঝালে খাব, অম্বলে খাব।"

মহাপ্রয়াণ

এইবাবে কথাব শেষ বা শেষেব কথা। আরম্ভকে যখনই মানিয়া লইযাছি তখনই অজানিতভাবে শেষকেও স্বীকার কবিতে হইয়াছে। জন্মকে যখনই ববণ কবিযাছি, ইচ্ছায হউক, অনিচ্ছায হউক, মবণকে এড়াইবার উপায় নাই। তাই লৌকিক দৃষ্টিতে, লৌকিক ভাবে, ১৩৫১ সাল, ১৮ই পৌষ তাবিখে হেমচন্দ্রের লৌকিক জীবনও ফুরাইয়া গেল। লৌকিক বলিতেছি, কাবণ, যাঁহারা সেই অলৌকিক দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন কেবলমাত্র তাঁহারাই বলিতে পাবেন—তিনি অজ, অমব, জন্মিযাও জন্মেন না, মরিয়াও মরেন না। কিন্তু ভূপৃষ্ঠ ছাড়িয়া দাঁড়াইতে না পাবিলে পৃথিবী ঘুবিতেছে এ কথা বলা যেমন কথাব কথা, তেমনই জন্ম-মবণেব পারে গিয়া দাঁড়াইতে না পারিলে, জন্ম-মৃত্যুর রহস্য ভেদ হয় না—অজ, অমর এ সকল কথাও অর্থহীন শব্দ মাত্রই থাকিয়া যায়। অপার্থিব দৃষ্টিতে হেমচন্দ্রের মহাপ্রযাণরূপ ব্যাপারটিকে দেখিবার বা বুঝিবাব ক্ষমতা আমাদেব নাই। তাহা ছাড়া আমবা পূর্বেও বলিযাছি এবং পুনরায়

আরও একবার বলিতে ইচ্ছা করি—হেমচন্দ্র-চরিত্রে আমরা ঈশ্বরত্ব আরোপ করিতে চাহি না, কেননা ঈশ্বর কি বস্তু তাহা আমরা জানি না ; দেবত্বও আরোপ করিতে চাহি না, কেননা দেবতা কি তাহাও আমরা অবগত নহি। তবে, আমরা নিঃসঙ্কোচে এ কথা বলিতে পারি, তাঁহার জীবনে যে সত্যের বিকাশ, আনন্দের বিকাশ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি—মৃত্যুশয্যায়ও এক মুহূর্তের জন্যও তাহার ব্যতিক্রম হইতে দেখি নাই। মৃত্যু আসন্ন জানিয়াও তাঁহাকে কেহ কখনও তিলমাত্র ভীত হইতে দেখে নাই—বরং বলিতে গেলে বলিতে হয়, আনন্দ করিতেই দেখিয়াছে। আমরা পুস্তকের পাতায় পড়িয়াছি, "ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয়? ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।" স্থানে স্থানে মৃত্যুকে "ঈশ্বরের দূত" আখ্যাও দেওয়া হইয়াছে। কবির ভাষায় বলিতে শুনিয়াছি, "মরণরে তুঁহু মোর শ্যাম সমান।" এ সকল কথার প্রকৃত তাৎপর্য কি তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। কিন্তু দেখিয়াছি, আর যতই দিন ঘনাইয়া আসিতে লাগিল ততই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর রূপে তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি—"ঠাকুরের কাছে যাব, আর কত দেরী?" বলিতে পারি ইহা রোগের প্রলাপ—অসহ্য ব্যাধিযন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইবার প্রবল ইচ্ছার বাহ্য অভিব্যক্তি। কিন্তু, প্রলাপের রোগী কি শুধু ছাড়িয়া যাইতেই চায়? যাহাকে ছাড়িয়া যাইতেছে, সংস্কার বশে তাহাকে কি একবারও আঁকড়াইয়া ধরিতে চায় না? তাহার জন্য কি এক ফোঁটা চোখের জলও গড়াইয়া পড়ে না? ভুল করিয়াও কি সে একবার ফিরিয়া দেখে না তাহার আজীবনের খেলাঘর—যাহা সে চিরদিনের মত ছাড়িয়া যাইতেছে? একবারও কি কোথায়, কোন্ অজানা রাজ্যে প্রস্থান করিতেছে ভাবিয়া তাহার হৃদয় কাঁপিয়া ওঠে না, মুখ মলিন হয় না? তাহার জৈব সংস্কার বিচ্ছেদব্যথায় ক্ষণিকের তরেও কি কাঁদিয়া ওঠে না? যদি তাহা না চায়, যদি তাহা না হয়, বুঝিতে হইবে সে নিছক বিকারের রোগী নয়। রোগের যন্ত্রণা অতিক্রম করিয়া নিশ্চয়ই ভাসিয়া উঠিয়াছে তাহার মানসচক্ষে কোন্ এক দিব্যধাম, কোন্ এক

আনন্দধামের ছবি। জগতের সমস্ত কোলাহল ভেদ করিয়া পৌঁছিয়াছে তাহার কাণে কোন্ সুদূরের প্রিয়তমের বংশীর সুরলহরী, যাহার আহ্বানে, যাহার আকর্ষণে, জগৎ ভুলিয়া, রোগের যন্ত্রণা ভুলিয়া, আজ সে আনন্দে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত। আমরা দেখিয়াছি, যখন কাসিতে কাসিতে প্রাণ নির্গত হওয়ার উপক্রম, তখনও ব্যঙ্গচ্ছলে কাসির গান রচনা করিতেছেন। কাহারও সহিত কোনও লৌকিক সম্বন্ধ নাই, তবুও জনে জনে ডাকিয়া কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। "অসংখ্য বন্ধন মাঝে" কি করিয়া একাকী থাকিতে হয় তাহা বিলক্ষণ জানা ছিল বলিয়াই শেষের ডাক আসিলে বন্ধন খুলিতে এতটুকুও বিলম্ব হইল না—একবার পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিবারও প্রয়োজন হইল না। গুরুদেব একদিন হেমচন্দ্রকে "অন্তে যেন ও চরণ পাই" গাহিতে শুনিয়া ধমক দিয়া বলিয়াছিলেন, "অন্তে কেন? বল্, জ্যান্তে যেন চরণ পাই।" বাস্তবিকই, অন্তে চরণ পাইবার আশায় যে বসিয়া থাকে, অন্তে সে চরণ পাইলেও পাইতে পারে, কিন্তু যে জ্যান্তে চরণ পায়, অন্তে তো তাহার পাওয়া হইয়াই আছে।

এই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জল, স্থল, আকাশ, বাতাস পরিব্যাপ্ত করিয়া যে আনন্দ বিদ্যমান উহাই সংহত হইয়া একদিন এক অভিনব মূর্তিতে নরাকারে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল—মূক প্রকৃতির অন্তর-গুহাস্থিত অব্যক্ত-সত্তা মানবের ভাষায় অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল—জড় প্রকৃতির অঙ্ক-শায়িত সুপ্ত চৈতন্য জাগ্রত হইয়া মানব দেহাবলম্বনে লীলায়িত হইয়াছিল। সেই পুণ্য জন্মকথা স্মরণ করিয়া, পরমানন্দ-মাধবের সেই পরম প্রকাশকে বন্দনা করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়াছিলাম। আসুন, যখন সেই সংহত রূপ ব্যাহত হইতেছে—ব্যষ্টিরূপ সমষ্টিতে পরিণত হইতেছে—বিশিষ্টাদ্বৈত অদ্বৈতে বিলীন হইতেছে—স্বরূপানন্দের আনন্দ-স্বরূপে প্রত্যাবর্তন ঘটিতেছে তখন আমরা মানসচক্ষে সেই পুনর্যাত্রা দর্শন করিতে করিতে আনন্দে এই প্রসঙ্গ সমাপন করি।

"মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্ন সন্তোষধীঃ ॥
মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ ॥*

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥"†

---

* সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তির নিকটে সমীরণ মধু বহন করে, নদীসমূহ মধু ক্ষরণ করে। আমাদিগের নিকটে ওষধিসমূহ মধুময় হউক, রাত্রি মধুময় হউক, উষা মধুময় হউক, পৃথিবীর ধূলি মধুময় হউক, আমাদিগের নিকটে বনস্পতি মধুময় হউক, সূর্য মধুময় হউক।—ঋগ্বেদ ১।৯০।৬-৭

† উহা (পরব্রহ্ম) পূর্ণ, ইহাও (নামরূপস্থ ব্রহ্মও) পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণ উদ্গত হন। পূর্ণের (কার্যব্রহ্মের) পূর্ণত্ব [বিদ্যাসহায়ে] গ্রহণ করিলে পূর্ণই (পরব্রহ্মই) অবশিষ্ট থাকেন। ওঁ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হউক।—বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৫।১।১।১

ভগবৎ প্রসঙ্গ

অবতার

ঈশ্বর মানব আকারে জন্মগ্রহণ করেন কি ?

শিষ্য। বাবা, আমার একজন বন্ধুকে শ্রীশ্রীঠাকুরবাড়ীতে আসতে বললাম। তিনি বললেন, "মানুষ পূজো আমি পছন্দ করিনে। পরমহংসদেবকে তোমরা পূজো কর, বেশ কর। কিন্তু আমি তাতে যোগ দিতে চাইনে।"

গুরু। তা বেশ তো। পরমহংসদেবকে না হয় নাই মানলেন। অন্য কাউকে মানেন তো ?

শিষ্য। না, বাবা, তা নয়। তিনি কাউকেই মানতে রাজী নন। তিনি বলেন যে অসভ্যদের গাছ পাথর পূজোও যা, এও তাই।

গুরু। তুমি কি উত্তর দিলে ?

শিষ্য। আমি কিছু উত্তর না দিয়ে তাঁকেই জিজ্ঞাসা করলাম, "কী ভাবে পূজো করা আপনার মতে ভাল ?" তিনি উত্তর দিলেন, "সৃষ্টি ব'লে আলাদা আর কি আছে ? তিনিই সব, এইটে ধারণা করাই পূজো।" আমি তখন তাঁকে বললাম, "চমৎকার কথা। এইটি ধারণা হবার জন্য আপনি নিজে কী ক'রে ফল পেয়েছেন আমাকে একটু বলুন।" তখন তিনি বললেন, "সে বড় কঠিন কথা। কিন্তু এইটি পারছি না বলেই, যেটি ভুল সেটিকে মেনে নিতে হবে, এর কি কোনও কারণ আছে ?"

গুরু। তোমার বন্ধুটি কী করেন ?

শিষ্য। তিনি অ্যাটর্ণী।

গুরু। তুমিও তো খুব দেখছি। অ্যাটর্ণীর কাছে অ্যাটর্ণীগিরি শেখা যায়। ধর্ম কি করে শেখাবেন ? আর তোমাকে এও বলি

যে যাঁরা ধর্মচর্চা করছেন, তাঁদের মধ্যেও অনেকে মহাপুরুষের ব্যাপার ঠিকমত বুঝতে পারেন না।

শিষ্য। সে কি ক'রে সম্ভব, বাবা? যাঁরা ধর্ম নিয়ে রয়েছেন, তাঁরাও 'মহাপুরুষ' বুঝতে পারেন না?

গুরু। আমি বলেছি ঠিকমত বুঝতে পারেন না। আচ্ছা, তোমাকে আমার জীবনের একটা ঘটনা বলি। স্বনামধন্য শিবনাথ শাস্ত্রী মশাইর কথা বলছি। উনি তখন আমাদের পাড়াতেই থাকতেন। আমার গুরুভাই নফরচন্দ্র কুণ্ডুর কুলীদের জন্য আত্মত্যাগের উৎসব উপলক্ষে অপর সকলের কাছে যেমন চাঁদা চাইতে গিয়েছি, শাস্ত্রী মশাইর কাছেও গিয়েছি। একথা সেকথার পরে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবা, তুমি কি কর?" আমি তখন অ্যাটর্ণী আপিসে কাজ করি; সে কথা তাঁকে জানালাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "অফিস থেকে এসে তুমি কি কর?" আমি উত্তর দিলাম, "ঠাকুর পূজো করি।" "কী ঠাকুর পূজো কর?" তাঁর এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বললাম, "পরমহংসদেবকে পূজো করি?" তিনি তখনই জিজ্ঞাসা করলেন, "কী ভাবে পূজো কর?" আমি জবাব দিলাম, "কেন, ভগবান বোধে পূজো করি।" শাস্ত্রী মশাই তখন বললেন, "বাবা, এটি তো বুঝতে পারলাম না। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল, তিনি আমায় ভালবাসতেন। তাঁর এক রকম মূর্ছার মত হত।" তখন আমি শাস্ত্রী মশাইকে বললাম, "আচ্ছা, আপনি তো পণ্ডিত মানুষ। আমাকে গীতার এই কথাটার মানে বুঝিয়ে দিন, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'।" তিনি এর আর উত্তর দিলেন না। কিছু চাঁদা দিলেন। এবং সুবিধা হলে উৎসবের সময় বক্তৃতা দিতেও সম্মত হলেন। আমার প্রশ্নটা কিন্তু রয়েই গেল। ভগবান যদি সব পারেন তবে তিনি মানুষের বেশেই আসতে পারেন না কেন? এবং সে কথা কাউকে কাউকে বোঝাতেই বা পারবেন না কেন?

অবতারত্বের কারণ সম্বন্ধে রাজার উপাখ্যান

শিষ্য। কিন্তু, বাবা, তাঁব গবজ কি? কেন তিনি এভাবে আসবেন?

গুরু। আমাব গুরুদেব এ বিষযে আমাকে একটি গল্প বলেছিলেন। একজন বাজা অবতারবাদে বিশ্বাস করতেন না। তাঁব মন্ত্রী কিন্তু বিশ্বাসী। তা হলেও তিনি বাজাকে কিছুতেই বোঝাতে পাবেন না। সেজন্যে একটি মতলব করলেন। বাজাব প্রাচীন বয়সে একটি ছেলে হয়েছে। সেটি তাঁব চক্ষের মণি। সেই ছেলেব হুবহু একটি প্রতিমূর্তি মন্ত্রী গোপনে কবিযে বাজপুত্রের পোষাক পরিযে এমন সুন্দর কবে সাজালেন যে খুব কাছে গিয়ে নজব করে না দেখলে কোন্‌টি আসল, কোন্‌টি নকল বোঝাই যায় না। তাবপবে রাজাকে নিয়ে একদিন গঙ্গাতে বেড়াতে গেলেন। ছেলেকে জাহাজে তোলা হচ্ছে দেখে রাজা বললেন, "আবাব এটিকে কেন?" মন্ত্রী বললেন, "এখন ঝড জলেব সময় না। আমবাও সবাই রয়েছি। কোনও ভয় নেই। একটু গঙ্গাব হাওয়া খেযে রাজপুত্র প্রফুল্লই হবে।" রাজা আর আপত্তি কবলেন না। এদিকে মন্ত্রী ধাইকে শিখিয়ে দিয়েছেন যে ছেলেটি ভিতবে রেখে প্রতিমূর্তিটি নাচাতে নাচাতে যেন হঠাৎ ফেলে দেবাব ভান করবে। তাই কবতেই রাজা তাড়াতাড়ি লাফ দিয়ে গঙ্গায় পডলেন। মন্ত্রী বা আর কাক বাধা মানলেন না। মন্ত্রী কিন্তু সত্যিকাব ছেলেটির গায়ে একটু জল ছিটিয়ে তখনই বাজার সামনে এনে বললেন, "মহারাজ, আমরা সবাই তো রয়েছি। বাজপুত্র কি আমাদেব কেউ নন? আপনি ব্যস্ত হয়ে লাফালেন কেন?" বাজা বললেন, "তোমবা রয়েছ, তা জানি বই কি? কিন্তু এ আমাব ছেলে যে। আমি লাফাব না?" মন্ত্রী তখন বললেন, "মহারাজ, ভগবানকেও ঠিক এইজন্যই অবতীর্ণ হতে হয়।"

পাতকুয়ার ব্যাঙ এবং সমুদ্রের ব্যাঙের উপাখ্যান

শিষ্য। আচ্ছা, বাবা, আমরা সবাই যদি ভগবানের ছেলে, তবে ভগবান আমাদের সকলের জন্যেই অবতীর্ণ হন না কেন? দুই-চারজন তাঁকে পেয়ে, বুঝে, ধন্য হয়। আর সকলের পক্ষে তাঁর আসা না আসা নিরর্থক হয়;

গুরু। শ্রীশ্রীঠাকুর একথাও আমাকে আর একটি গল্প ব'লে বুঝিয়েছিলেন। প্রায় পাতকুয়াতেই ব্যাঙ থাকে। একটি পাতকুয়ার ব্যাঙ পাতকুয়াতে থেকেও বাইরের কথা ভাবত। দেখত পাতকুয়ার ঠিক উপরটাতে একটুখানি আকাশ; কোনও সময়ে সূর্যকিরণে প্রদীপ্ত, কোনও সময়ে অন্ধকারে আবৃত; কোনও সময়ে তারকাখচিত, কোনও সময়ে চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত, কখনও বিদ্যুৎচমকিত; কখনও গভীর মেঘাবৃত। ঐ পাতকুয়ার ব্যাঙটি কেবলই ভাবে এ কী রহস্য। কিন্তু উঠবার ক্ষমতা নাই যে ঐ রহস্যের সমাধান করে। এইভাবে কিছুদিন যায়। এমন সময় আর একটি ব্যাঙ সেই কুয়াতেই এসে পড়ল। পাতকুয়ার ব্যাঙ নবাগত ব্যাঙকে জিজ্ঞাসা করল, "তুই কোথা থেকে এলি রে?" নবাগত ব্যাঙ উত্তর দিল, "আমি সমুদ্র থেকে আসছি।" পাতকুয়ার ব্যাঙ জিজ্ঞাসা করল, "সমুদ্র আবার আছে নাকি? সমুদ্রটা কি রকম? সমুদ্রটা কত বড?" এ প্রশ্ন শুনে সমুদ্রের ব্যাঙটা হাসতে লাগল। পাতকুয়ার ব্যাঙ চটে গিয়ে তাকে এক চড লাগাল। তবু সমুদ্রের ব্যাঙটার হাসি থামে না। তখন পাতকুয়ার ব্যাঙ একটা পা বার ক'রে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "সমুদ্রটা এই ঠ্যাংএর মত বড?" এবারেও কোনও উত্তর না দিয়ে সমুদ্রের ব্যাঙ হাসতে লাগল। তখন পাতকুয়ার ব্যাঙ ভীষণ রেগে আবার চড বসিয়ে তার দুটি পা ফাঁক ক'রে সমুদ্র তত বড কিনা জিজ্ঞাসা করল। সমুদ্রের ব্যাঙের হাসি আর থামে না। পাতকুয়ার ব্যাঙের চডও আর থামে না। তখন পাতকুয়ার ব্যাঙটা আশ্চর্য হল।

ভাবল, "তিন তিনবার চড় দিলাম, এ ব্যাঙটি মোটেই রাগলে না, কেবলই হাসছে। এর একটা বিশেষত্ব আছে দেখছি। তা হলে সমুদ্রও একটা অদ্ভুত কিছুই বা হবে।" এই ভেবে পাতকূয়ার ব্যাঙটা কুয়ার এপাশ থেকে ওপাশ, আবার ওপাশ থেকে এপাশ বারে বারে লাফাতে লাগল। জিজ্ঞাসা করল, "সমুদ্রটা এত বড় ?" তার এই রকম লাফালাফি দেখে সমুদ্রের ব্যাঙটা তাকে বলল, "ভাই, তোর সমুদ্র দেখবার সাধ হয়েছে বুঝেছি। কিন্তু, ভাই, এই কূয়ো থেকে না উঠলে তো সমুদ্র দেখা যাবে না। তবে তোর যখন ইচ্ছে হয়েছে তখন জোটপাট হবে বই কি।" একথা হবার কিছু দিন বাদেই একদল পথিক ঐ কূয়াটি গাছের কাছে পেয়ে ভাবল যে কূয়ার জল তুলে ছায়াতে রাঁধাবাড়া ক'রে তার পরে আবার পথ চলা যাবে। এই মনে ক'রে একটা ডোল কূয়ার মধ্যে যেই নামিয়েছে অমনি সমুদ্রের ব্যাঙটা পাতকূয়ার ব্যাঙকে বলল, "ওরে, এই মস্ত সুযোগ। লাফিয়ে পড়, ডোলের মধ্যে লাফিয়ে পড়।" পথিকেরা ডোলটি তুলে ব্যাঙ দুটি শুদ্ধ জল ফেলে দিল। তখন সমুদ্রের ব্যাঙ বলল, "এইবারে যখন পাতকূয়ো থেকে উঠেছিস, আয়, আমার সঙ্গে আয়, তোকে সমুদ্রে নিয়ে যাই," এবং একটি প্রকাণ্ড লাফ দিল। পাতকূয়ার ব্যাঙ তাই দেখে বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে পড়ল। বুঝতে পারল যে সমুদ্রের ব্যাঙ-এর শক্তি কতটা বেশী। এবং ক্ষমাই বা কি চমৎকার। তখন "গুরু, গুরু" বলে ডাকতে গিয়ে "গু....গু..." করছে। সমুদ্রের ব্যাঙ দাঁড়িয়ে রইল। খানিক বাদে পাতকূয়ার ব্যাঙ হাঁপাতে হাঁপাতে হাজির হল ; এবং বলল, "আপনি অত জোরে লাফ দেবেন না। তা হলে আপনার সঙ্গে আমি যাব কেমন করে ?" সমুদ্রের ব্যাঙ প্রবোধ দিয়ে বলল, "ভাই, তুইও ঠিক আমারই মতন লাফ দিতে পারিস। তবে ছোট্ট কূয়োর মধ্যে থেকে থেকে তোর পায়ে খিল ধরে গিয়েছে। আচ্ছা, আমি আস্তে আস্তেই চলছি।" দুজনে মিলে খানিক অগ্রসর হতেই সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে। পাতকূয়ার ব্যাঙ জিজ্ঞাসা করলে, "এই হু হু শব্দটা কি ?" সমুদ্রের ব্যাঙ বললে, "এই তো সমুদ্র।"

এই কথা শুনে পাতকুয়াব ব্যাঙ একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল।....বাবা, শ্রীভগবানের স্পর্শ এমন মধুর যে সে সমুদ্রের হিল্লোল কল্লোলেই প্রাণ জুড়িয়ে যায়। সমুদ্র পর্যন্ত যাওয়ার দরকার হয় না।

নিন্দা, নির্যাতন অবতারের অঙ্গের ভূষণ

শিষ্য। বাবা, এ আখ্যানটি বড় চমৎকাব। আপনি যখন সমুদ্রেব ব্যাঙের কথা বলছিলেন, বোঝাচ্ছিলেন, পাতকুয়ার ব্যাঙও সমুদ্রেব ব্যাঙেবই মতন, তখন মনে হচ্ছিল যে উপনিষদেব সেই "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" শুনছি। বাবা, পাতকুয়াব ব্যাঙের ব্যাকুলতাব ফলে সমুদ্রের ব্যাঙের সংসার কূপে অবতরণ, তাবপব তাঁব সাহচর্যে পাতকুয়ার ব্যাঙেব উদ্ধাব,—এসব আমার জীবনে মেলে কই? কেবল একটি মেলে। শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপবে বলেছিলেন, "অবজানন্তি মাং মূঢা মানুষীং তনুমাশ্রিতম্" কিন্তু এই কলিকালেও অবতারের সংসাব-কূপমণ্ডূকদের হাতে অপমান ও হতাদব অব্যাহতভাবেই চলেছে।

গুরু। বাবা, যাদেব কথা বলছ তাদের জন্যেই তো শ্রীভগবানকে দবকাব। তুমি কি জান না যে অল্পদামের ষ্ট্যাম্প কাগজ কলেক্টরেটের কেবাণীবাই বাব কবে দিতে পাবেন? কিন্তু বেশী টাকার ষ্ট্যাম্প দরকার হলে কলেক্টর সাহেবকে নিজেই আসতে হয়?

শিষ্য। বাবা, এ কি ভাল লাগে? আমবা সর্বাঙ্গে ঘা নিয়ে সেগুলি বাব ক'রে ক'বে ভিখাবীর মত বাজাধিবাজের শুভাগমনেব জন্য পথেব পাশে বসে থাকব? তাঁর অভ্যর্থনাব এই কি যোগ্য আয়োজন?

গুরু। বাবা, তুমি তাঁকে বাজাধিবাজ বলছ। বাজার মাথায় সোনাব মুকুট। তাঁর মাথায়ও যদি সোনাব মুকুট দাও, তবে তিনি বাজাধিবাজ হবেন কি ক'বে? তাই শ্রীযীশুর মাথায় কাঁটাব মুকুট। সেই মুকুটের প্রতি ক্ষতচিহ্ন যে তাঁব প্রেমেবই নিদর্শন। এতে ক'রে তাঁর মাথাব চাবদিকে যে জ্যোতির মণ্ডলেরই ব্যঞ্জনা পাই।

শ্রীযীশু যখন নির্যাতনকারাদের জন্য ক্ষমা চাইছেন, তখন তিনি বলছেন, "এরা জানে না যে এরা কা করছে।" তিনি কি শুধু এইটে বলতে চাইছেন যে,"আমি অবতার একথা না বুঝতে পেরে এরা আমাকে নিগৃহীত করছে?" তিনি কি এটাও বলতে চাইছেন না যে, "এরা এই সব অত্যাচার ক'রে আমার মহিমাই বিঘোষিত করছে, সে কথা এখন তারা জানে না। তাই তাদের ক্ষমা করা দরকার?" তুমি কি জান না যে ভৃগুপদচিহ্ন তাঁর বক্ষের ভূষণ? কৌস্তুভমণির চেয়েও ঢের বেশী নিবিড়ভাবে সম্বদ্ধ সেই চিহ্ন তাঁর বক্ষে সদা-সর্বদা বিরাজমান? ঘটনাটি কি জান তো, বাবা? ভৃগুমুনি জগতের দুঃখকষ্ট দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার কাছে নালিশ করতে গেলেন। ব্রহ্মা তো রেগেই খুন। তাঁকে ধমক দিয়ে বললেন, "আমার সৃষ্টি! তার ভালমন্দ আমি বুঝি না, তুমি বোঝো, না? আহাম্মক কোথাকার?" ভৃগু সেখান থেকে শিবলোকে গেলেন। শিব তাঁকে ত্রিশূল নিয়ে তাড়া করলেন। বললেন, "ওরে, আমার নাম ভূতনাথ জানিস না। যা কিছু দেখছিস, সবের মালিক আমি। আমি শিব, আমি মঙ্গল। মঙ্গলের রাজত্বে তুই অমঙ্গল দেখছিস, হতভাগা?" ভৃগুমুনি তার পরে নারায়ণের কাছে গেলেন। দেখেন যে ক্ষীরসমুদ্রের মধ্যে অনন্তনাগের উপরে মহা আনন্দে শুয়ে ঠাকুর লক্ষ্মীকে দিয়ে পা টেপাচ্ছেন। জগতের এই মর্মন্তুদ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ঠাকুরের এই রকম আরাম করা দেখে ভৃগু তাঁর বুকে এক লাথি মারলেন। ঠাকুর অমনি শশব্যস্তে উঠে তাঁকে বললেন, "আহা, তোমার পায়ে লাগে নি তো? না হয় লক্ষ্মী তোমার পাটা একটু টিপে দিক।" তাঁর জগৎ আমাদের কাছে বিসদৃশ ঠেকলেও, তিনি যে করুণাঘনাবলোকন, ভক্তানুগ্রহতৎপর, এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্রের অবকাশ তো তিনি দেন নি। এটিই তাঁর বিশেষত্ব। এটি অপরের পক্ষে সম্ভবই নয়। বাবা, পুরাণে বর্ণিত আছে যে একজন ভক্ত বৈকুণ্ঠে গিয়ে দেখলেন সকলেই নারায়ণের কাছে থেকে থেকে নারায়ণের মূর্তি পেয়েছেন। মহামুস্কিল। পরে সবার বুক ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন মাত্র একটি মূর্তির বুকে

ভৃগুপদচিহ্ন। তখন তাঁকেই আসল নারায়ণ ব'লে বুঝতে পারলেন। এ পুরাণের পুরনো কথা নয়। এইটিই যুগে যুগে, বারে বারে ঘটছে। আধুনিক যুগে পরমহংসদেব সম্বন্ধে ম্যাক্সমুলারের জীবনের সেই ঘটনাটি তুমি জান কি ? একজন ব্রাহ্ম ভদ্রলোক প্রথমে শ্রীশ্রীঠাকুরের খুবই অনুরক্ত ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে তিনি ইংরেজিতে প্রবন্ধও লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধ পড়েই অনেকে সে সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয় জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু পরে তাঁর মনের সেই ভাব পরিবর্তন হয়েছিল। কেউ বলেন যে চিকাগোর ধর্মমহাসভাতে স্বামী বিবেকানন্দের যত মান্য হয়েছিল, তাঁর তত মান্য হয় নি, এজন্য তাঁর ঈর্ষা হয়েছিল। কেউ বলেন যে সে যুগে ব্রাহ্মদের এবং থিয়েটারের লোকদের মধ্যে অহি-নকুল সম্বন্ধ ছিল। ব্রাহ্মেরা থিয়েটার বর্জন করতেন। এবং থিয়েটারেতেও নানাভাবে তাঁদের বিদ্রূপ করা হত। এজন্য গিরিশবাবু প্রভৃতি অভিনেতা-অভিনেত্রীরা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে যাওয়া আসা করছেন দেখে ব্রাহ্মেরা শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি বিরূপ হয়েছিলেন। কারণ যাই হ'ক না কেন একথা ঠিক যে সেই ব্রাহ্ম ভদ্রলোকটির শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি পূর্বেকার অনুরাগ আর ছিল না। ধর্মমহাসভা শেষ হলে তিনি আমেরিকা থেকে লণ্ডনে গেলেন। তখন সব ভারতবাসীই আচার্য ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। ব্রাহ্ম ভদ্রলোকটিও গিয়েছেন। একথা সেকথার পরে ম্যাক্সমুলার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি দক্ষিণেশ্বরে কখনও গিয়েছ ?" উত্তর পেলেন, "হাঁ, আগে যেতাম বটে, কিন্তু পরে আর যেতাম না।" ম্যাক্সমুলারের মনে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি অনুরাগ যাতে না থাকে এজন্যই ব্রাহ্ম ভদ্রলোকটি খুব জোর দিয়ে কথা কয়টি বললেন। তিনি পরে যেতেন না কেন এই প্রশ্নের উত্তরে ভদ্রলোকটি বললেন, "দেখুন, তাঁর কাছে থিয়েটারের যত বাজে লোক যেত। তিনি তাদের সঙ্গে তাদের ভাষায় আলাপ করেন, শুনতে পেলাম। তাই আর যেতাম না।"

একথা শুনে ম্যাক্সমুলার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "দেখ, তুমি আজ আমার একটি ভুল ভেঙ্গে দিলে।" ভদ্রলোকটি

জানতেন ম্যাক্সমুলারের শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি অনুরাগ আছে। সেই অনুরাগ এখন অন্তর্হিত হয়েছে এই বুঝে তিনি আশ্বস্ত হলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য। ম্যাক্সমূলার বলতে লাগলেন, "দেখ, বহুদিন যাবৎ আমি তোমাদের শাস্ত্রগ্রন্থ, ধর্মেতিহাস ইত্যাদির আলোচনা করছি। এ থেকে আমার মনে হয়েছিল যে এই বর্তমান যুগে একজন অবতারের আবির্ভাব হবে। পরমহংসদেবের চরিত্রে অবতারত্বের বহু পরিচয় আমি পেয়েছি। কিন্তু তাঁকে অবতার ব'লে পুরোপুরি নিতে পারি নি। কারণ আমার মনে হত যে তাঁর কাছে যদি তোমার বা স্বামী বিবেকানন্দের মতন সুপণ্ডিত চরিত্রবান লোকেরাই শুধু আশ্রয় পায় তবে তাঁকে অবতার বলি কেমন ক'রে? কিন্তু এখন যে তুমি আমাকে বললে যে তাঁর কাছে সব রকমের লোকই যেত, ভ্রষ্টারাও বাদ যায় নি, এতে ক'রে আমার ঠিক ধারণা হল যে পরমহংসদেব নিশ্চয়ই অবতার।" ব্রাহ্ম ভদ্রলোকটি হতবুদ্ধি হলেন। তাঁর কথার ফল যে সম্পূর্ণ বিপরীত হল। স্বামী বিবেকানন্দ আচার্য ম্যাক্সমুলারকে সায়ন বলেছেন। বেদের অনুবাদ তিনি করেছেন, এজন্য তো বটেই। কিন্তু আর একটা কারণ এই যে তিনি ভগবানের তত্ত্ব ঠিকভাবে বুঝেছেন। বাস্তবিক পুণ্যবানেরা নিজেদের পুণ্যবলেই উদ্ধার হবে। তাদের জন্য অবতারের প্রয়োজন নেই। অবতারের প্রয়োজন পাপী-তাপীদের জন্য।

মজার ঠাকুর

শিষ্য। বাবা, তিনি মহান্ থেকেও সুমহান্ আর আমরা নীচ থেকেও নীচ; তাঁর সঙ্গে আমাদের এই সম্বন্ধের কথা ভাবলে আমি ক্ষোভে, লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়ে যাই যে।

গুরু। কিন্তু বাবা, আমার ঠাকুর যে মজার ঠাকুর। তাঁর সম্বন্ধে আমাদের যুক্তিবিচার যে খাটে না। শোন, বাবা, আমার জীবনেরই একটি ঘটনা বলি। সে অনেক দিনের কথা। তখনও তোমাদের এই ঠাকুরবাড়ী হয় নি। পুরনো একতলা বাড়ী। ছাদ দিয়ে জল

পড়ে। শুধু সামনের ঘরটা ভেঙে নতুন করা হয়েছে। তার উপরে মন্দির আরম্ভ হয়েছে, শেষ হয় নি। শ্রীশ্রীঠাকুর তখনও পিছনের একতলা ঘরেই আছেন। আমি সামনের নতুন ঘরে একদিন দুপুরবেলা ঘুমিয়ে আছি। সেদিন খুব বৃষ্টি। স্বপ্ন দেখছি যে ছাদ দিয়ে জল পড়ায় ঠাকুর ভিজে গিয়েছেন। তিনি আমাকে বলছেন, "তুই তো বেশ মজা ক'রে, নতুন ঘরে শুয়ে আছিস। এদিকে আমি যে ভিজে যাচ্ছি।" স্বপ্ন অবস্থাতে স্পষ্ট শুনতে পেলাম যে ছাদ থেকে টপ্‌টপ ক'রে জল শ্রীশ্রীঠাকুরের পটের উপর পড়ছে। স্বপ্ন ভেঙেও শুনি সেই শব্দই। ছুটে গিয়ে দেখি যে ঠাকুর সত্যি সত্যিই একেবারে ভিজে গিয়েছেন। কাঁদতে কাঁদতে ঠাকুরকে বুকে ক'রে নতুন ঘরে এনে তাঁকে বলছি, "ঠাকুর, তোমাকে দোতলাতে নিয়ে যাব ব'লে আমি তোমাকে পুরনো ঘরেই রেখেছিলাম। তখন কি জানি তুমি এইভাবে ভিজে যাবে? ঠাকুর, যা হবার হয়েছে, এইবারটি তুমি আমার মাপ কর।" এর দুই-একদিন বাদে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাইপো ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এলেন। তিনি আমাকে খুব ভালবাসতেন। আমার মাকে মা ব'লে ডাকতেন। আমাকে "শিরপোড়ো" ব'লে আদর করতেন। কতদিন তোমাদের এই ঠাকুরবাড়ীতে এই খাটেই শুয়েছেন। তাঁকে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘটনাটি বললাম। তিনিও তাঁর জীবনের একটি কথা বললেন। বললেন, "খুড়োমশাই তখন চ'লে গিয়েছেন। এভাবে (শরীর ধ'রে) আর নাই। আমি মায়ের (শ্রীশ্রীভবতারিণীর) পূজারী। কিন্তু মাকে পূজো করতে যাবার আগে খুড়োমশাইকে বাল্যভোগ দিয়ে তবে যাই। একদিন সকালবেলা ভোগ দেবার সময়ে মনে হল ঘরের কোণের জালার বাসি জল খুড়োমশাইকে দেব না। গঙ্গা থেকে টাটকা জল এনে তাঁকে দেব। এই সময়ে উড়ে মালি জালাতে জল ঢালতে এল। জালার বাসি জল, তলানি কাদা কিছুই না ফেলে হড়হড় করে খানিক জল জালাতে ঢেলে দিল। কাদা মিশে জালার জল আরও নোংরা হল। দেখে শুনে মনে হল আগেই ভেবেছিলাম যে জালার জল খুড়োমশাইকে দেব না, এখন তো নিশ্চয়ই

দেব না। কিন্তু তখনই খাজাঞ্চি মায়ের (শ্রীশ্রীভবতারিণীর) গহনা বুঝে নেবার জন্যে আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি চাকরটিকে বললাম যে একটু পরে ভোগটা সেরে যাচ্ছি।- কিন্তু খাজাঞ্চির বড় তাড়াতাড়ি। ফের ডেকে পাঠালেন। কি আর করি! চাকরির খাতিরে জালার ঘোলা জল দিয়েই তাড়াতাড়ি ভোগ দিয়ে খাজাঞ্চির কাছে গেলাম। পরে মায়ের পূজো সেরে অন্যদিনের মত সেদিনও একটু খুড়োমশাইকে ধ্যান করতে বসলাম। অন্য দিন খুড়োমশাইকে পেতে দেরী হয়। সেদিন চোখ বোজা মাত্র খুড়োমশাই এসে হাজির। যেন খুব রেগে গিয়েছেন। আমাকে বলছেন, 'হাঁরে, রামলাল, তোর তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। তুই কি ব'লে আমাকে ঘোলা জলটা খাওয়ালি বল তো! তোর চাকরিই সব হল। আমি তোর কেউ নই?' আমার তো খুবই লজ্জা আর খুবই কষ্ট হল। নাক মললাম, কান মললাম, ঠাকুরকে কাঁদতে কাঁদতে বললাম, 'খুড়োমশাই, এইবারটি মাপ করুন। আর কখনও এমনটি হবে না। তাতে আমার চাকরি থাকে থাক, যায় যাক।' তখন তো খুব দুঃখ হল। খানিক বাদে মনে হল, এ আর এমন কি অপরাধ করেছি? যখন তিনি এইরকম ভাবে (শরীর ধ'রে) ছিলেন তখন এর চেয়েও কত গুরুতর অপরাধ করেছি, আর সব মাপ হয়েছে। এই ভাবতে ভাবতে মনে হল যে এ আর কিছু নয়,—এ দেখা দেবার ফিকির। ঠাকুর জানাতে চাইছেন, ওরে আমি এখনও আছি, সব দেখাশোনা করছি।" রামলাল ঠাকুরের এই কাহিনীতে ঠাকুরের আবির্ভাবের রহস্য বোঝা যায়। তিনি দেখা দেবার জন্য কত ছল অন্বেষণ করছেন,—যাতে কোনও উপায়ে দেখা দিতে পারেন।

শিষ্য। বাবা, তাঁর ইচ্ছাকে কি আমরা প্রতিরোধ করতে পারি? তবে আমরা কেন তাঁর দেখা পাই না?

গুরু। তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের ইচ্ছার মিলন হলে তবে তো তাঁর সঙ্গে আমাদের মিলন হবে। তিনি দিলেন আমরা নিলাম না, —এতে ক'রে তাঁর দান ব্যর্থ হবেই যে। দাতা না দিলে দান হতে

পারে না একথা যেমন সত্যি, দাতা দিতে চাইছেন গ্রহীতা নিচ্ছে না, এতেই বা দান কেমন ক'রে হবে, একথাও তেমনই সত্যি। তিনি চালের বড বড় ঠেক এবং দুই চাবটে কড়াই মুড়ি সবই দিচ্ছেন। আমবা ঐ কড়াই মুড়িই শুধু নিচ্ছি। এতে ক'বে তাঁর চালের ঠেকেব মহৎ দান ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। তিনি কি চান যে আমরা সংসারের সুখ দুঃখের দোলায় শুধু দিন কত দুলে দুলে চ'লে যাব? তিনি কি চান না যে আমরা এর রহস্যটা বুঝে সকল দুঃখ থেকে অব্যাহতি পাই? পবমানন্দ লাভ কবি? তাঁব ইচ্ছের সঙ্গে আমাদের ইচ্ছে মিলছে না যে।

শিষ্য। তবে উপায় কি?

গুরু। উপায় কেবল ও পায়। তাঁর শ্রীচরণে শরণাগত হওয়া ছাড়া আমাদের আর কি উপায় আছে, বল?

ধর্মের গ্লানি

শিষ্য। বাবা, ভূভার লাঘবের জন্য শ্রীভগবান অবতীর্ণ হন এটি শাস্ত্রে পড়েছি, লোকমুখেও শুনেছি। জগতে তো দুঃখ-কষ্ট, অন্যায়-অবিচারের অন্ত নেই। তবু শ্রীভগবান আসেন না কেন? কংসের অত্যাচারে যখন জগৎ বিধ্বস্ত হযেছিল,—হেরডেব অত্যাচাব যখন চবমে উঠেছিল,—সেই বকম ভীষণ অবস্থা এখনও হয নি, তাই কি তিনি আমাদের যুগে আবির্ভূত হচ্ছেন না?

গুরু। আচ্ছা, বাবা, ঠাকুব তো বলেছেন, "যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানি...." যখন যখনই ধর্মেব গ্লানি হবে তখন তখনই তিনি আসবেন, সমাজেব, রাষ্ট্রেব গ্লানিব কথা তো কিছু বলেন নি। ধর্ম কি? যেটি আমি ধ'রে আছি, সেইটিই আমার ধর্ম। ছেলেবয়সে লেখাপড়া কবাই ধর্ম, তা কবেছি। তার পবে অর্থোপার্জন করা ধর্ম তাও করেছি। তারও পবে সংসার করা ধর্ম, তাতেও ত্রুটি কবি নি। কিন্তু গ্লানি হচ্ছে যে। জুড়ুতে পারছি নে যে। আমি আরও বেশী অর্থোপার্জন করতে পাবি নি, তাই কি গ্লানি? না, তা তো নয়। আমাব চেয়ে বেশী

অর্থোপার্জন কত লোকেই তো করেছেন তাঁরাই বা কোন্ সুখে সুখী? "Uneasy lies the head that wears the crown." সাংসার গুছিয়ে করতে পারি নি, তাই কি অশান্তি? আমার পরিচিত কাউকেই তো পাই না যে সংসার বেশ গুছিয়ে করতে পেরেছে। যাকে জিজ্ঞাসা করি, "ভাই কেমন আছ?" সেই বলে, "এই কোনও রকমে চ'লে যাচ্ছে"; কেউ আর বলে না, "বেশ ভাল আছি"।—এই তো অবস্থা। যে নিরালাতে বসে বসে এসব ভাববে, সেই ধর্মের গ্লানি বুঝতে পারবে। আর যে এরকম করে ভাববে না, সে গ্লানিতে ছটফট করবে, মনে করবে এ তারই গ্লানি,—এ যে ধর্মেরই গ্লানি এ কথাটা সে বুঝতে পারবে না। তাই নয় কি বাবা?

শিষ্য। হাঁ বাবা, আপনার কথা আমি বুঝেছি। আপনি বোঝাতে চাইছেন যে সংসারে যখন আমরা শান্তি পাই না তখন আমরা মনে করি আমাদের অক্ষমতার জন্য বা অপরের নির্বুদ্ধিতা বা অন্যায় আচরণের জন্য অশান্তি ঘটছে। সংসারেরই যে এই ব্যবস্থা তা আমরা বুঝি না। যে ভাবে, শুধু সেই-ই এ কথা বুঝতে পারে।

অধর্মের অভ্যুত্থান

গুরু। বাবা, বেশ বলেছ। এই তো চাই। ঠাকুরের কথা শুনবে, টপ্‌টপ ধারণা হবে, আবার নতুন নতুন কথা শুনবে। এইতো চাই। সংসার যে সংসরতি, কেবলই সরে যায়। আলেয়ার মতন কেবলই যে আমাদের ছুটোছুটি করায়, এটি বুঝলে, তখনই ধারণা হয় যে অধর্মের অভ্যুত্থান হয়েছে। অধর্ম কি? যা ধ'রে রাখা যায় না, তাই অধর্ম। সংসারের যাবতীয় জিনিসই অধর্ম। কিছুই ধ'রে রাখা যাবে না। ধন জন মান, কি আর থাকবে বল? যা হয়, তাই যায়। যার উৎপত্তি আছে, তারই লয়ও আছে। তাঁরই শুধু লয় নাই, যার উৎপত্তিও নাই। তাই বলছি, সবই অধর্ম। তার কি রকম অভ্যুত্থানটা হয়েছে, একবার ভেবে দেখ। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আটাশ ঘণ্টা

ধনের চিন্তা করছি। যেটুকু ঘুমিয়ে থাকি, সেটুকুও পরের দিন কাজ করবার জন্যে শক্তি সংগ্রহ করছি। হনুমান চুপ ক'রে বসে আছে। সত্যিই কি চুপ ক'রে বসে আছে? ভাবছে কার কলাটা নেবে, কার মুলোটা খাবে।

অন্তরে ও বাহিরে আবির্ভাব এবং তাহার ফল

শিষ্য। বাবা, এ সব কথা এর আগেও মনে হয়েছে। কিন্তু এত তীব্রভাবে মনে হয় নি তো।

গুরু। তীব্রভাবে মনে হওয়াতেই তো শ্রীভগবানের আবির্ভাব বোঝা যায়। কারণ তিনি তো বলছেন না, যে আমি অশরীরী বাণী প্রেরণ করব বা একরাশ শাস্ত্র ছুঁড়ে মারব। তিনি বলছেন নিজেই আবির্ভূত হব। কালাপাহাড়কে ঠাকুর চিন্তামণি বলছেন, "তুমি যেমন ডেকেছ, তিনি তেমনি এসেছেন। তুমি চিনতে পার নি।" সত্যিই তাই। যে মুহূর্তে তাঁর জন্য আমাদের মনে ব্যাকুলতা জাগে, সেই মুহূর্তে তিনি আমাদের মনে উদিত হন। ঠাকুর কি চমৎকার কথাই বলেছেন। বলেছেন ব্যাকুলতাই অরুণোদয়। সূর্য তখনই উঠেছে, প্রকাশটা একটু প্রচ্ছন্ন, এই যা। আরও একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে তিনিই হৃদয়ে এসে তবে হৃদয়ে ব্যাকুলতা জাগিয়েছেন। সুতরাং ডাকবার আগেই তিনি এসেছেন। কিন্তু সে কথা এখন থাক। তাঁর সেই অন্তরের প্রকাশ অনুভূতি সাপেক্ষ, বাক্যমনাতীত। এখন বাইরের প্রকাশের কথাই হ'ক। তিনি নরদেহে অবতীর্ণ হন, সেই কথাই বলা যাক। কেন অবতীর্ণ হন? "পরিত্রাণায় সাধূনাম্।" "সাধূনাম্" মানে "সৎপ্রবৃত্তীনাম্"। যে প্রবৃত্তি দ্বারা তাঁকে লাভ করা যায় সেই প্রবৃত্তি রক্ষা করবার জন্য তিনি আসেন। সে সব প্রবৃত্তি তিনি আমাদের আগে থেকেই দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু আমরা সেগুলির অপব্যবহার করি। কাম ক্রোধ লোভ মদ মোহ মাৎসর্য তিনি আমাদের উপকারের জন্য দিয়েছেন। আমরা সেগুলি অপকারে লাগাচ্ছি। তাঁকেই কামনা করা উচিত; আমরা

তা না ক'রে অন্য জিনিস কামনা করি, যাতে জ্বলুনি, কেবল জ্বলুনি। তাঁকে না পাওয়াব জন্যই ক্রোধ হওয়া উচিত; কিন্তু সে জন্য আমাদের ক্রোধ আসে না। আমাদের ক্রোধ হয় কাঁচ না পাওযাতে, কাঞ্চন না পাওযার জন্য নয়। তিনিই লোভেব জিনিস, সে লোভ আমাদেব জাগে না। আমাদের যত লোভ সংসাবেব তুচ্ছ, হীন,ক্ষণস্থাযী জিনিসেব জন্য। কেবল কড়াই মুড়ী চিবুচ্ছি, তাই-ই কেবল আবও চাইছি। পাহাড়েব মত উঁচু চালেব ঠেকের জন্য কিছুমাত্র লোভ নেই। "শ্যাম গববে হাম গরবিনী" এই মদ আমাদের কই? তাঁর মায়ার সংসাবেব কামিনী কাঞ্চন মানেই আমবা বিমুগ্ধ, বিমূঢ়,—তাঁতে মোহ নাই তো। ধ্রুব, প্রহ্লাদ তাঁব সন্তান, আমরা বুঝি তাঁর কেউ নই, এ মাৎসর্যই বা কোথায়? তিনি আসবার পবে আমাদেব এই সব রিপুগুলিব মোড় ফিবে যায়। প্রবৃত্তিগুলির দ্বাবা অপকার না হয়ে উপকাব হয়। পুরনো গানে আছে জাননা, বাবা, "এই ছয়জন বসিক সুজন, আছেন দেহে কুতূহলে। এঁরা তস্করে দেন চোবের মন্ত্র, থাকেন সাধুর অনুকূলে।" এ কথাটা খুবই সত্য। আব কি জন্য আসছেন? "বিনাশায চ দুষ্কৃতাম্।" দুষ্কৃত কি? যা তাঁকে দূব কবে, তফাৎ করে, তাই দুষ্কৃত। আমাদের অহংকারই তাঁকে প্রতিহত করছে। এই অহংকার তিনি বিনাশ কবেন। তাঁব আসবার আর কি কারণ? "ধর্ম সংস্থাপনার্থায।" আগে যেটিকে ধর্ম মনে কবেছিলাম সেটি ধর্ম নয়, কাবণ তার গ্লানি ঘটেছে। তিনি আসবার পবে ধর্ম সংস্থাপন হয়। কি ক'রে হয়? তিনি যখন যাকে যে অবস্থাতে যেটি করতে বলেন তখন তাব পক্ষে সেই অবস্থাতে সেটিই ধর্ম। ঠাকুব যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "বল অশ্বত্থামা হতঃ।" যুধিষ্ঠিব সত্য-পালনের জন্য বললেন, "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ।" এই "ইতি গজঃ" বলাব জন্য তাঁকে নবক দর্শন কবতে হল। যিনি সত্যেব প্রতীক, যাঁ থেকে সত্য উদ্ভূত, তাঁব উপব টীকা টিপ্পনি চালান নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আব কি?

সত্য ও নীতি

শিষ্য। বাবা, আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাইনে। এ কথাও বলতে চাইনে যে বাচনিক সত্যপালনই সব। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরও তো সত্যে আঁটের কথা কতই না বলেছেন। একবার তাঁর মুখ থেকে বেরিয়েছে "আমি লুচি খাব নি", আর লুচি খান নি। ক্ষিধে রয়েছে, তবু মিষ্টি খেয়েই পেট ভরিয়েছেন। বাবা, আপনি অপরাধ নেবেন না। কিন্তু "দেবভাব বেলায় লীলা খেলা, পাপ লিখেছে মানুষের বেলা," এই তো দেখতে পাই। আমি শুধু শ্রীকৃষ্ণের কথা বলছি না। সব মহাপুরুষদের সম্বন্ধেই এমন কিছু দেখতে পাই যা অসামঞ্জস্যপূর্ণ তো বটেই, গর্হিত বলেই আমার মনে হয়।

গুরু। কোনও মহাপুরুষ যদি গর্হিত আচরণ করেন তবে তাঁকে মহাপুরুষ বলি কি ক'রে? কোন্ মহাপুরুষের কোন্ গর্হিত আচরণের কথা তুমি বলছ?

শিষ্য। বাবা, এ বিষয়ে আমার একটি নিবেদন আছে। পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর বুঝিয়েছেন, "মনুষ্যের অভিজ্ঞতা যখন সীমাবদ্ধ, তখন এইটা প্রকৃতির নিয়ম, ঐটা প্রকৃতির নিয়ম, উহার কোথাও ব্যাভিচার নাই বা হতে পারে না, এরূপ নির্দেশ অন্যায়, অসঙ্গত, অসমীচীন, অবৈজ্ঞানিক। এরূপ দুঃসাহসিকতা বুদ্ধিমানের সাজে না।" এটি আমি মানি। কোনও ঘটনা সচরাচর ঘটে না, এই জন্যেই সেটা ঘটতে পারে না, এ আমি মনে করি না। কিন্তু তাই বলে নীতি ব'লে কিছু নেই, এ কথা বলতে পারি না। সুতরাং মহাপুরুষদেরও নীতি মেনে চলাই উচিত। তাঁরা যদি সে রকম না করেন, তবে তাঁদের মানি কি ক'রে বলুন?

গুরু। তুমি কি এইটে বলতে চাইছ যে মহাপুরুষদের কোন কোন কথা তোমার কাছে মিথ্যা ব'লে মনে হয়। তাঁদের কোন্ কোন্ আচরণ তোমার কাছে মিথ্যা আচরণ ব'লে মনে হয়?

পরস্পর বিপরীত বাণী ও আচরণ

শিষ্য। হাঁ, বাবা, তাইই। ধরুন, যীশুখ্রীষ্ট শিষ্যদেব শেখালেন যে তোমাদেব বাঁ গালে কেউ চড় দিলে তোমবা ডান গাল ফিবিয়ে দেবে, এমনি হবে তোমাদেব ক্ষমা। আবাব যখন মন্দিবে বাজার হাট বসিয়ে দোকানদারেবা পূজাপাঠের বিঘ্ন কবেছিল, তিনি তাদের জিনিস পত্র টেনে সব বাইবে ফেলে দিযেছিলেন। এখানে একটুকুও ক্ষমা দেখি না, শুধু ক্রোধ দেখি। একবার বলছেন, "পৃথিবীতে শান্তি হ'ক, মানুষে মানুষে সম্প্রীতি হ'ক।" আবার বলছেন, "আমি শান্তি স্থাপন করতে আসি নি। বাপে ছেলেতে ভেদ কবার জন্য আমি এসেছি।" এ বকম কত উল্টোপাল্টা কথা, উল্টোপাল্টা কাজই না আছে। এব আমি সামঞ্জস্য খুঁজে পাইনে। শুধু যীশু খ্রীষ্ট কেন, সব মহাপুরুষদেব জীবনী পর্যালোচনা করলেই এই বকম বিসদৃশ ব্যাপাব দেখা যায়। আগে আমাব মনে হত এ সব বহু পুরাতন কথা। এ সব সত্যি নাও হতে পাবে। কাবণ দুই পক্ষের প্রত্যক্ষ-দর্শীদের সাক্ষ্য বিচাব ক'রে জজসাহেব যে ভাবে রায় দেন, ঐতি-হাসিককেও মহাপুরুষ সম্বন্ধে সত্য নির্ণয় করতে হলে সেই ভাবে ভক্ত ও দ্বেষী দ্বিবিধ সমসাময়িক লোকদেব বিববণ থেকেই করতে হবে। যাঁরা অবতার ব'লে পবিগণিত তাঁদের অনেকের বেলাতেই এই বকম নির্ভবযোগ্য তথ্য নাই। কেবল পবমহংসদেব সম্বন্ধে এই রকম সমসাময়িক বিববণ আছে। সেগুলিব ঐতিহাসিক মূল্যও যথেষ্ট। তা থেকেই বেশ বোঝা যায় পরমহংসদেবেব জীবনও অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এক সময়ে তাঁব হাতে ধাতু অজ্ঞাতে স্পর্শ করলেও তিনি স্থির থাকতে পাবেন নি। কিন্তু আব এক সময়ে যখন মথুরবাবুর স্ত্রী সম্বন্ধে আসক্তি ত্যাগ হয় নি এ কথা মথুরবাবুকে বোঝাবার জন্য তিনি নিজে মথুরবাবুর স্ত্রীর সাড়ী, গহনা ইত্যাদি প'রে মথুরবাবুর স্ত্রী সাজলেন তখন তাঁব হাতও বাঁকল না, পাও বাঁকল না। এর মধ্যে সামঞ্জস্য কই? আব যে সব মহাপুরুষদেব কথা পুবাণে লিপিবদ্ধ আছে, সেই বিববণগুলিব ঐতিহাসিক মূল্য না থাকলেও, সেই সেই যুগে মহাপুরুষ বলতে

পুরাণকারদের মনে যে যে ধারণা ছিল, সেই সেই ধারণা অনুযায়ী তাঁরা লিখে গিয়েছেন। সুতরাং সে সব বিবরণও অনৈতিহাসিক ব'লে উড়িয়ে দিতে পারি নে। মহাপুরুষের তত্ত্বের ব্যাপার সেগুলি থেকেও নিতে হবে বইকি। যদি আদি অবতার শ্রীরামচন্দ্রের কথাই ভাবি, তখন দেখি তিনি বিনা কারণে অন্যায় যুদ্ধে চোরাবাণে বালি বধ করছেন। এ রকম কাজ তো আমরাও করি না। তখন বলা হল শ্রীরামচন্দ্রের কাছে পত্নীপ্রেম শিখতে হবে। তিনি সীতাকে এত ভালবাসেন যে সীতা উদ্ধারের জন্য বালি বধের কলঙ্ক সানন্দে নিচ্ছেন। আবার যখন গর্ভিণী নিরপরাধ সীতাকে ছল ক'রে লক্ষ্মণের সঙ্গে বনবাসে পাঠাচ্ছেন তখন আর তাঁর পত্নীপ্রেম দেখা যাচ্ছে না। তখন বলা হল তিনি যে প্রজারঞ্জনকারী রাম। কিন্তু পিতৃসত্য পালনের জন্য রামচন্দ্র যখন বনে যাচ্ছেন, তখন তিনি প্রজাদের কথা কতটা ভেবেছিলেন? তিনি কি জানতেন না যে তিনি অযোধ্যা ত্যাগ করলেই দশরথের প্রাণ বিয়োগ হবে,—তাঁর তো অভিসম্পাতই ছিল? আর এও কি রামচন্দ্র জানতেন না যে ভরত ছেলেমানুষ, খড়ম নিয়ে প্রজাদের কতটা দেখতে পারবে? তখন প্রজারঞ্জন কেমন ক'রে হল?

গুরু। তুমি এর মীমাংসা কি ভাবে করলে?

শিষ্য। বাবা, এর মীমাংসা আমি আর কি করব? একদিন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার এ বিষয়ে আলাপ হয়েছিল। তিনি আমাকে হেঁসে বলেছিলেন, "সেইজন্যই তো লোকে বলে বোকারাম।" সবই গোলমাল সবই গোলমাল।

গোলমালের মধ্যে মাল

গুরু। বাবা, গোলমাল কি শুধুই গোল? তাতে কি মাল নাই? গোলটা ছেড়ে মালটা নাওনা কেন? তুমি কি এটা দেখতে পাচ্ছ না যে রামচন্দ্রের মন কিছুতেই আসক্ত নয়? তিনি দরকার হলে স্ত্রীর জন্য বালিবধ করতে পারেন। আবার দরকার হলে তিনি

স্ত্রীকে বনেও পাঠাতে পারেন। প্রজারঞ্জনের জন্য স্ত্রীকে বনবাসে দিতে পারেন। আবার প্রজাদের ভাসিয়ে নিজেও বনে যেতে পারেন। তিনি অনাসক্ত। তাঁর মন কামিনী কাঞ্চন মান কিছুতেই নাই। এই জন্যই তাঁকে অব্যবস্থিত চিত্ত ব'লে ভুল হয়।

শিষ্য। বাবা, আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাইনে, কারণ তর্কে আপনার সঙ্গে এঁটে উঠতে কোনও দিন পারি নি, এবং কোনও দিন পারবও না। কিন্তু আপনিই বলুন যে এ ভাবে অব্যবস্থিত-চিত্ততার ভান ক'রে এসে তাঁর লাভ কি? আপনি তো খানিকক্ষণ আগেই আমাকে বললেন যে শ্রীভগবান তাঁর সন্তানদের জন্য এত ব্যস্ত যে তিনি অবতরণ না ক'রে পারেন না। যদি তাই হবে তবে তিনি এমন আচরণ কেন করেন যে কারু কারু মনে বিশ্বাস আর কারু কারু মনে সন্দেহ জাগে?

গুরু। সকলের কথা বলতে গেলে যে উত্তর দিতে হয় সেটি তোমার ভাল লাগবে কি? সব রং মেশালে কোন রংই যে থাকে না, সবই যে সাদা হয়ে যায়। সবার কথা যদি বল তবে বলতে হয় বৈষম্য সত্যিই নাই। কেই বা বিশ্বাসী? আর কেই বা সন্দিগ্ধচিত্ত? সবই তিনিই। তিনিই নানা রকম সাজে, নানা অবস্থায়, নানা রকমের ভূমিকায়, নানা অভিনয় করছেন। কিন্তু সে কথা এখন থাক। কালীঘাটে কালীঘরে যিনি, হুঁকোমুখে বারান্দাতেও তিনিই,—এ দর্শন হলে তখন সকলের কথা বোঝা যাবে।

শিষ্য। আচ্ছা, বাবা, আমি ও কথা ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু আপনি আমাকে বলুন কি সুকৃতির ফলে অবতার বা মহাপুরুষের আবির্ভাব বোঝা যায়? কি সুকৃতির অভাবে তাঁকে না বুঝে জীবনের বোঝা টেনে টেনেই মরতে হয়?

"সম্ভবামি যুগে যুগে"

গুরু। বাবা, গীতার যে শ্লোকটা অবলম্বন ক'রে এত কথা হল, সেই শ্লোকেতেই এর উত্তর আছে। তিনি বলেছেন, "সম্ভবামি যুগে যুগে।" যুগ মানে বার বৎসর নয়। "যু" ধাতুর মানে মিলন

করা; তাতে "গ" প্রত্যয় ক'রে এই শব্দটি নিষ্পন্ন করা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে মিলন হলেই তাঁর আবির্ভাব বোঝা যায়।

শিষ্য। বাবা, তিনি এলেন, এই তো তাঁর সঙ্গে মিলন হল। আবার মিলন কেমন ক'রে হবে?

গুরু। তাও কি হয়? যখন মহাপুরুষ বা অবতার আসেন কত লোকেরই তো তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় কিন্তু তাই ব'লে সকলেরই কি তাঁর সঙ্গে মিলন হয়? সকলের জন্যই কি তিনি আসেন? মিলন মানে অমিল না হওয়া। যখন তাঁর কোনও কাজ, কোনও কথা, কোনও আচরণে অমিল বোধ হয় না,—লোকে তাঁকে কালো বললেও তিনি আমার হৃদয়-আলো, এটি বুঝতে পারা যায়,—তখনই তাঁর আবির্ভাব আমার জন্য হয়।

শিষ্য। বাবা, এ যে হেঁয়ালির কথা। একজনের কাছে কালো, একজনের কাছে আলো,—একে হেঁয়ালি ছাড়া কি বলি, বলুন?

গুরু। হাঁ, বাবা, এই হেঁয়ালি, এই রহস্য, বারে বারেই ঘটছে। কিন্তু এমন ধাঁধাঁ যে যখন মহাপুরুষ আমাদের কাছে সত্যিই আসেন, তখন একথা আমাদের একবারও মনে হয় না যে তাঁকে বোঝবার পক্ষে আমার নিজের কোনও অযোগ্যতা থাকতে পারে। কেবলই মনে হয়; "না, ইনি কখনও মহাপুরুষ হতে পারেন?" অথচ একটু ভাবলেই বোঝা যায় যে অপর যুগের প্রখ্যাত মহাপুরুষ আমাদের যুগে এলেও তাঁর বেলাতেও এই সব সন্দেহই আমাদের মনে জাগত। আচ্ছা, তুমি একটু ভেবে দেখ যে ভক্তেরা তাঁদের আরাধ্যদেবের জীবনী একটু বাদ সাধ দিয়ে লিখলেই তো পারতেন। যীশুখ্রীষ্টের শিষ্যেরা বাঁ গাল, ডান গালের কথাটা লিখে থেমে গেলেই তো পারতেন। আবার মন্দিরের কথাটা লিখতে গেলেন কেন? মহাপ্রভুর শিষ্যেরা ছোট হরিদাসের বর্জন, তার আত্মহত্যার কথাটা না লিখে কেবল মহাপ্রভুর জীবে দয়ার বর্ণনা করলেই তো পারতেন। যীশুখ্রীষ্টের চরিতকারদের মধ্যে জন ছাড়া আর সকলেই না হয় মূর্খ ছিলেন; মহাপ্রভুর জীবনী-লেখকদের অনেকেই তো মহাপণ্ডিত। তাঁরা এসব সামঞ্জস্যবিহীন

বর্ণনা গোপন রাখলেন না কেন? এতে কি এই মনে হয় না যে মহাপুরুষদের যে সব আচরণ আমাদের চোখে বিসদৃশ ঠেকে, যাঁরা সেই সব মহাপুরুষদের সঙ্গ করেছিলেন তাঁদের চোখে সেগুলি মোটেই বিসদৃশ ঠেকে নি, তাঁরা সোল্লাসে সে আচরণগুলির বিস্তারিত বর্ণনা ক'রে গেছেন?

শিষ্য। বাবা, আমার প্রশ্নের জবাব এখনও হয় নি। আমার প্রশ্ন এই যে কি সুকৃতির দ্বারা তাঁরা সেই সব বিসদৃশ ব্যাপারে সামঞ্জস্য পেয়েছিলেন? তাঁদের এ যোগ্যতা কি উপায়ে এসেছিল?

ব্যাকুল প্রার্থনা ও তার ফল

গুরু। বাবা, তোমাকে তো আগেই বলেছি যে ব্যাকুলতা চাইই চাই। যার মনে স্পষ্ট ধারণা হয়েছে যে সংসারে শান্তি নাই, শান্তি হতেই পারে না,—সে শান্তির জন্য আকুল হয়ে ভগবানের কাছেই প্রার্থনা করবে। সংসারীরা সংসারেতে শান্তিলাভের মিথ্যা আশাতে কত খাটছে, সে দেখতে পায়। আর ভাবে ভগবানের শান্তিলাভ করবার জন্য সত্য চেষ্টা কতখানি করা দরকার। সে কিছুতেই পিছপাও হয় না। সে কেবলই প্রার্থনা করে। বলে, "ঠাকুর, তুমি আমাকে বুঝিয়ে দাও যে তুমি এসেছ। নইলে যে আমি বাঁচি না।" তার প্রার্থনা ধন জন মানের জন্য নয়। তার প্রার্থনা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্য। হৃদয়ের গ্রন্থিভেদের জন্য, সকল সংশয় ছিন্ন করবার জন্য। এই প্রার্থনা ঈশ্বরের জন্য। তাই তিনি এ প্রার্থনা শোনেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, "লোকে মাগ ছেলের জন্য ঘটি ঘটি কাঁদে। কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কবে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেছে।"

শিষ্য। এই প্রার্থনার ফলে কি হয় একটু বুঝিয়ে বলুন না, বাবা?

গুরু। বাবা, তোমাকে তো আগেই বলেছি যে-মনে এ প্রার্থনা জেগেছে সে-মনে ঈশ্বর লাভ হবেই হবে। সে-মনে অবতারের আবির্ভাব উপলব্ধি হবেই হবে।

"He who asketh must receiveth." "Seek and ye shall find." "Knock and the door shall be opened unto you." বাবা, এ সবই সত্য কথা। আমার ঠাকুর বলেছেন,-

"ও ভাই, নামের এমনি বল,
প্রাণ করে শীতল,
হয় কি না হয় ডেকে দেখ
সত্য কিবা ছল।"

যতক্ষণ আমরা প্রার্থনা না করছি ততক্ষণ প্রার্থনা করলে হয় কি না হয় সে কথা বলবার আমাদের কোনও অধিকার নাই।

সকল বিষয়েই অমিল

শিষ্য। বাবা, প্রার্থনার শক্তি সম্বন্ধে বা তার ফলাফল সম্বন্ধে আমি এখন কোনও কথা বলতে পারি না, এটি আমি মানছি। কিন্তু, বাবা, অন্য কত বিষয়েই তো সন্দেহ! দেখুন বুদ্ধদেব রাজার ছেলে, পরমহংসদেব গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে; যীশুখ্রীষ্ট ছুতোরের ছেলে। যীশুখ্রীষ্ট জন্মালেন ঘোড়ার আস্তাবলে। বুদ্ধদেব জন্মালেন গাছতলায়; পরমহংসদেব জন্মালেন ঢেঁকিশালে। মহাপ্রভু, শঙ্কর এঁরা মহাপণ্ডিত, যীশুখ্রীষ্ট, পরমহংসদেব,—এঁদের তো নিরক্ষর বললেই চলে। শঙ্কর চিরকুমার; শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব এঁরা সকলেই কৃতদার। তাঁদের মধ্যে বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেব স্ত্রী ত্যাগ ক'রে সংসার ছেড়ে চলে গেলেন। পরমহংসদেব স্ত্রীকে কখনও স্ত্রীভাবে গ্রহণই করেন নি, তাই তাঁকে স্ত্রী বর্জনও করতে হয় নি। তাঁর বেলায় না-গ্রহণ, না-বর্জন,—এক অদ্ভুত ব্যাপার।

গুরু। বাবা, সবের ঐ একই রহস্য। তাঁদের আসক্তি নাই। স্থান, কাল, অবস্থা ভেদে অন্য তারতম্য ঘটেছে বটে কিন্তু মূলতঃ অভেদ। আর তা তো হবেই। তিনি যে একই। দেখনা সদ্যোবিবাহিত শ্রীরামচন্দ্র চৌদ্দ বছর ধ'রে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করলেন। তখন

*Honey Moon-এর সময়ে ছেলে হল না, ছেলে হল অনেক পরে,—যখন রাজধর্ম পালনের জন্য ছেলের দরকার তখনই ছেলে হ'ল। তাঁর যখন ছেলে হল, তখনই কি তাঁর আসক্তি ঘটেছে? তা মোটেই নয়। সব সময়েই তিনি সম্পূর্ণ অনাসক্ত। তা নইলে সে সময়ে কি তিনি সীতাকে বনে পাঠাতে পারেন?

শিষ্য। বাবা, সবই গোলমাল ঠেকে। এক এক সময়ে আমার সন্দেহ হয় অবতারদের সবই ছল। সীতা হরণের পর শ্রীরামচন্দ্রের করুণ বিলাপ শুনে মনে হয় তিনি আদর্শ স্বামী। আবার তিনিই সেই সীতাকে মিথ্যা লোকাপবাদের ভয়ে বনে পাঠাচ্ছেন! এ থেকে মনে হয় না কি যে আগেকার বিলাপটা ছল মাত্র?

গুরু। তুমি যদি বল অবতারেরা "মায়া-মানুষ-বেশা" এই কারণে তাঁদের সবই ছলনা, তবে আমি মানতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু যদি তুমি বল তাঁরা ভণ্ডামি করেছেন তবে সে কথা স্বীকার করতে পারি নে। লোকে ভণ্ডামি কেন করে? কোনও একটা কিছু লাভের আশায়, ধন জন মান যা হ'ক একটা কিছু পাবার আশাতেই, লোকে মিথ্যাচরণ করে। যাঁর আসক্তি কিছুমাত্র নাই, যাঁর কোনও জিনিসের জন্যই কিছুমাত্র কামনা নাই, মিথ্যার নিদানই যে, তাঁর ক্ষেত্রে বর্তমান নাই, তিনি মিথ্যাচরণ করবেন কেন? তিনি অনাসক্ত তাই তাঁকে ভণ্ড বলে ভুল হয়। তিনি অব্যবস্থিতচিত্ত এ কথা মনে হওয়ারও কারণ যে অনাসক্তির বিষয়ে আমাদের অনভিজ্ঞতা এ কথা তো আগেই বলেছি। এও সেই একই কথা।

"অহিংসা পরমোধর্মঃ"

শিষ্য। আচ্ছা, বাবা, তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু তাঁদের পরস্পরে এত তারতম্য কেন? বুদ্ধদেব শেখালেন, "অহিংসা পরমোধর্মঃ।" আর শ্রীকৃষ্ণ হত্যাকাণ্ডের পর হত্যাকাণ্ড চালিয়েছেন। জনাব বিদূষক ঠিকই

---

*Honey Moon অথবা মধুচন্দ্রের প্রকৃত তাৎপর্য এই যে বিবাহের পরে যে প্রীতির আস্বাদন বিবাহিতেরা করে তার চন্দ্রের মতনই হ্রাস ঘটে।

বলেছেন, "মুনিরা যে মন্ত্র আওড়ায় তার মানে বোঝেন ? যতগুলি নাম বলে, তার মানে একজনের না-একজনের সর্বনাশ করেছেন। নাম কিনা ধনুর্ধারী, নাম কিনা কংসারি, দানবারি, আবির একেবারে কেয়ারি —যে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা একগাড় করে, যোগাড় ক'রে আপনার ভাগে মারে, যে পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় রাখলে না, —ভবনদীর কাণ্ডারী কিনা। নৌকাভরা লোক তো চাই, দেহ ধ'রে এসে দেশে দেশে ঘিরে লোকের সর্বনাশ করছেন তাই। ওমা, এই মারে তো এই মারে, কাটে শিশুপালের মাথা, ফাঁড় জরাসন্ধকে, শুনেছি ধরার ভার হরণ করতে এসেছেন, তা ধরার ভার বেশ হালকা ক'রে যাচ্ছেন বটে।"

গুরু। বাঃ, তোমার যে সব মুখস্থ দেখছি। ভক্তপ্রবর গিরিশবাবুর সঙ্গে আমার বেশ আলাপ ছিল। তিনি নিজে বিদূষক সেজে ব্যজ-স্তুতি কাকে বলে বেশ ক'রে বুঝিয়েছেন। কিন্তু সে কথা এখন থাক। "অহিংসা" এবং "হত্যা" এ দুটি কথা অবতারেরা কি অর্থে ব্যবহার করেছিলেন এ না জানলে মীমাংসা কি ভাবে হতে পারে ? আচ্ছা, সত্যি সত্যিই দেখ, যদি "অহিংসা" মানে "হত্যা না করা" হয় তবে কারু পক্ষে অহিংসা পালন করা সম্ভব কি ? উদ্ভিদরাও কি জীব নয় ? তাদেরও কি প্রাণ নাই ? জলেতে, হাওয়াতে, কত কোটি কোটি প্রাণী। প্রতি নিঃশ্বাসের, প্রতি প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই কত অগণিত প্রাণী মারা যাচ্ছে! তোমার দেহের ভিতরেও কত জীবকোষ অর্থাৎ প্রাণী। তাদের ধ্বংস না ক'রে তুমি বাঁচতেই পার না। সুতরাং যদি "অহিংসা" মানে "হত্যা না করা" হয়, তবে "অহিংসা পরমো-ধর্মঃ" হতেই পারে না। এর মানে ওটি নয়। পরম ধর্ম কি ? শ্রেষ্ঠ ধর্ম কি ? নিজেকে জানা বা শ্রীভগবানকে জানা। এটিই মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। যখন এটি সিদ্ধ হয় তখন সর্বভূতে শ্রীভগবানের দর্শন হয়। তখন কে কাকে মারবে ? কে কাকে হিংসা করবে ? এই রহস্যটি না বোঝা পর্যন্ত অবতারদের লীলা বোঝা যাবে না।

লীলা বৈচিত্র্য

আমরা হত্যাকে যে চোখে দেখি, অবতারেরা কি ঠিক সেই চোখে দেখেন ? তুমি কুরুক্ষেত্রের ভীষণ হত্যাকাণ্ডের কথা তুলেছ। ভূষণ্ডী কাক কিন্তু বলেছিল, "এ আর কি ? কয়েকটা ছোঁড়াতে মিলে একটু মারামারি করেছে বই তো নয়। এ রক্তে আমার কিছুই হয় না। দেবী যখন অসুরদের মেরেছিলেন তখন একটুখানি রক্ত খেয়েছিলাম বটে।" দেবীর যুদ্ধের কথাই ভাব। মহিষাসুর বধ করলেন বটে কিন্তু বিধান দিলেন যে তাঁর পূজো করবার আগে মহিষাসুরের পূজো করতে হবে। হিরণ্যকশিপু বধের পরে ঠাকুর তার নাড়িভুঁড়ি আদর ক'রে মালার মতন প'রে আনন্দ করছেন। এ সব থেকে মনে হয় না কি যে তাঁদের বধ আর আমাদের বধ এক রকম নয় ? ভক্তেরাও বধ জিনিসটাকে অন্য ভাবে দেখেছেন। তাঁরাও "বধ" বলেন নি। বলেছেন "উদ্ধার", "লীলা" ইত্যাদি ইত্যাদি। রাবণের মা বুড়ী নিকষা লঙ্কা-ধ্বংসের পরেও বাঁচতে চাইছেন প্রাণের মায়াতে নয়, ঠাকুরের লীলা আরও বেশী ক'রে দেখবার জন্য। 'এক লক্ষ পুত্র আর সোয়া লক্ষ নাতি' গেল,—আর কেমন পুত্র,—রাবণের মত পুত্র গেল,—তবু বুড়ী ভাবছে, এ সব গিয়েছে তার আর কি, ঠাকুরের লীলা তো চলেছে !

শিষ্য। এ সব কথা যখন ভাবি তখন মনে হয় ভক্তেরা সব বেবাক পাগল। নানা দিব্যাস্ত্র পরিশোভিতা দেবীমূর্তি দেখে হতভম্ব হয়ে স্তব করছেন,—বিকট-দশন-বক্ত্র, লোল-জিহ্ব প্রচণ্ড নৃসিংহ মূর্তি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছেন,—তাই আবোল-তাবোল কত কি বলছেন। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দূর থেকে দেখে, তার বহু পরেও স্মরণমাত্র সঞ্জয়ের পুনঃ পুনঃ রোমহর্ষণ হচ্ছে,—সুতরাং অসংলগ্ন কথা তো হবেই। কেবল একটি কথা বুঝি না, অবতার পুরুষদের সহজ সৌম্য মূর্তি দেখেও ভক্তেরা কত কি বলেছেন, সেগুলিও ধারণা করতে পারি না। আধুনিক যুগের অবতার যেমন শ্রীচৈতন্য বা শ্রীরামকৃষ্ণ, তাঁরা আমাদেরই মতন খেয়েছেন দেয়েছেন, ঘুরে বেড়িয়েছেন, আলাপ

করেছেন,—তবু তাঁদের ভক্তেরা তাঁদের এমন একটি স্থানে স্থান দিয়েছেন যেখানে আমাদের মন বুদ্ধি যেতেই পারে না। শুধু তাই কেন, তাঁদের কাছে কত গোঁড়ামির কথা পর্যন্ত শুনি, যা আমার মোটেই ভাল লাগে না।

"যখন যেমন তখন তেমন"

গুরু। কি রকম বলতো?

শিষ্য। আমার একজন বন্ধু, ইনি সন্ন্যাসী, এম. এ. পাস, সংস্কৃত বেশ ভাল জানেন। ধর্মবিষয়ক একখানা ইংরাজী কাগজের সম্পাদন করেন। নিজেও কত সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছেন, তিনি আমায় একদিন বলছিলেন, "মহাপ্রভু দেবীর মন্দিরে গিয়ে বলিপূজা নিষিদ্ধ করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কিন্তু তা করেন নি। তিনি সকল বিষয়ের সমন্বয় করেছেন। তিনি বুঝিয়েছেন, যে যে-ভাবেই শ্রীভগবানকে পূজা করুক না কেন, আন্তরিক হলে নিশ্চয়ই শ্রীভগবানকে পাবে। এ জন্যই শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্ণাবতার। মহাপ্রভু অংশাবতার মাত্র।"

গুরু। একি কথা? অনন্তের আবার অংশ হয় কি? যার অন্ত নেই তাকে ভাগ করা যাবে কেমন ক'রে? চাঁদ সব সময়েই পূর্ণ; যে সময়ে আংশিক দেখা যাচ্ছে সে সময়েও চাঁদ পূর্ণই।

শিষ্য। বাবা, আপনার মনে নাই যে, আমাদের শ্রীশ্রীঠাকুর বাড়ীতেই একজন পণ্ডিত কথক এসেছিলেন? তিনি শঙ্করাচার্য, রামানুজাচার্য ইত্যাদি কত আচার্যের মতামতের কথাই বললেন। দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত কত মতবাদের চুল চেরা বিশ্লেষণই করলেন। শেষে তিনি বললেন যে এ সব কতকগুলি অন্ধের হাতী দেখা। যে হাতীর পায়ে হাত দিয়েছে সে বলছে, হাতী থামের মতন। যে অন্ধটি হাতীর গায়ে হাত দিয়েছে সে বলছে দেওয়ালের মতন। ইত্যাদি। ঠিক ঐ সময়টাতে আপনি অন্যত্র গিয়েছিলেন।

গুরু। তুমি প্রতিবাদ করলে না?

শিষ্য। না বাবা, তিনি বয়সে আমার থেকে অনেক বড়।

আপনিও তখন ছিলেন না। কিছু আর বলি নি। তবে কথক ঠাকুরকে বলতে ইচ্ছে হল যে আপনি যদি এ কথা বলেন যে শঙ্কর, রামানুজ এঁদের ঈশ্বর দর্শন হয় নি, তবে তাঁদের শুধু মতবাদ আলোচনা ক'রে আমাদের কি হবে, বলুন ?

গুরু। হাঁ, বাবা, ঠিক কথা। তাঁরা প্রত্যেকেই সবটাই জেনেছিলেন। "ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ" তবে তাঁরা স্থান কাল পাত্র অনুযায়ী যতটা বলা দরকার ততটুকুই বলেছেন। কিন্তু যেটুকু বলেছেন কিংবা তার মধ্যে যেটুকু লিপিবদ্ধ আছে, সেটুকুই যে সব, এ কথা বলি কেমন ক'রে ? যে যে প্রশ্ন তাঁদের সামনে করা হয়েছে, তারই তাঁরা উত্তর দিয়েছেন। আরও প্রশ্ন হলে আরও কথা হত। আমার জীবনের একটা কথা বলি। আমার গুরুদেব এক দিন আমার গুরুভাইদের বলছিলেন, "সমাধির কথা কি বলা যায় ? সেখান থেকে ১০০ হাত নেমে এসে তবে তোদের সঙ্গে কথা কইতে পারি।" আমি তখন কিছু বলি নি। সবাই চ'লে গেলে তাঁকে একা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "বাবা, আপনাকে বলতে হবে আপনি কোথায় উঠেছিলেন, আর কোথায় নামলেন ? আপনার আবার নামা ওঠা কি ?" তিনি উত্তর দিলেন, "তুই ওসব নিয়ে গোলমাল করবি না। ওদের ও রকম ক'রে না বললে ওরা ধারণা করতে পারবে কি ?" বাস্তবিক তাঁর সহজ অবস্থাই বা কি ? আর সমাধি অবস্থাই বা কি ? তাঁর যে সহজ-সমাধি। যখন মহাপ্রভুর লোমহর্ষণ হচ্ছে বা অন্য সাতটা কোনও সাত্ত্বিক বিকার হচ্ছে, তখনই তিনি সাত্ত্বিক ? আর যেই তাঁর লোম তাঁর গায়ের সঙ্গে লাগল অমনি তাঁর সত্ত্বগুণ চ'লে গেল ? এ'ও কি কখনও হয় ? তাঁর বিভিন্ন অবস্থাতেও তিনি তো তিনিই থাকেন। শ্রীশ্রীঠাকুর যখন চরম তত্ত্বের কথা বোঝাচ্ছেন তখনই তিনি ভগবান ? আর যখন [তিনি "আয়লো তোর খোঁপা বেঁধে দি, তোর ভাতার এলে বল্‌বে কি ?" এই সব ছড়া গাইছেন তখন কি তিনি ভগবান নন ?

শিষ্য। বাবা, এ ধারণা করা খুবই কঠিন। এতে মানুষবুদ্ধি এসেই পড়ে। এমনিই তো তিনি মানুষের বেশে এসে খাচ্ছেন দাচ্ছেন,

ঘুরে বেড়াচ্ছেন' দেখে তাঁকে মানুষ ব'লে স্বতঃই মনে হয়।

"অদ্যাবধি সেই লীলা করে গোরা রায়"

গুরু। কেন, ভগবান কি চৌদ্দপোয়া মানুষ হতে পারেন না? তাঁর সব শক্তি আছে, কেবল চৌদ্দপোয়া মানুষ হবার শক্তিটা তাঁর নাই?

শিষ্য। তাই ব'লে সব মানুষকে তো আর অবতার বলা যায় না। অবতারের শক্তি অমানুষী হওয়া দরকার। চৌদ্দপোয়া মানুষ, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারকা সৃষ্টি করেছেন? এমন সব তারাও আছে যা থেকে আলো এখনও পর্যন্ত এসে পৌঁছায় নি, তা'রা এতই দূরে আছে। সে সব চৌদ্দপোয়া মানুষের সৃষ্টি, এ কথা বিশ্বাস করা যায় কি?

গুরু। তোমাকে তো আগেই বলেছি যে ভক্তপ্রবর গিরিশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। একদিন স্বামী বিবেকানন্দও তাঁকে এই কথাই বলেছিলেন। তাতে শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন, "পরমহংসদেব সর্বশক্তিমান। তিনি যদি আমাকে বোঝান যে তিনি ভগবান, তোমাকে সে কথা না বোঝান, তুমি কি ধ্যান জপ ক'রে তোমার সাধনার বলে তাঁকে বুঝে নেবে?" বাস্তবিক ভেবে দেখ, গোপালের মার শাস্ত্রজ্ঞানই বা কি আর সাধন-ভজনই বা কি? তিনি তো পরমহংসদেবের উপরে অশ্রদ্ধা নিয়েই তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। পরমহংসদেবও তেমনি। কেবল রাত দিন তাঁর কাছে খেতে চাইতেন। গোপালের মা ভাবতেন, "এ আবার কি? পেটুক বামুন বুঝি।" কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর যে তাঁর মধ্যে গোপালের মায়ের ভাব উদ্দীপনা করছেন, সে কথা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কি? শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে গোপালের মা স্বামীজীকে বললেন, "হাঁ, আমার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে।" তখন শকুন্তলার বদনকমলস্থ ভ্রমরকে দেখবার পরে শকুন্তলার বংশপরিচয় নিতে ব্যস্ত রাজা দুষ্মন্তের মত স্বামীজীও মনে মনে কতই না খেদ করছেন, "হায়, আমি শাস্ত্রজ্ঞান নিয়ে পরমহংসদেবের গুণাগুণের আলোচনায় ব্যস্ত। আর গোপালের মা যে তাঁকে সম্ভোগ করছেন।" বাস্তবিক নরদেহে শ্রীভগবানের আবির্ভাব

বোঝা বহু ভাগ্যের কথা।

"অদ্যাবধি সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোনও কোনও ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

"যা নাই ভাণ্ডে, তা নাই ব্রহ্মাণ্ডে"

শিষ্য। এ ভাগ্য আমার কেমন ক'রে হবে? চৌদ্দপোয়া মানুষ বিশ্বসংসারের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কারী কেমন ক'রে বুঝব? এ যে বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি।

গুরু। না, তা তো নয়। অসংখ্য হাত কাঁকুড়ের অসংখ্য হাত বিচি। দেহটা সান্তের মত দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু সত্যিই কি সান্ত। কত কোটি জীবাণু এ দেহের মধ্যে জন্মাচ্ছে, পুষ্ট হচ্ছে, ক্ষীণ হচ্ছে, মরে যাচ্ছে, কে তার হিসাব রাখবে বল? সবই জীবাণু, কোনটা হাড়ের, কোনটা মাংসের, কোনটা রক্তের। নানা রকমের। এক সঙ্গে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় চলেছে। "যা নাই ভাণ্ডে, তা নাই ব্রহ্মাণ্ডে" এ অতি সত্য কথা। মা লক্ষ্মী একদিন রহস্য ক'রে ঠাকুরকে বলেছিলেন, "ঠাকুর, তুমি গোবর্ধন ধারণ করেছিলে, তুমি ভূভার ধারণ কর, এই সব কারণে তোমার কত যশ। আর আমি যে তোমাকে ধারণ করি, আমার কপালে কিন্তু একটুও যশ নেই।"

শিষ্য। যে কারণে অবতারের দেহ অনন্ত বলছেন, সেই কারণে আমার দেহও অনন্ত। তাই ব'লে আমি তো আর অবতার নই। আমি কি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করি?

গুরু। কেন, তুমিও তো স্বপ্নে কত কি সৃষ্টি কর। আবার জাগরণের সময়ে সেগুলি মিলিয়ে যায়। সুষুপ্তির সময়ে কিছুই থাকে না। তুমি যে আছ, সে বোধ পর্যন্ত থাকে না। আবার যেই জাগলে, থরে থরে বিশ্ব তোমার সামনে সাজান। এ অতি অদ্ভুত ব্যাপার। এটি রোজ ঘটছে ব'লে এর আশ্চর্যটা মনে আসে না। তুমি যদি জীবনে একবার মাত্র ঘুমাতে, একবার মাত্র স্বপ্ন দেখতে, একবার মাত্র জাগতে তবে, এই ব্যাপারের অদ্ভুতত্বের কথা ভেবে ভেবে তোমার গোটা

জীবনটা ভরে যেত। সত্যিই এ অতি রহস্যময় ব্যাপার। তুমি মোহাসক্ত জীব, তুমি সৃষ্টি স্থিতি লয় কর, আর তিনি কামিনী-কাঞ্চন-মান-ত্যাগী মহাপুরুষ,—তিনি পারেন না? এ কেমন কথা?

শিষ্য। আহা, আমি সৃষ্টি করি স্বপ্নে। এ যে জাগরিত অবস্থার কথা হচ্ছে।

গুরু। তাতে কি হয়েছে? স্বপ্ন কি অলীক? স্বপ্ন ক্ষণস্থায়ী, তাই কি অলীক? অনন্ত কালের তুলনায় জাগরিত অবস্থাই বা কতখানি? স্বপ্ন যখন দেখ, তখন কি একবারও মনে হয় যে ভুল দেখছ? আবার জেগেও কি ভুল দেখ না? রজ্জুতে সর্পভ্রম এ সব তো জানই। আর প্রত্যক্ষ দর্শনই বা কি? কোনও পদার্থ থেকে আলো বিকীর্ণ হয়ে অক্ষি গোলকের ভিতরে ঢুকে স্নায়ুমণ্ডলে ঢুকে একটা উত্তেজনা জাগিয়েছে। সেই উত্তেজনার সঙ্গে তোমার স্মৃতি মিলিয়ে বলছ এটা গাছ, এটা পাথর। কিন্তু বাস্তবিক গাছটাই বা কি আর পাথরটাই বা কি তা বলতে পার কি? গাছটাকে গাছ না ব'লে যদি কেউ পাথর বলত, তবে গাছ পাথরই হয়ে যেত। নাম যেমন মিথ্যা, রূপও তেমনি মিথ্যা। সবার চোখ ঠিক এক রকম নয়। আমি যে রং দেখছি, তুমি ঠিক সে রং দেখছ না। তবে কাজ চালাবার মত একটা মোটামুটি মিল আছে। এই পর্যন্ত। এই নাম রূপের অন্তরালে কি আছে, কে বলতে পারে? সুতরাং স্বপ্ন মিথ্যা, জাগরিত অবস্থা সত্য এটি জোর ক'রে বলা যায় না। কেবল এইটি বলা যায় যে স্বপ্ন একটা অবস্থা, আর জাগরণ আর একটা অবস্থা। একটি সত্য অপরটি মিথ্যা, এ দাঁড় করাবার মতন কোনও যুক্তি বিচার আজ পর্যন্ত হয় নি।

শিষ্য। বাবা, আমার অপরাধ নেবেন না। আমি বৃথা তর্ক করছি না। কিন্তু আমার কাছে সব গোলমাল ঠেকে, তাই এত কথা কইছি। ধরুন স্বপ্নে দেখলাম যে ঘোড়ার শরীর, কিন্তু হাতীর মুখ। একে অলীক ছাড়া কি বলি বলুন?

গুরু। কিন্তু তুমি আমাকে বল যে যখন স্বপ্নে উটি দেখেছিলে

তখন কিছু অসঙ্গত ঠেকেছিল কি? তখন কি ভাব নি যে ঘোড়ার শরীব হলে হাতীর মুখই হওয়া উচিত? যখন জাগলে তখনই শুধু মনে হল ভুল দেখেছি। বাবা, তুমি এত প্রশ্ন কবছ ব'লে তোমার সঙ্কোচবোধ হচ্ছে। কিন্তু আমার খুবই ভাল লাগছে। কাবণ আমি স্পষ্ট অনুভব কবছি যে শ্রীশ্রীঠাকুব আমাব গুরুমূর্তিতে আমাকে যেগুলি শিখিয়েছেন তোমাব রূপ ধ'রে এসে সেগুলিই শুনছেন। দেখছেন আমার পড়াটা মুখস্থ আছে কিনা। শুধু তাই কেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আবও কত কি শেখাচ্ছেন। তুমি এই স্বপ্নেব কথা ব'লে একটি সুন্দব মীমাংসা করলে। যেমন স্বপ্ন অবস্থায অসঙ্গত জিনিসও অসঙ্গত ঠেকে না, তেমনি অবতারেব সঙ্গ লাভে ধন্য ভক্তেরাও তাঁব কার্যে বা আচবণে বা কথায বিসদৃশ কিছু পান না। সেগুলি কিন্তু অপরের কাছে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ঠেকে।

শিষ্য। বাবা, আপনি ও বকম ক'রে বলবেন না, লজ্জায় যে আমি মরে যাই, বাবা। আপনার গুরুদেব শ্রীশ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের বিষয় আমি আপনার মুখেই কত না শুনেছি। তাঁর নামের সঙ্গে আমাব নাম এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণের যোগ্য নয়।

সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন

গুরু। আমাব গুরুদেবকে মানি বলেই তো এই কথা মানছি। তিনি যে এ কথা আমাকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়েছেন। এক মুহূর্তের জন্যও সে কথা ভোলবাব উপায় বাখেন নি। জান, বাবা, রোজই তো তাঁব কাছে যেতাম। একদিন তিনি কথা কইতে কইতে উঠে ভিতরে গেলেন। খানিকক্ষণ ফিরছেন না দেখে তাঁর খোঁজে এসে দেখি, তিনি ভিতরের একটা অন্ধকার কোণেতে, যেখানে আমবা আমাদের জুতোগুলি বাখতাম, সেইখানে বসে আমাদের জুতোগুলি নিয়ে মাথায় ঠেকাচ্ছেন, মুখে ঠেকাচ্ছেন। বুকে ঠেকাচ্ছেন। আমাদেব জুতোগুলিব তলা চাটছেন। তাতে রাস্তাব যত নোংরা সব মাখান,— তাই চাটছেন। আমি তো অবাক। আমাকে দেখতে পেয়ে প্রথমে ধমক

দিলেন, "তুই আবার এখানে কেন ?" পবে স্থুর নবম ক'বে বললেন, "না, না, তোর থাকা দরকার, তোর দেখা দবকাব।" পরে বোঝালেন, "দেখ্, আমি জানি, নিশ্চিতই জানি, যে পরমহংসদেব স্বযং তোদের মূর্তি ধ'রে আমাব কাছে এসেছেন। আমার পড়া ধরতে এসেছেন। তোবা জানিস না, এমন নয়, সব জেনে না জানার ভান ক'বে আমাব পেটেব কথা টেনে বাব করছিস। আমাব সাধ হয তোদের নমস্কার করি। তাতো তোবা করতে দিবি না। তাই তোদেব জুতোগুলি নিযেই যা হয় একটু করছি।"

শ্রীগুরুতে ঈশ্বর বোধ

শিষ্য। বাবা, এ বকম মানুষকে অবতাব আমিও বলতে পাবি। বাস্তবিকই ইনি বাক্যমনাতীত।

গুরু। হাঁ, বাবা, ঠিকই তাই। মহাপুরুষের সঙ্গ করতে কবতে ভক্ত এমন কিছু দেখতে পান, এমন কিছু বুঝতে পাবেন যে, যা অপবের মনে সন্দেহ জাগায়, তাতে করে তাঁব বিশ্বাস দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়। তুমি জান না যে লাটু মহারাজ একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরেব পা টিপছেন এমন সময় শ্রীশ্রীঠাকুব তাঁকে জিজ্ঞাসা কবলেন, "হ্যাবে, তোর রামজী এখন কি কবছেন ?" লাটু মহারাজ মাত্র দিন কত এসেছেন, তিনি উত্তর দিলেন, "সে হামি কি জানে ?" শ্রীশ্রীঠাকুব বললেন, "তোর রামজী এখন সূঁচেব মধ্যে হাতী গলাচ্ছেন।" বাস্তবিক লাটু মহাবাজ যখন তাঁর পা টিপছিলেন তখন কি লাটু মহাবাজ একবাবও ভেবেছিলেন যে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর ভিতরে ব্রহ্মজ্ঞান সঞ্চাবিত ক'বছেন ? পবে কিন্তু লাটু মহাবাজ নিজেও বুঝলেন, অপরেও বুঝতে পারলেন।

অবতরণ

শিষ্য। বাবা, আমার কি সে সৌভাগ্য হবে ? বাবা, আপনি তো জানেন যে আমি কি ? আপনাকে তো আমি সব কথাই বলেছি। সকলে আমাকে ভাল বললেও আমি যে ভাল নই, সে আপনিও জানেন,

আমিও জানি। আমার ভয় হয় যে অবতাব নীচে নামেন বটে, কিন্তু এত নীচে নামেন না যে আমাকে ধবতে পাবেন।

গুরু। বাবা, তুমি সার্কাসে ট্র্যাপিজেব খেলা দেখ নি? যিনি পাকা খেলোযাড, যিনি সার্কাসেব মাষ্টাব, তিনি খুব উঁচুতে টাঙ্গান দোলাতে পা বাধিযে, মাথা নীচু ক'রে হাত দুটি বাডিযে দিযে দুলতে থাকেন। নীচেকাব অপব একজন খেলোয়াড নীচে থেকে যেই লাফায় তেমনি তিনি তাকে ধ'বে ফেলেন। আব অমনি তখনই তাকে তুলে নিযে উঁচু দোলাতে তাঁব পাশেই বসিযে দেন। দর্শকবৃন্দ তখন আনন্দে হাততালি দেয়। উপনিষদের ভাষাতে বলতে গেলে বলতে হয়—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।" "সর্বদা সম্মিলিত এবং সমান নামধারী দুটি পাখী একই বৃক্ষকে আশ্রয় ক'রে রয়েছে।" যিনি অবতরণ কবছেন তিনিও যা, যিনি উদ্ধার হচ্ছেন তিনিও তাই। খেলা হবে বলেই এই রকম কবা। খেলতে গিযে বলতে হয়, উদ্ধারের জন্যই অবতাব। নইলে অবতরণেব প্রয়োজন কি?

শিষ্য। বাবা, শ্রীশ্রীঠাকুব শুধু স্বামীজীকেই স্বামীজী করেছেন। সবাইকে তো আর সে রকম করেন নি।

গুরু। আমি তো আগেই তোমাকে বলেছি যে স্বামীজী পর্যন্ত গোপালেব মায়ের অবস্থা দেখে কতই না খেদ করেছেন। গোপালেব মা স্বামীজীর মতন সকলকে সব বোঝাতে পারেন নি, কিন্তু তাই ব'লে তাঁব উপলব্ধি কিছু কম হয়েছিল কি? জালাতে বেশী জল ধবে, সরাতে কম জল ধবে। কিন্তু পূর্ণ হলে জালাতে আর এক ফোঁটা জল দিলেও উপচে পডে; সরাতে আব এক ফোঁটা জল দিলেও উপচে পড়ে। পূর্ণতাব দিক দিযে দুইই সমান। জালা, সবা পবস্পরে কোনও তফাৎ করে না। তফাৎ আমবা কবি। শক্তিব তাবতম্যই বা এত বড ক'বে দেখব কেন? পিঁপডে হাতীব কাজ করতে পারে না, এ কথা যেমন সত্য, হাতীও পিঁপডের কাজ করতে পারে না, এ কথাও তেমনি সত্য। প্রত্যেকেই নিজের নিজের অবস্থাতে ঠিক আছে। কেই বা বড়? কেই বা ছোট? ওখানকার আকাশ এখান থেকে নীচু

দেখায় আবার এখানকার আকাশ ওখান থেকে নীচু দেখায়। কোন্‌টা উঁচু? কোন্‌টা নীচু? শুধু দেখার তারতম্য। সবই যে তিনি; সুতরাং ভাবনা কিসের?

শিষ্য। বাবা, আপনি এত বলছেন, এত বোঝাচ্ছেন, এত আদর করছেন, তবু ভাবনা যায় না। তবু ভয় ভাঙ্গে না। বাবা, আমার ভয় ভাবনা, সংশয় সন্দেহ, দুঃখ বেদনা সবই আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করছি। আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক।

নাহং, নাহং, তুঁহুঁ, তুঁহুঁ।

—o—

কর্মফল ও সমর্পণ রহস্য

জন্মান্তরবাদ ও কর্মফল

গুরু। সে দিন তুমি সুকৃতি দুষ্কৃতিব কথা তুলেছিলে। তুমি বোধ হয় মনে কব যে, পূর্ব জন্মার্জিত সুকৃতি দুষ্কৃতিব ফলেই কেউ ভক্ত- কেউ বা সংসারী হয় ?

শিষ্য। হাঁ, বাবা।

গুরু। শ্রীশ্রীঠাকুব এ বিষযে আমাকে একটি মজাব গল্প বলেছিলেন। এক চোব এক গেরস্তব বাড়ীতে চুবি কববার জন্য সিঁধ কেটে তার ভাঁড়ার ঘরে ঢুকেছে। তখন শীতকাল। জালাব চাল চুরি করবার জন্যে চোর তার গায়ের আলোয়ানখানি ঘবেব মেঝেতে পেতেছে, এবং জালা থেকে চাল ঢালবার চেষ্টা কবছে। পাশেব ঘরেই গেবস্ত শুয়েছিল। সে টেব পেয়ে অন্ধকারের মধ্যেই চোবেব আলোয়ানখানি সরিয়েছে। এদিকে চোব জালাব চাল বেঁধে নেওয়ার জন্য আলোয়ানেব খুঁট খুঁজছে। কিন্তু আলোযানই নাই, খুঁট আর কেমন ক'রে পাবে ? ইত্যবসরে গেরস্ত "চোর, চোর" বলে সোরগোল ক'রে চোবকে ধ'রে ফেলে তাকে মারবাব উপক্রম করছে। চোর হাত জোড ক'রে বলছে, "চোরকে মারা হবে তো ? কিন্তু চোর কে ?" তাব মতলব এই যে "আপনি তো আমাব আলোয়ানখানি গ্যাঁড়া দিযেছেন। আপনাব চাল তো মেঝেতে পড়েই আছে। চোর কে এটি বিবেচনা ক'রে মাব ধোব করুন।" বাস্তবিক কে চোব, কে সাধু, এত সহজে বোঝা যায কি ? জগাই মাধাই যতদিন উদ্ধাব হন নি ততদিন কেউ তাঁদের পূর্বজন্মেব সুকৃতির কথা বলেন নি। যেই তাঁদেব উদ্ধাব হল অমনি পূর্ব জন্মের ইতিবৃত্ত টেনে আনা হল।

শিষ্য। বাবা, আপনি কি এইটে বলতে চাইছেন যে, সব

দুষ্কৃতকারীই জগাই মাধাই এর মতন! কারু উদ্ধার হয়, কারু বা হয় না কেন? এ বৈষম্য কেন?

গুরু। আচ্ছা, জন্মান্তরবাদ মানলেই কি এই বৈষম্যের মীমাংসা হয়? তুমি বলতে চাইছ যে পূর্বজন্মের পাপের ফলেই এ জন্মের দুর্দ্দশা হয়। আগের জন্মেই বা পাপ হল কেন তার উত্তরে বলা হবে যে তারও আগের জন্মে প্রলোভনে পতিত হয়ে দুষ্কর্ম অনুষ্ঠান করা হয়েছে। বরাবর তারই জের টেনে আনা হচ্ছে। এই ভাবে সৃষ্টির আদিতে যাওয়া যাক। এ প্রসঙ্গে সৃষ্টির আদি মানতেই হবে। তা নইলে ভগবান থাকেন না, পাপ পুণ্যও থাকে না, তাদের বিচারও থাকে না। কর্মফলও থাকে না। সৃষ্টির আদিতে সবাই সমান প্রলোভন এবং সমান প্রলোভন জয়ের ক্ষমতা পেয়েছে, এটিও মানতে হবে। কেউ প্রলোভনে মুগ্ধ হল, কেউ বা প্রলোভন জয় করতে পারল কেন? সুতরাং এখন যে বৈষম্য দেখছি, সেই বৈষম্যের বীজ সৃষ্টির আদি থেকেই বর্তমান, নতুবা এখন বৈষম্য হতে পারে না। তাই নয় কি?

শিষ্য। হাঁ, বাবা, তাই বটে। ভগবান পক্ষপাত করেছেন এ কথা বলতে পারি না। আর যদি তিনি পক্ষপাত করেই থাকেন, তবে তার জন্য আমাদের দায়ী করা কেন? কিন্তু, বাবা, বৈষম্য তো রয়েছে দেখতেই পাচ্ছি। বৈষম্যের প্রকৃত কারণ তবে কি?

গুরু। এর ঠিক উত্তর এই যে, বৈষম্যের মতন দেখাচ্ছে বটে কিন্তু সত্যিই বৈষম্য নাই। তিনিই সব হয়েছেন,—সেজেছেন বলছি না, কারণ সাজ ব'লে আলাদা কিছু নেই।

শিষ্য। বাবা, এ তো ধারণা করতে পারি না। শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখ পেলে তবে বলতে পারি কালীঘাটে কালীঘরেও তিনি আবার বারান্দায় বেশ্যা হয়ে বসে থাকেন এও তিনি। সে চোখ তো পাই নি।

গুরু। কিন্তু, বাবা, শ্রীশ্রীঠাকুরের সত্য দৃষ্টি, তাঁর সত্য দর্শন, এটি মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কি বল?

শিষ্য। বাবা, আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। আমার মনের ভাব আপনাকে বুঝিয়ে বলছি। পাটীগণিতে জটিল ভগ্নাংশ একটি

আছে। যতবারই অঙ্কটা কষছি একটা না একটা মস্ত বড় ভগ্নাংশ উত্তর হচ্ছে। পাটীগণিতের উত্তরমালাতে কিন্তু দেখছি উত্তর '১'। বার কয়েক কষবার পরে মাষ্টার মশাইর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, "পাটীগণিতে ভুল নাই। এ অঙ্ক আমি নিজে কষেছি। '১' উত্তরই পেয়েছি। তোমারই ভুল হচ্ছে। দেখছ না এক একবার এক এক রকম উত্তর তুমি পাচ্ছ।" আমি এটা বুঝি যে আমার মনে যখন সংশয় রয়েছেই, অতএব কর্মফল মেনে নেওয়া সত্ত্বেও জগতের প্রকৃত রহস্য আমি বুঝি নি। কিন্তু পাটীগণিতে আছে ব'লে এবং মাষ্টার মশাই নিজে কষেছেন ব'লে, অঙ্কের '১' উত্তরও আমি নিঃসন্দেহে মেনে নিতে পারছি না। যদি মাষ্টার মশাইর মতন আমিও অঙ্কটি নিজে কষে '১' উত্তর পাই, তবেই আমি নিঃসন্দেহ হতে পারি। বাবা, শ্রীশ্রীঠাকুর মিছে কথা বলেছেন এ কথা বলতে পারি না, কিন্তু মা-ই সব হয়েছেন এ বিষয়ে আমার মনে দৃঢ় প্রতীতি কই ?

কর্মফল আছেও বটে নাইও বটে

গুরু। হাঁ, বাবা, তুমি ঠিকই বলেছ। এ সবই অবস্থাগত ব্যাপার। এক অবস্থাতে পূর্বজন্ম পরজন্ম পাপপুণ্য সবই আছে। অন্য এক অবস্থাতে এ সব কিছুই নাই। দেশ কাল পাত্র এ সব কিছুই নাই। কেবল তিনিই, তিনিই।

শিষ্য। এ সব আমার ধারণার বাইরে, এ কথা তো আগেই আপনার কাছে নিবেদন করেছি।

গুরু। বাবা, শোন, বাবা, একটা মজার কথা শোন। এই তো সেদিন অবতারের কথা হল। শ্রীশ্রীঠাকুর বারে বারে আসেন। এসে তিনি কি চুপ ক'রে থাকেন ? তিনি এটি করতে বারণ করেন ; উটি করতে বলেন। সুতরাং কর্মের ফল আছে বই কি। নতুবা তিনি এভাবে বকে মরেছেন কেন ? শ্রীশ্রীঠাকুর গলায় ক্যান্সার নিয়েও, যিনি আসছেন তাঁকেই কোন্‌টা সুকর্ম কোন্‌টা কুকর্ম বোঝাচ্ছেন। আবার অন্যদিকে দেখ যদি পূর্বজন্মার্জিত কর্মফলে আমরা একেবারে

বদ্ধ হই, তবে যেটা হবার তাই তো হবে, তবে আর তিনি এভাবে বকে বকে মাথা বকাবেন কেন? অতএব বুঝতে হবে যে তাঁর নির্দেশ মত চললে পূর্বজন্মের কর্মফল নিশ্চয়ই অতিক্রম করা যায়। তিনি তো আর বাজে কথা কইছেন না। অতএব অবতার মানলে বলতে হয় যে কর্মফল আছেও বটে, নাইও বটে। কিন্তু তুমি ঠিকই বলেছ, বাবা। এটি হেঁয়ালির মতনই ঠেকে বটে। দৈব পুরুষকারের দ্বন্দ্ব আজকার নয়, বহুদিনের। একটা উপমা দিলে ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার হতে পারে। ধর, তুমি তোমার একটা জিনিস পরে দরকার হবে ব'লে চালের বাতায় গুঁজে রাখলে। কিছুদিন বাদে সে কথা ভুলেই গেলে। বহুদিন বাদে আবার সেই জিনিসটির দরকার হল। অনেক খোঁজাখুঁজির পরে চালের বাতাতে জিনিসটি পেলে। তুমিই রেখেছিলে, এ কথা তুমি ভুলে গিয়েছ, তাই তোমার মনে হল যে এটি দৈবাৎ পাওয়া গেল। কিন্তু সত্যিকার ব্যাপার এই যে তুমি রেখেছিলে, তাই পেলে। নইলে পেতে না। একে পুরুষকার বলব? না দৈব বলব? ভুলের জন্য এই রকমটা হয়েছে। ভুল ভেঙ্গে গেলে বোঝা যায় যে, হয় বলতে হয় সবই দৈব, আর না হয় বলতে হয় সবই পুরুষকার। দৈব, পুরুষকার ব'লে আলাদা কিছু নাই। শ্রীভগবান গীতাতে বলছেন যে তিনিই 'পৌরুষং নৃষু'। একটা অবস্থা পাওয়া যায় যখন মনে হয় সবই দৈব, পুরুষকার ব'লে কিছু নাই।

শিষ্য। এ অবস্থা কি সম্ভব?

গুরু। সম্ভব বই কি। পুরুষকার লাগাতে লাগাতে দেখা যায় যে, যেটিকে পুরুষকার মনে করেছিলাম সেটি পুরুষকার নয়, সেটিও দৈবই। আমার জীবনের একটা ঘটনা বলি শোন। আমি মাঝে মাঝে, বছরে দুই একবার, মা কালীর নিবেদিত মাংস খেতাম। একদিন স্বপ্ন দেখছি যে শ্রীশ্রীঠাকুর পাঁঠার একটা ঠ্যাং হাতে ক'রে এনে আমাকে দেখাচ্ছেন, আর বলছেন, "এইগুলি তুই খাস্?" এমন বিকৃত মুখে বললেন যে মাংস খাবার ইচ্ছা আর রইল না। আর জীবনে কখনও মাংস খেতে

পারি নি। এই ঘটনার কিছুদিন বাদে একদিন সোল মাছ, ঘি আদা গরম-মশলা দিয়ে ঠিক মাংসের মতন ক'রে রান্না হয়েছে ; সে সোল মাছও খেতে পারলাম না,—তখন মাংসের উপরে এতই বিতৃষ্ণা হয়েছে। আগে পুরুষকার লাগিয়েছিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর বারণ করছেন, আর মাংস খাব না। পরে কিন্তু সে ভাব ছিল না। মাংসের উপরে ঘৃণার দরুণ অপ্রবৃত্তি হল। একে পুরুষকার বলব ? না দৈব বলব ? মাংস খাব না এই যে আমার আগেকার সংকল্প সেও তাঁর বিকৃত মুখভঙ্গীর ফলেই। সুতরাং তাকেও পুরুষকার ঠিক বলা যায় না। সত্যি কথা এই যে সবই দৈব। তাঁর ইচ্ছা না হলে গাছের পাতাটিও নড়ে না।

শিষ্য। সবই তিনি করছেন ? তবে আমাদের ফল ভোগ করতে হচ্ছে কেন ?

গুরু। তিনি করছেন এ বোধ নাই। কর্তৃত্ব আর ভোক্তৃত্ব এক-সঙ্গে বাঁধা। আমি করছি মনে হলেই আমাকে ভুগতে হবেই।

শিষ্য। এ অকর্তা বোধ কি সহজে হয় ?

"খোদা দেনেওয়ালা হ্যায়"

গুরু। তা যদি নাও হয়, তবু এটা বোঝা কঠিন নয় যে, আমার একজন উপরওয়ালা আছেন। অনেক সময়েই দেখা যায় যে আমার বিপুল চেষ্টা বিফল হচ্ছে, আবার অন্য সময়ে দেখা যায় যে আমার সামান্য চেষ্টা সফল হচ্ছে। একটা অদৃশ্য শক্তি প্রতিনিয়তই আমার জীবন নিয়ন্ত্রিত করছে। যখন সেটি আমার মতের সঙ্গে মেলে তখন বলি শক্তিটি ভাল। যখন মেলে না তখন বলি মন্দ। শোন, বাবা, একটি মজার গল্প শোন। এক বাড়ীতে দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে হল। বিধাতা পুরুষ তাদের কর্মফল বিচার ক'রে একটি ছেলের কপালে "ম্যাজিষ্ট্রেট" (Magistrate), একটি ছেলের কপালে "কমিশনার" (Commissioner) এবং মেয়েটির কপালে "রাণী" লিখে দিলেন। শ্রীভগবান এসে বললেন, "একি করেছ তুমি ? এ সব লিখেছ কেন ? এদের তো আমি এ সব করব না।" বিধাতা পুরুষ বললেন, "এই

দেখুন এদের পূর্ব পূর্ব জন্মের কত সুকৃতি। আমার লেখা আমি কাটি কি ক'রে?" শ্রীভগবান তখন "ম্যাজিষ্ট্রেটের" আগে "অনারারি" (Honorary), "কমিশনারের" আগে "মিউনিসিপ্যাল" (Municipal) এবং "রাণীর" আগে "ম্যাথ" বসিয়ে দিলেন। তিনি কি শুধুই বিচারক? তবে তাঁকে ডাকবার দরকার কি? আমাদের কর্ম অনুযায়ী যা হবার তাই হবে। শ্রীশ্রীঠাকুর এ সম্বন্ধে আমাকে কি বলেছেন, শোন বাবা। যদি শ্রীভগবান আমাদের পাপ পুণ্যের সূক্ষ্ম হিসাবই শুধু রাখেন তবে তাঁকে অডিটার (Auditor, হিসাব পরীক্ষক) এর মান্য দেব। আর যদি তিনি আমাদের পাপ অনুযায়ী দণ্ড এবং পুণ্য অনুযায়ী পুরস্কার দেন, তবে তাঁকে জজ সাহেব ব'লে মানব। কিন্তু যদি তিনি তাঁর পবিত্রতা দিয়ে আমার অপবিত্রতা মুছে দেন, তবেই না তাঁকে শ্রীভগবান ব'লে মানব। শুধু সেই শ্রীভগবানকেই চাইব। শুধু সেই শ্রীভগবানকেই ভালবাসব।

শিষ্য। হাঁ, বাবা, ঠিক কথা। তা হলে পাপ পুণ্য একটা কথার কথা মাত্র হয়। আমার তো আর এখন এ অবস্থা নয়। মনে হচ্ছে এটাও পারি, ওটাও পারি। পারা বা না-পারা দুই-ই যে তাঁর কাছে সমান হতে পারে এটা বুঝলে তো সব গোল মিটেই যেত।

পুরুষকার ক্ষয় করলে তবে দৈব বোঝা যায়

গুরু। হাঁ, বাবা, এখন পুরুষকার আছে। অতএব পুরুষকার কেবল সংসারে না লাগিয়ে তাঁর দিকেও লাগাই। তা হলে পুরুষকারের রহস্য ভেদ হবে। দড়িবাঁধা গরু যদি খোঁটার কাছে শুয়ে শুয়ে লেজ নাড়ে, আর বলে "আমি বদ্ধ" তবে সেটা কথার কথা মাত্র হয়। আর যদি সেই গরুটা ছুটে যায়, দড়িতে হ্যাঁচকা টান খেয়ে যদি তার মুখ দিয়ে রক্ত পড়ে এবং তখন বলে "আমি বদ্ধ", তবে সেটি সত্য অনুভূতি। পুরুষকার লাগিয়ে তবে বোঝা যায় আমাদের পুরুষকারের শক্তি যৎসামান্য। তার আগে যদি বলি "পুরুষকারে কি কিছু হয়, সবই দৈব সাপেক্ষ," তা হলে সেটি মিথ্যা কথা হবে। মাস্তুলের পাখী

ছুটোছুটি না করা পর্যন্ত কেমন ক'রে বুঝবে যে মাস্তুলে বসে থাকা ছাড়া আর উপায় নাই ?

শিষ্য। হাঁ, বাবা, এখন যে অবস্থায় আছি তাতে আমাকে পুরুষকার মানতেই হবে এটি আমি বুঝেছি। কিন্তু কর্মফল মানলেও কোন্ কাজটা ভালো, কোন্ কাজটা মন্দ, সব সময়ে বুঝতে পারি না। পুরুষকার লাগাতে হবে বুঝি, কিন্তু কোন্ দিকে লাগাতে হবে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে পারি না। কোন্‌টা পাপ, কোন্‌টা পুণ্য এটি ঠাহর করতে পারি না। শ্রীশ্রীঠাকুর কসাইকে অন্নদানের উপাখ্যানে বুঝিয়েছেন যে কসাইকে অন্ন না দিলে গৃহস্থের অতিথি সেবা করা হয় না, আবার অন্ন দিলে সেই অন্নের শক্তিতে কসাই কর্তৃক গো বধের পাপের অর্ধেক অর্শাবে।

"যাঁহা বায়ান্ন, তাঁহা তিপ্পান্ন"

গুরু। হাঁ, বাবা, ধর্মস্য সূক্ষ্মাগতিঃ (ধর্মের গতি সূক্ষ্ম)। ভাল কাজ ক'রে যেমন মন্দ ফল হয়, মন্দ কাজ ক'রেও তেমনি ভাল ফল হতে পারে। এ বিষয়ে আমার গুরুদেব আমাকে একটি উপাখ্যান বলেছিলেন। একজন ডাকাতের সর্দারের ডাকাতি ক'রে ক'রে ডাকাতিতে ঘেন্না হয়ে গেল। দেখে যে লুটপাট ক'রে যা পায়, বখ্‌রা দিতেই ফুরিয়ে যায়। লোক খুনেতেও তার বিরক্তি এল। বায়ান্নটা খুন ততদিনে হয়ে গিয়েছে। যা হ'ক বনের ভিতরকার একজন সাধুর কাছে গিয়ে সে কেঁদে বললে, "আর আমার ডাকাতি ভাল লাগছে না। আমার মতন পাপীর কোন উপায় হয় ?" সাধু বললেন, "কেন হবে না ? ভগবান যে নিরুপায়ের উপায়। তুমি তাঁকে ডাক। সব ব্যবস্থা তিনিই ক'রে দেবেন।" ডাকাতটি বললে, "আমার পাপ যে তিনি ক্ষালন ক'রে দিলেন তা কেমন ক'রে বুঝব ?" সাধু উত্তর দিলেন, "এই যে হলদে ন্যাকড়াখানা তোমাকে দিচ্ছি, এখানা যখন সাদা হয়ে যাবে তখন জেনো তুমি নিষ্পাপ হয়েছ।" সাধুর

কথাতে ডাকাতটি গভীব বনেব ভিতবে নির্জনে বসে ব্যাকুল হয়ে ভগবানকে ডাকে। একদিন হঠাৎ একজন সালংকারা, সুশ্রী সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া যুবতী "বাবা গো, রক্ষা কব," ব'লে আর্তনাদ কবতে কবতে ডাকাতটিব কাছে ছুটে এল। তাকে মা ব'লে অভয় দিযে আদব ক'বে বসিয়ে তাব কাছে জিজ্ঞাসা ক'বে সব বৃত্তান্ত ডাকাতটি শুনলে। মেযেটি লোকজন সমভিব্যাহাবে পাল্কী ক'বে যাচ্ছিল। পথে ডাকাতেব দলের হাতে পড়ে। লোকজন ছত্রভঙ্গ হযে কে কোথায় চলে গিযেছে। মেয়েটি ধর্ম রক্ষাব জন্য একা নিবিড় বনেব ভিতবে লুকাতে এসেছে। মেয়েটির মুখের কথা মুখেই আছে, এমন সময়ে যে ডাকাতের দল তাকে তাড়া করেছিল, সেই দলেব দলপতি এসে উপস্থিত। সে এসেই সাধু ডাকাতকে চিনতে পেরেছে। বলছে, "দাদা, এ ভোল কদ্দিনেব ? যাক্ বুদ্ধিটা বেশ তোমাব দেখছি। আমাদেব সবার সর্দাব তুমি, তোমার বুদ্ধি হবে না ? আমবা দৌড় ঝাঁপ ক'বে কত হয়রান হই, আর তুমি বসে বসে শিকার দিব্যি আবামে পাও।" মেযেটি এ কথা শুনে ভাবলে, "সর্বনাশ ! একি ডাকাতের সর্দারের হাতে পড়েছি। কড়া থেকে উনুনে পড়েছি।" তাব ভাবগতিক দেখে সাধু ডাকাতটি বললে, "মা, ভয় নেই। তোমাকে আমি বাড়ী পৌঁছিযে দেব।" এদিকে ডাকাতেব দলপতি সাধু ডাকাতকে বলল, "দেখ, দাদা, তুমি আমাদেব সর্দার, তোমার মান্য আছেই আছে। যদিও খাটুনিটা সব আমরাই খেটেছি, তবু আমাদেব সবাইকে অর্ধেক দাও, তুমি একা অর্ধেক নাও।" সাধু ডাকাত বললে, "না ভাই, সে হয না। ওকে আমি অভয দিযেছি।" দলপতি বললে, "না হয তুমি গহনাগুলি সবই নাও। শুধু মেযেটাকে আমাদের দাও।" সাধু ডাকাত বললে, "তুই কী বলছিস ? ওকে আমি মা বলেছি, বাড়ী পৌঁছিয়ে দেব বলেছি তুই শুনিসনি ?" এই বকম কথা কাটাকাটি হতে হতে দলপতিব বাগ বাড়ছে। সাধু ডাকাতেব মাথাযও খুন চেপেছে। ঘবের কোণ থেকে একখানা ডাল নিয়ে ঘুবিয়ে, "ধাঁহা বাষান্ন, তাঁহা তিপ্পান্ন" বলে দলপতিকে এমন জোবে মেবেছে যে দলপতি মবে গিয়েছে। তাব মৃত্যু দেখে সাধু ডাকাত খুব কাঁদছে আব বলছে,

"ঠাকুর, আমার মনে তো কোনও অসদভিপ্রায় ছিল না। আমি দিব্যি বসে তোমাকে ডাকছিলাম। মাঝখান থেকে এই মেয়েটি এসে সব গোল বাধালে।" কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ তার দৃষ্টিটা হলদে ন্যাকড়াখানার উপর পড়েছে। সে দেখছে যে ন্যাকড়াখানা একদম সাদা হয়ে গিয়েছে। আশ্চর্য হয়ে সে "গুরুদেব, গুরুদেব" বলে চীৎকার করছে। তখনই গুরুদেব উপস্থিত হয়ে এসে বললেন, "বাবা, তুমি কামিনী কাঞ্চন মান একসঙ্গে ত্যাগ করেছ। যুবতীটিকে মা বলেছ। তার অলংকারশুদ্ধ তাকে বাড়ী পৌঁছিয়ে দেবে বলেছ। ডাকাতের দলপতি তোমাকে সর্দারের মান্য দিতে চেয়েছিল, তাও তুমি প্রত্যাখ্যান করেছ।"—বাবা, আমরা শুধু বাইরেটা দেখি। শ্রীশ্রীঠাকুর যে ভিতরটা দেখেন। আমাদের দেখা আর তাঁর দেখা, তফাৎ হবেই তো। গীতার সেই শ্লোকটা বল তো, বাবা, বুদ্ধিমান কর্মে অকর্ম দেখেন, অকর্মে কর্ম দেখেন।

শিষ্য। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ১৮শ শ্লোকটার কথা বলছেন, বাবা?

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥

যিনি কর্মে অকর্ম দেখেন এবং অকর্মে কর্ম দেখেন তিনিই মনুষ্যদের মধ্যে বুদ্ধিমান, তিনি যোগী, তাঁর সব কাজ করা হয়েছে।

গুরু। হাঁ, বাবা, ঐ শ্লোকটিই; যিনি এ রকম দেখেন তিনি শুধু বুদ্ধিমান নন, তিনি যোগী, তিনি সর্বকর্মী।

"সেথায় সবই উল্টো ঢং"

শিষ্য। বাবা, আমি যখন ইটালিতে বেড়াতে গিয়েছিলাম তখন ফ্লরেন্স শহরের বিখ্যাত চিত্র প্রদর্শনীটিও দেখেছিলাম। সেখানে যীশুখ্রীষ্টকে চল্লিশটি মুদ্রার লোভে ধরিয়ে দেবার পরে যীশুখ্রীষ্টের শিষ্য

জুডাসের অনুতাপের একটা অদ্ভুত ছবি দেখেছি। জুডাসের চুলগুলি উস্কোখুস্কো। কপালের শিরগুলি ফুলে উঠেছে। দুটি হাত দৃঢ়ভাবে মুষ্টিবদ্ধ। মুখখানা বিকট হয়েছে। মনে হল শেষ ভোজের পরে যীশুখ্রীষ্ট তাঁর অন্য শিষ্যদের যেমন আদর ক'রে পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন, জুডাসের পাও ঠিক তেমনি ক'রেই ধুইয়েছিলেন। জেনে শুনেই ধুইয়েছিলেন, কারণ তিনি তো সে সময়ে স্পষ্টই বলেছিলেন যে তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে ধরিয়ে দেবে। তাঁর ভুল হয় নি। তিনি জানতেন জুডাসের মনে এমন অনুতাপের আগুন জ্বলবে যে তাতে পুড়ে জুডাস শুদ্ধ পবিত্র হবে।

গুরু। হাঁ, বাবা, ঠিক তাই-ই। আমরা বাইরে থেকে দেখছি যে জুডাসের জীবনটা ব্যর্থ হল। যীশুখ্রীষ্টের পুণ্য সঙ্গলাভেও তার মনের দুষ্প্রবৃত্তি গেল না। অনুতাপে দগ্ধ হয়ে তাকে আত্মহত্যা করতে হল। কিন্তু মরণের পরে তার কি হল তাতো আমরা জানি না। আমরা আগে কি হয়েছিল, তাও জানি না, পরে কি হবে তাও জানি না। এখন যেটি ঘটছে তাও আমাদের আসক্ত, চঞ্চল মন দিয়ে আবছা আবছা দেখছি। সুতরাং ভাল মন্দ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হব কেমন ক'রে?

শিষ্য। হাঁ, বাবা, আমি সে কথা বুঝি। কিন্তু তাই ব'লে ভাল মন্দ ব'লে কি কিছু নাই?

গুরু। আছে বই কি। কিন্তু সে ব্যবহারিক সত্ত্বাতে। আভ্যন্তরিক সত্ত্বাতে ভাল মন্দ আর কি বল? তিনিই সব হয়েছেন, একটা খেলা চলেছে, এই মাত্র।

নিষ্কাম কর্ম

শিষ্য। কি ক'রে ব্যবহারিক সত্ত্বা অতিক্রম ক'রে আভ্যন্তরিক সত্ত্বাতে যাওয়া যায়? কি ক'রে কর্ম, অকর্মের দ্বন্দ্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়?

গুরু। কেন, তুমি তো গীতা পড়েছ। শুভাশুভ ফল কামনাই

কর্মের বন্ধন। নিষ্কাম কর্মে বন্ধন থাকে না।

শিষ্য। বাবা, গীতা আমি পড়েছি, এ কথা সত্য। কিন্তু এটা আমার কিছুতেই মাথায় আসে না যে, আমার কাজের সফলতা ও বিফলতা দুই-ই যদি আমার কাছে সমান হয়, তবে কাজের প্রেরণা আসবে কোথা থেকে ? যদি পরীক্ষায় পাস ফেল দুই-ই আমার কাছে একই হয় তবে আমি রাত্তির জেগে পড়া মুখস্ত করব কেন ? চিৎ হয়ে শুয়ে থাকব।

গুরু। সপ্তকাণ্ড রামায়ণ শুনবার পরে একজন বলেছিল "সীতা কার বাপ ?" এও যে সেই গোছের কথাই হল। অর্জুন বলেছিলেন যে তিনি লড়াই করবেন না, বনে যাবেন। এটি যে তাঁর ভুল হচ্ছে এই জন্যেই শ্রীভগবান তাঁকে গীতা বোঝালেন। বললেন, "সব্যসাচী, তুমি নিমিত্ত মাত্র হও। অর্থাৎ তুমি দুই হাতে মানুষ কাট, কিন্তু অকর্তা হও।"

শিষ্য। বাবা, এটি হেঁয়ালির কথা।

গুরু। হেঁয়ালির কথা তো বটেই। অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা শোনবার পরে অর্জুন বলছেন,

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা তৎপ্রসাদাম্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥"

"হে অচ্যুত, আমার মোহ নষ্ট হয়েছে। তোমার প্রসাদে আমার আত্মজ্ঞানরূপ স্মৃতি পেয়েছি। আমার সন্দেহ আর নাই। তুমি যা বলছ আমি তাই করব। তুমি আমাকে করতে বলছ, এতেই আমার কাজের যথেষ্ট প্রেরণা হচ্ছে। তুমি বলছ, তাই না আমি করছি; সুতরাং কাজের ফল তোমাতেই অর্শাবে, আমাতে নয়। কর্মফল ত্যাগ তো হবেই, কিন্তু কর্মত্যাগ হবে না।" বাবা, আগেই তো বলেছি, কর্তার সঙ্গে কর্ম বাঁধা। যখন কর্তৃত্ব বোধ থাকে না, করণ অর্থাৎ নিমিত্ত মাত্র বোধ হয়, তখন কর্ম আর করা হয় কেমন ক'রে ?

সন্ন্যাসী গুরু এবং রাজ শিষ্যের উপাখ্যান

এ বিষযে শ্রীশ্রীঠাকুর একটি স্থন্দর উপাখ্যান আমাকে বলে-ছিলেন। একজন রাজা খুব কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন। কিন্তু তাঁর মনে শান্তি ছিল না। মনে হত "আমার প্রজারা গরীব। কম খাজনা দিলে তাদের স্থবিধা হয়। কিন্তু কম খাজনা নিলে আমি রাজপুরুষদের বেতনই বা দিই কেমন ক'রে? আর আত্মীয় স্বজনদের ভরণপোষণই বা করি কি ক'রে? প্রজাদের ট্যাক্স কমান দরকার, রাজপুরুষদের বেতন বাড়ান দরকার, আত্মীয় স্বজনদের জন্যও আরও বেশী খরচ করলে ভাল হয়।" রাজার মনে এই বিষম সমুপস্থিত হল। ভাবলেন, "কি উপায় করি।" মনে হল "অর্জুনের বিষম এলে শ্রীভগবান স্বয়ং এসে তাঁকে সব বুঝিযেছিলেন। তাঁর কথাগুলি গীতাতে অবশ্য রয়েছে। কিন্তু ঠাকুর কত কথাই না বলেছেন। সবই চমৎকার। তার মধ্যে কোন্‌টা করি? শ্রীভগবানের মতন বক্তা আর অর্জুনের মতন শ্রোতা! তবু অর্জুনের কত সংশয়! প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করছেন। অর্জুনের যেখানে সন্দেহ, আমার সে জায়গায় সন্দেহ না হয়ে যদি অন্য জাযগায় সন্দেহ হয? সে সন্দেহের সমাধান গীতা থেকে কেমন ক'রে হবে?" রাজা ভাবতে লাগলেন, "আমি রাজা, তাই আমাকে প্রজার কথা, আমার রাজপুরুষদের কথা, রাজপরিবারের কথা ভাবতে হচ্ছে। এ সবে আমি আসক্ত, এই জন্যেই আমার কষ্ট। এ আসক্তির হাত থেকে অব্যাহতি পেলেই কষ্ট থেকেও অব্যাহতি পাই। কিন্তু আসক্তি তো কাটাতে পারি না। যদি এমন কাউকে পেতাম যাঁর আসক্তি ত্যাগ হয়েছে তবে তাঁর কাছ থেকে আসক্তি ত্যাগ শিখতে পারতাম। তিনি কাশীতে গিয়ে কাশীর কথা কইবেন। ম্যাপে কাশী দেখে কাশীর কথা কইবেন না। ম্যাপের কাশী আর সত্যকার কাশীতে যে ঢের তফাৎ। কেমন ক'রে তাঁকে পাই?" এই ভেবে রাজা প্রজাদের, রাজপুরুষদের এবং আত্মীয় স্বজনদের সবাইকে ডাকিয়ে বললেন, "দেখ তোমরা সবাই আমাকে ভালবাস সে আমি জানি।

তোমরা আমার একটি কাজ ক'রে দাও। আমাকে একজন অনাসক্ত মহাপুরুষ খুঁজে দাও। তাঁকে দিনে, দুপুরে, রাত্রিতে সব সময়ে দেখ। টাকা, মেয়েমানুষ, মান এইগুলি দিয়ে দেখ তিনি এ সবে প্রলুব্ধ কিনা। তিনি গেরুয়া পরেন, কি না পরেন, বাড়ীতে থাকেন না বনে থাকেন, এতে আমার দরকার নেই। তাঁর পিছনে গুপ্তচর লাগাও। তন্ন তন্ন করে তাঁকে বেশ ক'রে পরীক্ষা কর।" তাই হল। কিছুদিন বাদেই একজন রাজপুরুষ এসে বললেন, "পেয়েছি, মহারাজ। ইনি গাছতলার একজন সাধু। তাঁকে এখানে নিয়ে আসি?" রাজা বললেন, "সে কি কথা? তাঁকে আনবে কি? তাঁকে আমি গুরু করব যে। আমিই তাঁর কাছে যাচ্ছি।" এই ব'লে রাজা তাঁর কাছে গিয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, "প্রভু, আমাকে কৃপা করুন।" সাধু হেঁসে উত্তর দিলেন, "তুমি এ রাজ্যের রাজা। আমি এ রাজ্যের একজন ভিখারী। আমি তোমাকে কৃপা করব, এ কেমন কথা?" রাজা মনে মনে ভাবতে লাগলেন, "তাই তো রাজপুরুষেরা তো ঠিকই বলেছেন। ইনি সত্যিই তো ত্যাগী দেখতে পাচ্ছি। আমি রাজা, এ রাজ্যে আমার মান সব থেকে বেশী। আমার গুরু হলে এঁর মান তার থেকেও বেশী হবে। সে মান ইনি প্রত্যাখ্যান করছেন। আবার এঁকে গুরু করলে, এঁকে রাজোচিত গুরুদক্ষিণাই তো দেব। তাতেও এঁর আকাঙ্ক্ষা নেই দেখছি।" এই ভেবে রাজা পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। বাস্তবিক রাজার মনে প্রার্থনা জেগেছে; তাই ইনি এসেছেন। কিন্তু গুরুর যেমন ত্যাগ আছে কিনা দেখা দরকার, শিষ্যেরও তেমনি আগ্রহ আছে কিনা এটি দেখা দরকার। রাজা সত্যিই আগ্রহান্বিত কিনা এই পরীক্ষা সাধু এখন সুকৌশলে করছেন। বললেন, "দেখ রাজা, যত মত তত পথ। শ্রীশ্রীভগবানকে পাবার সব পথের কথা শাস্ত্রে সুললিত ভাষায় বর্ণিত আছে। তুমি তো সেগুলি শাস্ত্র থেকেই শিখতে পার। কিন্তু যদি আমাকেই শেখাতে হয়, তবে যে পথে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে নিয়ে চলেছেন সেই পথের কথাই আমাকে বলতে হবে। সেটা আমার

জানা পথ। তাব আলো অন্ধকার উত্থান পতন সবই আমার জানা আছে। সেই পথেব কথা আমি তোমাকে বেশ ভাল ক'বে বলতে পাবি। কিন্তু দেখছ না, ঠাকুব আমাকে কি পথে নিয়ে চলেছেন? আমাকে পথে বাব কবেছেন। আমাব পথ ত্যাগের পথ। আমাব কাছে শিখলে তোমাব সব ত্যাগ হয়ে যাবে। বাজ্য ধন জন মান এসব কিছুই তোমাব থাকবে না।" এই কথাতে বাজা কিছুমাত্র ভয পেলেন না। তাঁর মন জ্বলছিল। ভাবলেন, "সব গিযেও যদি মনেব জ্বলুনি থেকে নিষ্কৃতি পাই, তবেই আমার মহালাভ।" বললেন, "প্রভু, সব যায় যাক। আপনি আমাকে শেখান।" সাধু খুব খুশী হলেন। তাঁকে উপদেশ দিয়ে বললেন, "বাবা, এতে তোমাব নিশ্চয ত্যাগ আসবে। কিন্তু তুমি পালিও না। আমাকে না জিজ্ঞাসা ক'বে কিছু ক'বো না।" বাজা বললেন, "সে কি কথা, প্রভু। তাও কি কখনও হয? আপনি গুরু, লঘু তো নন। আপনাব মতামত না নিয়ে আমি কিছুই করব না।" বাস্তবিক, এখানে সতেজ বীজ, সুকর্ষিত ভূমি। খুব শীগগীরই ফল ফলল। অল্প দিনেব মধ্যেই বাজার তীব্র বৈবাগ্য এল। আগেই বাজকার্য ভাল লাগত না; এখন আব বাজকার্য করতে পাবেন না এমন হল। উপায না পেযে বাজা গুরুদেবকে স্মরণ কবলেন। গুরুদেব এসে বললেন, "কি হচ্ছে, বাবা?" যেন কিছুই জানেন না। তা কিন্তু নয। সদ্‌গুরু মাত্রেরই আন্তর্যামিত্ব থাকেই থাকে। নাড়ী না দেখতে পারলে শুধু রোগীর কথা শুনে চিকিৎসা করা যায কি? কিন্তু তাঁর এ বিভূতি তিনি গোপন বাখেন। কারণ এটি দেখিয়ে শিষ্যের কাছ থেকে মান পাবার তো আব তাঁব দবকাব নেই,—কেবল শিষ্যের কল্যাণেব জন্যই তাঁকে এটি ব্যবহার কবতে হয়। তখন গুরুদেব আব বাজাতে এই বকম কথাবার্তা হল :—

বাজা। আমি যে আব পাবি নে, বাবা।

গুরু। কী পার না?

রাজা। রাজ্য পারি না।

গুরু। তুমি রাজা। রাজ্য না পাবলে চলবে কি ক'বে?

রাজা। পারছি না তা কি করব বলুন। ভাবছি কোনও যোগ্য লোককে রাজ্যের ভার দিয়ে চ'লে যাব।

গুরু। যোগ্য লোক পেয়েছ?

রাজা। ভাবছি মন্ত্রীকেই দিয়ে যাব। মন্ত্রী অনেকদিন এ রাজ্যে রয়েছেন। মাঝে মাঝে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন বটে। কিন্তু তিনি যা পারেন তাই করবেন। প্রজাদের, রাজপুরুষদের, আত্মীয় স্বজনদের তিনিই দেখবেন।

গুরু। তাঁর থেকে যোগ্যতর কাউকে পেলে না?

রাজা। কই আর পাই? পেলে তো তাঁকেই দিতাম।

গুরু। (সহাস্যে) আচ্ছা, বাবা, আমাকে তোমার যোগ্য বলে মনে হয়?

রাজা। নিশ্চয়! আপনি যোগ্যতম। আপনি যে আমার গুরু।

গুরু। তা, বাবা, তুমি তো যোগ্য লোককেই রাজ্যটা দেবে বলছ। আমাকে রাজত্বটা দেবে?

রাজা। (আর্দ্রস্বরে) বাবা, আমি জ্ঞানহীন, বুদ্ধিহীন। আপনার কাছে আসবার আগে আমি কিছুই জানতাম না, কিছুই বুঝতাম না। আমি আগে ভাবতাম যে মাটিতে মাথা ঠেকালেই নমস্কার করা হয়। আপনিই আমাকে শিখিয়েছেন 'নম' মানে 'ন মম'; আমার কিছু নয় এই ধারণা করাই নমস্কার। বাবা, আপনি আদর ক'রে শিখিয়েছেন, সে শেখান কি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে? আমি কি একদিনও, একটি বারও আপনাকে নম করি নি? একটিবারও কি আমার মনে হয়নি এসব আমার নয়, আপনার?

গুরু। (স্নেহভরে) হাঁ, বাবা, সে আমি জানি। আমিই কি অপর কারু কাছে সামান্যও কিছু চেয়েছি? তুমি দিয়েছ, সে আমি জানি, তাই চাইছি। তবে বাবা সেটি ভিতরে ভিতরে হয়েছে। এইবারে বাইরে বাইরে হ'ক।

এর পরে গুরুদেব রাজাকে তিনবার বলালেন, "রাজত্বটা আপনাকে

দিলাম।" গুরুদেবও হাত পেতে নিয়ে তিনবার স্বীকার করলেন, "রাজত্বটা আমি নিলাম।" এই রকম দেওয়া নেওয়া হলে, গুরুদেব রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবা, তোমার কিছু আছে ?" রাজা নিজের মনের দিকে চাইলেন। দেখলেন কিছুই নাই। রাজত্ব নাই, প্রজা নাই, রাজপুরুষ নাই, আত্মীয় স্বজন নাই। রাজা পরিপূর্ণস্বরে উত্তর দিলেন, "না বাবা, কিছুই নাই।"

গুরু। (সহাস্যে) কিছুই নাই তো খাবে কি ক'রে ?

রাজা। কিছুই যেমন নাই, দায়িত্বও তেমনি নাই। একটা পেট, কোনও রকমে চ'লে যাবে। হয় গাছের ফলটল পাড়ব, না হয় ভিক্ষে শিক্ষে করব।

গুরু। তুমি রাজার ছেলে তোমার কত সদ্‌গুণ আছে। তুমি ভিক্ষে করবে ? চাকরি করলে হয় না ?

রাজা। আপনার যদি তাই অনুমতি হয়, তবে চাকরিই করব।

গুরু। হ্যাঁ, বাবা, তুমি চাকরিই কর। কার আর চাকরি করবে ? আমারই চাকরি কর। রাজত্বটা আমার জান তো। এই রাজত্বটা আমি তোমায় চালাতে দিচ্ছি। যেমন ভাবে আমার রাজ্য ভাল চলে তাই-ই কর। যদি ছেঁড়া কাপড় পরলে তোমায় সকলে না মানে, যদি আমার রাজত্ব ভাল না চলে তবে তোমাকে রাজোচিত পোষাক পরিচ্ছদ আড়ম্বরাদি সবই করতে হবে। মোট কথা আমার রাজত্বটা ভাল ভাবে চলা চাই।

এ কথা ব'লে গুরুদেব চ'লে গেলেন। রাজা আগেও রাজত্ব করছিলেন, এখনও রাজত্ব করতে লাগলেন। তফাৎ হল মনে। আগে নিজের রাজত্ব নিজে চালাচ্ছেন ভেবে জ্বলে মরছিলেন। এখন আর তা নয়। এখন তিনি মনে প্রাণে বুঝেছেন যে এটি তাঁর গুরুর রাজত্ব। তিনি কর্মচারী মাত্র। বাইরে থেকে রাজাকে ঘোরতর বিষয়ী ব'লে মনে হল। কারণ আগে কোনও দিন মাথা ধরলে মন্ত্রীদেরই চালিয়ে নিতে বলতেন, নিজে আর সভায় বসতেন না, এখন কিন্তু সে রকম আর করেন না। তাঁর একান্ত প্রিয়তমের রাজত্ব,

তিনি কি অবহেলা করতে পারেন ? কর্মযোগের এই রহস্য। নিষ্কাম কর্ম কর্মসন্ন্যাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

শিষ্য। বাবা, এ ঘটনাটি ঐতিহাসিক। ছত্রপতি শিবাজী এবং তাঁর গুরু রামদাস সম্বন্ধেও এই রকমের আখ্যায়িকা আছে। কিন্তু তার ভিতরে যে এত রহস্য আছে, এ কথা আগে কখনও ভাবিইনি, জানা তো দূরের কথা।

সমর্পণ যোগ

গুরু। হাঁ বাবা, সমর্পণ যোগের মহিমা অদ্ভুত। তোমাকে তো একদিন বলেছি যে ভক্তপ্রবর গিরিশবাবুর সঙ্গে আমার বেশ আলাপ ছিল। কতদিন আমার গুরুদেব তাঁর খবর নেবার জন্যে আমাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতেন। গিরিশবাবু যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা কইতেন, তাঁর প্রকাণ্ড চোখ দুটি টক্‌টকে লাল হত। চোখের জলে বুক ভেসে যেত। কতদিন তো থিয়েটারেই যেতে পারতেন না। একদিন তিনি আমাকে বলেছিলেন, "দেখ, শ্রীশ্রীঠাকুর আমার পাঁচসিকে পাঁচ আনা বিশ্বাসের কথা বলেছেন। সে কথা কেতাবে উঠে গিয়েছে। কিন্তু তোমাকে আমি বলছি যারই কিছু হয়েছে, তাকেই surrender (আত্মসমর্পণ বা বকলমা দান) করতে হয়েছে। এই surrender সকলকেই করতে হয়েছে। surrender ছাড়া কারু কিছু হয় নি।" গিরিশবাবুর কথা, এতে কি আর ভুল থাকতে পারে ?

শিষ্য। বাবা, এ সমর্পণ কি সহজ কথা ? সব আমার নিজের দেখছি, আর বলব আমার নয় ? এও কি কখনও হয় ?

গুরু। সত্যিই কি তোমার নিজের ? কতখানি অধিকার আছে ? আচ্ছা, একটু বিচার কর। ধর তোমার স্ত্রী। বিবাহের পূর্বে তুমিও তাঁকে চিনতে না, তিনিও তোমাকে জানতেন না। বিবাহের সময়ে পুরুতঠাকুর তাঁকে তোমার বাঁ দিকে বসিয়ে তাঁর মাথায় গোটাকত ফুল ফেললেন, তোমার মাথায় গোটাকত ফুল ফেললেন। মন্ত্রও উচ্চারণ করলেন। কিন্তু "লুচি চাই, সন্দেশ চাই"

এই সব নানা চীৎকারে কতক মন্ত্র শুনতে পেলে কতক বা পেলেই না। যা শুনলে কিছু বললে। সব বলাও হল না। তোমার স্ত্রী সংস্কৃত জানেন না। যা হ'ক বিয়ে হয়ে গেল। তুমি জান স্বামী হলে কি করতে হয়; সেই সংস্কার লাগালে, তিনিও স্ত্রীর সংস্কার লাগাতে লাগলেন। কিছুদিন বাদে যিনি আগে তোমার সম্পূর্ণ অপরিচিতা ছিলেন তাঁর কাছে অপর কোনও পুরুষ মানুষকে দেখলে তুমি বোধ হয় তার মাথা কেটে ফেলবে, তিনি এত বেশী আপনার হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু সত্যিই কি তিনি তোমার আপনার? তাঁর স্বামী তুমি, কিন্তু তাঁর উপরে তোমার অধিকার কতটুকু? তিনি মরে গেলে তুমি ধ'রে রাখতে পার? বেশী কথা কি তাঁর মন যদি অন্য দিকে যায়, তুমি ফেরাতে পার? তিনি সত্যি তোমার নন। তিনি তোমার, এই ধারণাই মিথ্যা। আচ্ছা, মিথ্যাকে সত্যি ব'লে দাঁড় করাবার শক্তি তোমার আছে, আর সত্যিকে সত্যি ব'লে দাঁড় করাবার শক্তি তোমার নাই? মিথ্যাকে সত্যি দাঁড় করানর জন্য বহু অভ্যাসের প্রয়োজন। সত্য তো নিজেই সুপ্রতিষ্ঠিত।

সংস্কার কাটানর প্রক্রিয়া

শিষ্য। বাবা, আপনার যুক্তি ঠিক; কিন্তু সংস্কার ভুল বলেই কি সংস্কার কাটান যায়?

গুরু। যায় বই কি। ধর, বাটিতে রসুনের গন্ধ হয়েছে। কিছুতেই যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে বাটিটার ধাতুর মধ্যে রসুন ঢুকে গিয়েছে। কিন্তু তাই কি? একটু জোর ক'রে রগড়াতে হবে। তা হলেই গন্ধ যাবে।

শিষ্য। বাবা, আপনিই তো একটু আগে বলেছেন যে, এখন আমরা যে অবস্থাতে আছি তাতে পূর্ব জন্মার্জিত সংস্কারও অস্বীকার করা যায় না। তার উপায় কি?

গুরু। তাও কাটান যায় বই কি। তুমি বলতে পার যে ল্যাংড়া আমের বিচি থেকে ল্যাংড়া আম হবে, বোম্বাই আমের বিচি থেকে

বোম্বাই আম হবে, আর ট'কো, যোযানের গন্ধ, আঁশে ভরা জংলি আমের বিচি থেকে ঐ রকম জংলি আমই হবে। কিন্তু তার কি অন্যথা নাই? জংলি আমের চারাটি যদি ন্যাংড়া আমের সঙ্গে জোড় কলম করা যায়, তবে তাতে ন্যাংড়া আমই ফলবে। ন্যাংড়ার বিচি থেকে গাছ করলে ফলতে দেরী হত, ফলও ছোট ছোট হত। কলমের চারাতে কিন্তু শীগগীরই ফল ধরবে, আর ফলও বেশ বড় বড় হবে। জোড় কলমের ব্যাপারটা কি? জংলি আমটার ডাল ন্যাংড়া আমের একটা ডালের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। পরে জংলি আমের গাছের মাথাটা একেবারে কেটে দেওয়া হল; ন্যাংড়া আমের ডালটাই তার মাথা হল। অর্থাৎ কিনা তার নিজের বিচার বুদ্ধি আর রইল না; তার সর্বার্পণ হল।

শিষ্য। যদি এতই সহজ তবে হয় না কেন, বাবা?

ভাবের ঘরে চুরি

গুরু। কারণ ফাঁকি থাকে যে। আমার গুরুদেব আমাকে এ বিষয়ে একটি মজার গল্প বলেছিলেন। আহা, বুড়ো মানুষ, একটু ক্লান্তি নেই, একটু অবসাদ নেই। দিনের পর দিন রাত ভোর কথা কইছেন। একটুও ঝিমনো নেই। আমাকে জাগিয়ে রাখবার জন্য কত হাঁসির গল্পই না করতেন। গল্পটি এই। একজন ভদ্রলোক খেতে বসে চাকরকে দই আনতে বললেন। চাকর পয়সা চাওয়াতে তিনি বললেন, "ওরে ব্যাটা, পয়সা হলে তো সবাই দই আনতে পারে। তবে তোকে বলেছি কেন?" চাকরটিও তোযের। একটু বাদেই শুধু হাতে ফিরে এল। ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করলেন, "কই রে, দই কই?" চাকর উত্তর দিলে, "পয়সার দই হলে তো সবাই খেতে পারে। বিনি পয়সার দই হলে যিনি খেতে পারেন তাঁকেই বলি বাহাদুর।" বাস্তবিক, "উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ," এতে কি আর সমর্পণ হয়! হাতে হাতে সমর্পণ চাই।

শিষ্য। নিজেকে অকর্তা ভাবার চেষ্টা যে একেবারেই করি নি,

এমন নয়, বাবা। কিন্তু সমর্পণে ফাঁকি নিশ্চয়ই থাকে, তাই কর্তৃত্বের ঠাটটাও বেশ বজায় থাকে।

কর্তা, কর্তা

গুরু। বাবা, তুমি আমাকে বেশ কথা মনে করিয়ে দিলে। শোন বাবা, একটি গল্প বলি শোন। কর্তা গিন্নী ছুটিতে থাকতেন। ত্রিসংসারে কেউ নেই। কিন্তু তাঁরা দুজনেই ভারি কৃপণ। কর্তা সুদের ব্যবসা করেন; গহনা টহনা বন্ধক রাখেন। কিন্তু অতি সামান্যভাবে বাঁচা বাড়ীতে থাকেন। অনেকেই ভাবে যে তাঁরা বুঝি খুব গরীব। কিন্তু দুচার জন জানে যে মাটির মেজেতে বড় বড় লোহার সিন্দুক পোঁতা আছে। একটি ছিঁচকে চোর ঘটি বাটি চুরি করবার মতলব করেছে। ভাবলে, "সিঁধ কাটবার কষ্ট আর করি কেন? যখন কর্তা গিন্নী রাত্রিবেলা রান্নাঘরে খেতে আসবে তখন সুট্ ক'রে শোবার ঘরে ঢুকে মটকার তলাকার উঁচু মাচাটার উপরে বসে থাকব। যেই ওরা ঘুমুবে তখন নেমে জিনিস পত্র সরাব।" চোরটি তাই করেছে। কিন্তু দৈবাৎ সেইদিনই একদল ডাকাত ওদের প্রকৃত অবস্থা জানতে পেরে মশাল জ্বেলে শড়কি বর্শা লাঠি সব নিয়ে ঐ বাড়ীতে হানা দিয়েছে। ব্যাপার কি জানবার জন্য চোরটি মাচা থেকে একটু উঁকি দিয়েছে। কর্তা তাকে দেখতে পান নি, গিন্নী দেখেছেন। তখনই তাঁর মাথায় মতলব গজিয়েছে। তিনি কর্তাকে বললেন, "তুমি সিন্দুকের চাবি নিয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে সরে পড়। আমি সব ব্যবস্থা করছি।" কর্তা প্রথমে রাজী হলেন না। পরে গিন্নীর কথাতে বেরিয়ে পড়লেন। তখনই ঘরের দরজা ভেঙ্গে ফেলে ডাকাতেরা ঘরে ঢুকে পড়ল এবং গিন্নীর উপরে তম্বি করতে লাগল। বলল, "বল্, বেটি, কর্তা কোথায় সটকেছে। সিন্দুক কোথায়? চাবি কোথায়?" গিন্নী যেন খুব ভয় পেয়ে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই উপর দিকে চাইছেন, এই অভিনয়টি করলেন। ডাকাতেরা তখনই চোরটার চুলের মুঠি ধ'রে তাকে মাচা থেকে নামিয়ে বেদম মার আরম্ভ করলে।

গিন্নী তখন কান্নার সুরে চেঁচাতে লাগলেন, "ও কর্তা, তুমি ওদের সব দিয়ে দাও। তোমার প্রাণ বাঁচাও। তুমি থাকলে আমার সব হবে।" চোর যত বলে, "আমি কর্তা নই; আমার কাছে চাবি নাই" ডাকাতেরা ততই তাকে উৎপীড়ন করতে লাগল। গিন্নী ততই চেঁচাতে লাগলেন। মারতে মারতে চোরটা মরেই গেল। ডাকাতরা বিফল মনোরথ হয়ে তখন ফিরে গেল। গিন্নী তখন কর্তাকে ডাকলেন। কর্তা বললেন, "আর এসে কি করব? তুমি তো কর্তা পেয়েছই। তার জন্যে তোমার কত বিলাপই না শুনলাম।" গিন্নী তখন চোরটাকে দেখিয়ে বললেন, "সে কর্তা মরে পড়ে আছে ঐ দেখ।" বাস্তবিকই আমরা কর্তা নই। আমাদের বাড়ী ঘর, ধন দৌলত, স্ত্রী কিছুই নাই। কিন্তু মহামায়া আমাদের কর্তা সাজিয়ে আমাদের কেবলই মার খাওয়াচ্ছেন। এ সুবিধা কেমন ক'রে তিনি পেলেন? আমরা চোর, তাই না পেলেন? আমরা চোর কেন? সবই শ্রীভগবানের। তাঁর জিনিস বেমালুম নিজের জিনিস ব'লে নিয়েছি। তাই আমরা চোর। যদি কর্তা না হতে চাই, তবে তাঁর জিনিস তাঁকে দিয়ে চুরিটা ছাড়তে হবে।

শিষ্য। এ উপাখ্যানটি চমৎকার। মার খাচ্ছি, বেশ বুঝি। কিন্তু সেটা যে আমারই চুরির জন্য এটি বুঝতে পারি না।

গুরু। সেইটেই বুঝতে হবে। নইলে চুরি বন্ধ হবে না তো। দেখ বাবা, বিজ্ঞানের তো কতই উন্নতি হয়েছে। কিন্তু একটি ধান এ পর্যন্ত আমরা তৈরী করতে পারি নি। তাঁরই খাচ্ছি, তাঁরই রাজ্যে বাস করছি, আর বলছি আমার আমার। যে শক্তি নিয়ে অর্থোপার্জন হচ্ছে সে শক্তি কি সত্যিই আমার? এই তো এত কথা কইছি। যদি তিনি এক প্যাঁচ ঘুরিয়ে দেন, এখনই সন্ন্যাস রোগ হয়ে পড়ে যাব। সবই তাঁর। 'এগুলি আমার' বলা মানে মিছে কথা বলা। 'এগুলি আমার' ব'লে নেওয়া মানে চুরি করা। ধর্মজগতে আমরা সবাই মিথ্যাবাদী, সবাই চোর। এই মিথ্যা কথা, এই চুরির জন্যই তো আমাদের এত জ্বলুনি। তাঁর জিনিস তাঁর না বলা পর্যন্ত, তাঁর জিনিস

তাঁকে না দেওয়া পর্যন্ত, এ মিথ্যা থেকে, এ চুরি থেকে অব্যাহতি নাই। এখানকাব হিসাবে আমবা সত্যবাদী ও সাধু হতে পাবি, কিন্তু ওখানকাব হিসাবে আমবা মিথ্যাবাদী ও চোব থাকবই।

সমর্পণ নয় প্রত্যর্পণ

বাস্তবিক পক্ষে সমর্পণ তো নযই, এ প্রত্যর্পণ। তাঁর জিনিস তাঁকে দেওয়া। এ যদি না করি, তবে যে আমবা বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু তিনি ক্ষমাসার, তিনি আমাদের দোষ না ধ'রে আমাদের খাইয়ে দাইয়ে বাঁচিয়ে বেখেছেন। আর আমবা তাঁর ক্ষমার সুবিধা নিয়ে ভাবছি এ আব এমন কী অন্যায় হচ্ছে। আব সবাইও তো এই রকমই কবছে। কিন্তু ভেবে দেখতে হয় আর সবাই কি এই ক'রে সুখে আছে? যদি থাকে, তবে আমরাও অবশ্য ঐ বকম কবতে পারি। কিন্তু তাতো নয। কে সুখে অছে বল? বাজা বাজ্য নিয়েই কি সুখী? তাবা যে কাজ ক'বে অসুখী হযেছে, আমরা সেই কাজ ক'বে সুখী হব কেমন ক'রে? যদি সুখী হতে চাই, আমাদেব অন্য পথে চলতে হবেই হবে।

শিষ্য। আপনাব যুক্তি ঠিক, কিন্তু আমাদের জীবনে এ যুক্তির সত্যতা কেমন ক'রে প্রতিফলিত হবে?

প্রত্যর্পণ আংশিক হলেও ফল আছে তবু পারি না

গুরু। আচ্ছা, বাবা, একটা দৃষ্টান্ত দিই। হালখাতার দিন খরিদ্দারেরা দোকানদারকে টাকা দেয়। শুধু শুধু দেয় না, দোকানদারের যেটি প্রাপ্য, এবং খরিদ্দারেব যেটি দেনা তাই দেয়। হয়ত বা কেউ সবটা দিতে পাবল না। তবু সে তাব দেনাটা স্বীকাব ক'বে অন্ততঃ আংশিক ভাবে পরিশোধের চেষ্টা করলে। দোকানদাব প্রাপ্য টাকার কিছুটা পেয়েও মহাখুশী। খরিদ্দারদের এক এক চাঙ্গারি খাবার দিচ্ছে। এটা তাদেব ফাউ। শ্রীভগবান আমাদের সঙ্গে ব্যবসা কবতে বসেন নি। তাঁর জিনিস তাঁকে দিলে তিনি কি আর সামান্য

খাবার দেবেন? তিনি অমৃত দেবেন। তাতে ক'রে মৃত্যুর রহস্য ভেদ হয়ে যাবে। শুধু মৃত্যুর কেন, জীবনের রহস্যও বোঝা যাবে। আমাদের ভয় করে। ভাবি যদি ফস্কে যায়। যদি দিয়ে না পাই। হাতের পাঁচটা ছাড়তে ইচ্ছে হয় না। কিন্তু হাতের পাঁচটা রাখতে গিয়ে সব যে যাচ্ছে। শ্রীভগবানকে না দিই, মৃত্যুকে দিতে তো হচ্ছেই। চুল পাকছে, দাঁত পড়ছে, চোখের, কানের শক্তি কমে আসছে। কারু বা ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করাই চলল না। তার আগেই, যৌবনেতেই ডাক পড়ল। এই তো অবস্থা। তবু মনকে প্রবোধ দিচ্ছি। ভাবছি আজ তো আর মরছি না, কাল যা হয় দেখা যাবে। এই কাল কাল করতে করতেই কাল এসে পড়ে যে।

"মন তোমারে চায়"

শিষ্য। বাবা, রবীন্দ্রনাথের একটি গানে আছে ঃ—

ধন জনে আছি জড়ায়ে হায়
তবু জান, মন তোমারে চায়॥
অন্তরে আছ হে অন্তর্যামী,
আমা চেয়ে আমায় জানিছ স্বামী,
সব সুখে দুখে ভুলে থাকায়
জান মম মন তোমারে চায়॥
যা আছে আমার সকলি কবে
নিজ হাতে তুমি তুলিয়া লবে।
সব ছেড়ে সব পাব তোমায়
মনে মনে মন তোমারে চায়॥

গুরু। হাঁ, সত্যি কথা। তিনিই একমাত্র চাইবার মত জিনিস। আর যদি কিছু সত্যি সত্যি পাওয়া যায়, সে কেবল তাঁকেই পাওয়া যায়। আমরা ধন জন মান চাই বটে, কিন্তু সে চাইবার মত জিনিস নয়। এবং সে পাওয়াও যায় না। এই আছে, এই নাই। যদিই বা কোন প্রার্থিত জিনিস পেলাম ততদিনে আমাদের মন হয়তো অন্য রকম হয়েছে। যার উপযুক্ত ছেলে মরেছে, তার মুখে সুখাদ্য গুঁজে

দিলেও রুচবে কি ?- জগতের জিনিস চাইলে পাওয়া যাবে কিনা তারই বা নিশ্চয় কি ? শুধু মানুষের কাছে চাওয়ার কথাই বলছি না। দেব দেবীর কাছে চাওয়ার কথাও বলছি। কালীঘাটে কত লোকেই তো মানসিক করে। সবার মানসিক কি সফল হয় ? যে পক্ষ মকদ্দমাতে জয় লাভ ক'রে সাড়ম্বরে পূজো দিলে, তার অপর পক্ষও হয়তো মানসিক করেছিল। কই, তার প্রার্থনা তো সফল হয় নি। কিন্তু যে শ্রীভগবানকেই চেয়েছে সে তাঁকে পেয়েছেই পেয়েছে। এবং সে চেয়েছে কিনা তার প্রমাণ যে, সে সমর্পণের জন্য প্রস্তুত কিনা। সমর্পণ করতে ভয় কিসের ? তিনি যে সমুদ্র, তাতে যা দেওয়া যাবে তিনি সবই ফিরিয়ে দেবেন। কিছুই রাখবেন না।

শিষ্য। আচ্ছা, বাবা, তিনি যখন কিছুই নেবেন না, তবে এই দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারটা আমাদের আগেই বুঝিয়ে দিলেই তো পারেন। তা হলে ভয় হয় না।

"দুটি ফড়িং নিজে ধরেই খাওনা মা"

গুরু। না, বাবা, তিনি নেন না সত্যিই, কিন্তু যদি তিনি নেওয়ার এই অভিনয়টাও না করেন, তবে আমাদের দেওয়াই বা হবে কেমন ক'রে ? আর দেওয়া না হলে পাবই বা কেমন ক'রে ? ভোগ দিলে তবে তো প্রসাদ হবে। আমাদের বুদ্ধি কেমন সে বিষয় একটি গল্প বলি শোন। এক জনের পেটে খুব ব্যথা হয়েছিল। মা কালীর কাছে জোড়া মোষ মানত করলে। কিছুদিন বাদেই ব্যথাটা সেরে গেল। কিন্তু মোষ বলি দেওয়ার নামটিও করে না। এক দিন রাত্রিতে মা কালী স্বপ্নে এসে বললেন, "দেখ্, তুই মোষ দিবি বলেছিলি শীগগীর দে।" লোকটি কাকুতি মিনতি ক'রে বললে, "মা, আমি ভারি গরীব। দুটি ছাগল দিলে হয় না ?" মা বললেন, "আচ্ছা, তাই দে।" লোকটি তবু দেয় না। আবার মা কালী স্বপ্নে বললেন, "তুই ছাগলও দিলি না। তোর পেটে কিন্তু আবার ব্যথা হবে।" লোকটি তখন বললে, "মা, আমি কি রকম গরীব তা তো তুমি জানই মা। তুমি তো সবই

জান, সবই বোঝ। মা, দুটি ফড়িং দিলে হয় না?" মা বললেন, "আচ্ছা তাই দে।" লোকটি তখন হাত জোড় ক'রে বলছে, "মা যখন এতটাই কৃপা করলে, আর একটুখানি কর না মা। এই তো মেলাই ফড়িং চ'রে বেড়াচ্ছে। তুমি দুটি নিজেই ধ'রে খাওনা মা।"

কালীঘাটের কুকুর

শিষ্য। হাঁ, বাবা, একি আর দেওয়া হল? দিয়েও যদি নেওয়া যায় তবুও কালীঘাটের কুকুর হতে হবে।

গুরু। হাঁ, বাবা। কিন্তু ঐ কথাটার অন্য একটা তাৎপর্য আছে। যদি আমরা সব জিনিসের সম্বন্ধে আমাদের বিচার বুদ্ধি লাগিয়ে মানে করার বিফল চেষ্টা ছেড়ে বলি, "মা, নে,—মা, তুই সব নে" তবে আমরা কালীঘাটের কুকুর হব, মায়ের পায়ের কাছে কাছেই থাকতে পার। তাঁতে নিবেদিত রক্তই শুধু খাব। আর কি হবে? রাস্তার কুকুর যে দেখে সেই মারে। আমরা মায়ের কুকুর, তাঁর আশ্রিত, আমাদের গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না। আর আমরা যদি মায়ের কুকুর হই, তবে মা যে বেশেই আসুন না কেন আমরা তাঁকে ঠিক চিনে ফেলতে পারব। তিনি যখন কালীঘাটে বসে বসে ভোগ খান, তখন তো তাঁকে চিনবই। কিন্তু তিনি যখন বারান্দাতে বেশ্যা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন তখনও তাঁকে চিনব। তাঁর দিকে ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে চেয়ে স্তব করব, বলব, "মা, জগতের যত লম্পটদের হাত থেকে কুলনারীদের বাঁচাবার জন্যে তুমি নিজে সব সহ্য করছ। তুমি সর্বংসহা।"

শিষ্য। বাবা, বাবা, আপনি এমন ক'রে বলবেন না। এ আমি সইতে পারি নে। এসব শুনলেও মনে হয় যে মাকে দেখবার মহিমা কী,—ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে দেখবার তো কথাই নাই।

তুমি আমার নিজ জন

গুরু। না বাবা, তা কেন? আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তান। আমাদের জন্যেই তো তিনি এসেছেন। আমাদের এই সব বোঝাবেন

আমাদের এই সব দেখাবেন এই জন্যেই তো এসেছেন। দেখ না শ্রীশ্রীঠাকুরের কেমন ঊর্ধ্বদৃষ্টি। মাতালে মদ খেয়ে আনন্দ করছে আব তিনি তাতে ব্রহ্মানন্দেব আভাস পাচ্ছেন।

শিষ্য। আমাব মনে হয যে এসব ধাবণা আমার কখনই হবে না। এ যে আমার কল্পনাবও অতীত, বাবা।

গুরু। বাবা, আমি তো তোমাকে বলেছি যে আমবা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিজ জন। দেখ না, যখন তিনি অর্জুনকে শাস্ত্রবিহিত যুক্তিপূর্ণ কথা সব বলেছেন, তখন অর্জুনকে "মহাবাহু," "পবন্তপ", "গুড়াকেশ", "সব্যসাচী" এইসব ব'লে ডেকেছেন। সেখানে অর্জুনেব যোগ্যতাব উপরেই জোর দিয়েছেন। কিন্তু যখন যুক্তি বিচাবেব পারে তাঁর প্রাণের কথা সব বলেছেন, তখন অর্জুনকে আদব ক'রে "কৌন্তেয" ব'লে ডেকেছেন। অর্থাৎ "তুমি আমাব আপন পিসিমা কুন্তির ছেলে। তুমি আমার নিজ জন। তোমার জন্যই আমার এই বিশেষ ব্যবস্থা। অপরেব জন্য অন্য ব্যবস্থা।"

শিষ্য। বাবা, এসব কথা আগে কখনও ভাবি নাই তো। কতবারই তো গীতা পড়েছি।

সমর্পণের মহিমা

গুরু। বাবা, একটু মনোযোগ দিযে পড়লে সবই বুঝতে পাববে। অর্জুন জিজ্ঞাসা কবছেন না কি যে ভাল কাজ করতে চেষ্টা ক'রে যদি বিফল হই? শ্রীভগবান তখন তাঁকে "তাত" ব'লে ডেকে সস্নেহে বোঝাচ্ছেন যে, কল্যাণকৃতেব কখনও দুষ্কৃতি হয না। আমরা শুধু চেষ্টা করতে পাবি মাত্র,—সফলতা বিফলতা তো তাঁরই হাতে। সমর্পণ হলে সফলতা বিফলতা ব'লে আলাদা কিছু থাকে না। ধর, তুমি সেলাই কবছ। খানিকটা সেলাই হল, খানিক বা হল না। দুটোই এক সঙ্গে মুড়ে তুলে বেখে দিলে। সেলাই করা আর না-সেলাই করা তখন এক হল না কি? শুধু আমাদের দিকটাই দেখব কেন? তাঁব দিকটাও দেখব বই কি। এটাও তো সত্যি কথা, যে পর্যন্ত

আমরা তাঁতে সমর্পিত না হই, তিনিও যে অপূর্ণ থাকেন। তাই না তাঁর দেওয়াবার এত তাগিদ।

শিষ্য। হাঁ, বাবা, এইই আমার একমাত্র ভরসা। তাই তো প্রার্থনা করি, যে মন নিয়ে সমর্পণ করা যায় সেই মন আমাকে দিন। যে ভাবে কর্মের বন্ধন এড়ান যায়, সেই ভাব আমার প্রাণে জাগান। প্রার্থনা ছাড়া আমার আর কি সম্বল আছে বলুন। এইটি অন্ততঃ যেন ঠিক ভাবে করতে পারি, আমাকে সেই আশীর্বাদ করুন, বাবা।

গুরু। আশীর্বাদ করবার লোক একজন মাত্র,—তিনিই। বাবা, তুমি সেই পুরনো গান জান না ?

"এই যে ছয় জন বাইছেন দাঁড়,
তাঁরা আহাম্মকের ধাড়ি।
আমি জানতাম যারে পাকা মাঝি
দেখছি সে বেটাও আনাড়ি॥
কোত্থেকে কে বলছে ডেকে
আমায় লক্ষ্য করি।
'তুই থাকনা কেন নায়ে বসে,
পারের ভার আমারি'॥"

শিষ্য। হাঁ, বাবা, শুনেছিলাম। মনের নির্দেশে রিপুর চালনাতে জীবন-তরণী বিপথে চলেছিল। শ্রীভগবানে নির্ভর করলে, ভাবনা কিসের ?

গুরু। হাঁ, বাবা, সমর্পণের ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়। যেই সমর্পণ হল অমনি নির্ভরতা এল। সর্ব পাপ থেকে মুক্তি লাভ হল। সমস্ত শোক দূরীভূত হল।

শিষ্য। এ কথা পড়ে সুখ, শুনে সুখ, ভেবেও সুখ। কবেই যে আমার এ অবস্থা হবে!

গুরু। আবার একটি পুরনো গান মনে পড়ছে, বাবা।

"নিষ্ফল নির্বিকার ধর্মটি
নিষ্ফল পাপশূন্য হলে তারে পাবার ভাবনা কি ?"

শিষ্য। বাবা, আমার যে সদাই ভাবনা। কেমন ক'রেই যে নিষ্কাম, নির্মল হব।

গুরু। বাবা, তুমি কেবলই আমাকে গানের কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছ। সহজিয়াদের গানে আছে—

"মানুষ ধরা যায় কি গো সামান্যে সই
এবার জ্যান্তে না মলে।"

মানুষ কি? না, মন হুঁষ, যাঁর আত্মচৈতন্য জাগ্রত হয়েছে। জ্যান্তে মরা কি? তাঁতে সব সমর্পণ ক'রে আমরা সংসার সম্বন্ধে মৃত হব। এই কিন্তু শেষ নয়। আবার তাঁর কাছ থেকে সব ফিরে পেয়ে জীবিত হব। জীবন্মৃত অবস্থা হবে।

জ্ঞান ভক্তি আলাদা নয়

শিষ্য। আমি মনে করতাম যে এ সব জ্ঞানের কথা। এখন দেখছি এও যে ভক্তিরই কথা।

গুরু। জ্ঞান, ভক্তি আলাদা নয় তো। অকর্তা বোধও যা, সমর্পণ আস্বাদন করাও তাই। শ্রীরাধা বলছেন,—

"শিশুকাল হইতে শ্যামের সহিতে
পরাণে পরাণে লেহা।
কি জানি কি ছলে কো বিধি গড়ল
ভিন ভিন করি দেহা॥"

একে জ্ঞান বল, জ্ঞান। ভক্তি বল, ভক্তি। যখন শ্রীরাধা শ্রীশ্রীঠাকুরের বাঁশীর সুরে অস্থির হয়ে বলছেন,—

"তোমার বাঁশীর ফুটো বন্ধ করে দোব"

তখন ভক্তের মানের পরাকাষ্ঠা আবার জ্ঞানেরও পরাকাষ্ঠা। বাঁশীর ফুটো বন্ধ ক'রে দিলে একটা সুরই বাজবে। নির্বিকার ব্রহ্মই থাকবে, লীলা থাকবে না। এতে কি মনে হয় না যে ভক্ত এখানে সমাধিতে নিমগ্ন হয়ে থাকতে চাইছেন? আবার বলছেন,

"আমার আমি শ্যামে দিছি
আমার বলতে আর কিছু নাই।"

শিষ্য। বাবা, এ সব গান শুনলে আমার প্রাণটা কর্ কর্ করে। ভাবি যে, এর একটি কথাও আমি বলতে পারি না। আমার কেবলই মনে হয় যে আমার তো এ ভক্তি নাই,—এ সব আমার কাছে কথার কথা মাত্র। ভক্তদের কত প্রেম, কত বৈরাগ্য। আমার কী আছে?

সমর্পণ হলে সব সার্থক, নইলে সব নিরর্থক

গুরু। শোন, বাবা, দলিলের সবচেয়ে দরকারী জিনিসটা কি? স্ট্যাম্প করা কাগজ? না ভাল মুসাবিদা? না ভাল হস্তাক্ষর? এ সবই ভাল হয়েও যদি দলিলে সই না হয়, তবে এ সবের মূল্য কি? সইটাই আসল। সমর্পণ হলে যা আছে, তাই সার্থক। না হলে সব কিছুই নিরর্থক। সমর্পণের মহিমাই এই। একটা ঢিল ছুঁড়লে সে ঢিলটা ফিরে আসে এইই সচরাচর দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তুমি তো অঙ্ক শিখেছ; তুমি তো জান যে যার খুব ঊর্ধ্বে দৃষ্টি সে এত জোরে ঢিলটি ছোঁড়ে, যে সেটি আর ফিরে আসে না। অন্য জ্যোতিষ্কের মতন সেও পৃথিবীর চারদিকে উপগ্রহ হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কখনও কক্ষচ্যুত হয় না। তার নিষ্ঠা অটুট থাকে। সে গিয়েও যায় না। চ'লেও চলে না। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, "বিসর্গ হও। যাঁর আশ্রয়ে তুমি রয়েছ তাঁতেই তুমি মিশে থাক। তাঁর উচ্চারণেই তোমার উচ্চারণ হ'ক। তোমার আবার পৃথক্ অস্তিত্ব কি?"

শিষ্য। আমার কি সে ভাগ্য হবে?

গুরু। না হবে কেন? সাগরে নুন দিলেই বুঝি নুন হয়? আর সাগরে কেরোসিন দিলে নুন হয় না? খানার জলই হ'ক আর গঙ্গাজলই হ'ক, সমুদ্র সমানভাবে দুই-ই গ্রহণ করে, উভয়কে একই অবস্থাতে পরিণত করে। মুণ্ডক কি বলছেন।

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥" (মুণ্ডক ৩।২।৮)

যেমন প্রবাহিনী নদী নামরূপ ছেড়ে সমুদ্রের সঙ্গে এক হয়ে মিশে যায়, তেমনি ব্রহ্মবিদ্ নামরূপ থেকে বিমুক্ত হয়ে সেই দিব্য, পরাৎপর

পরম পুরুষকেই পেয়ে থাকেন। সমর্পণ হলে নামরূপ আর থাকবে কি ক'রে? নদী সাবলীল গতিতে সমুদ্রের দিকে ছুটে চলেছে আর সমুদ্র গভীর নির্ঘোষে তাকে আহ্বান করছে, বিচিত্র তরঙ্গ ভঙ্গ সহকারে প্রত্যুদ্গমন করছে,—এ ভাবতেও পুলক লাগে। সমর্পণের মহিমা কীর্তন করবার মতন ভাষা আজও সৃষ্টি হয় নি। উপনিষদের যুগ থেকে চেষ্টা চলেছে বটে।

শিষ্য। দুইয়েরই কি স্বচ্ছন্দ ভাব! নদীও জানে যে সে সমুদ্রেরই। সমুদ্রের জলই বাষ্প হয়ে তাকে সৃষ্টি করেছে। তাই সে স্ফূর্তি ক'রে সমুদ্রের দিকে চলেছে। আর আমাদের সমর্পণ পঞ্চাশবার আগু পাছু ভেবে, কেঁদে ককিয়ে; তবুও দিতে চাই না।

সর্বস্ব দিয়েও মনে হয় কিছুই দেওয়া হল না

গুরু। কাতরতা কেন বাবা? ঠাকুরকে চাইছ, এ যে শুধুই মজা। সবটাই মজার ব্যাপার। শোন বাবা, একটি মজার গল্প বলি শোন। একজন বামুন ঠাকুর শ্রাদ্ধে একটি গাড়ু পেয়েছেন। তাঁর অবস্থা ভাল নয়। গাড়ুটি বেচবার জন্যে একজন কাঁসারির দোকানে এসেছেন। অনেক কষা মাজার পরে আট আনা দাম সাব্যস্ত হল। কাঁসারি জানে যে এটি দানের গাড়ু। যত কমে সেটি হাতাতে পারে তার সেই চেষ্টা। বামুন ঠাকুর যেই দামটা চাইলেন, অমনি কাঁসারি বললে, "থামুন, ঠাকুর। দেখি আগে ভাল ক'রে কোনও খুঁত টুত আছে কিনা।" গাড়ুটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে শুনে বলছে, "দেখুন এখানে একটি টোল রয়েছে, এর জন্যে এক আনা বাদ যাবে।" বামুন ঠাকুর বললেন, "আচ্ছা সাত আনাই দাও।" তার পরে গাড়ুর নলের মাথাটা একটু ভাঙ্গা, এখানে একটু বাং ঝাল নেই, এখানে এটা, এখানে সেটা,—কাঁসারি লম্বা ফিরিস্তি আরম্ভ করলে। বামুন ঠাকুর তখন হাত জোড় ক'রে কাঁসারিকে বললেন, "বাপু, তোমাকে গাড়ুটা যে দিতে হবে তা আমি বুঝেছি। আরও কত ধ'রে দিতে হবে সেইটে আমাকে পরিষ্কার ক'রে বল তো বাপু।" বাস্তবিক, বাবা, তাঁকে সর্বস্ব

উজাড় ক'রে দিয়েও মনে হয় কিছুই দেওয়া হল না, সমর্পণের এমনি মহিমা। সবটা দিতে হবে। কিছু বাদ রাখলে হবে না। যাদের বুচকি আগাল, তারা পেঁচি মাতাল। যারা পাকা মাতাল তারাই ধূলায় গড়াগড়ি দেবে। মদের চাট মুখের সামনে থাকলেও খাওয়ার অবস্থা থাকবে না।

শিষ্য। বাবা, আপনি এ সব অবস্থার কথা শোনাচ্ছেন, আমি শুনছি মাত্র। আর কিছুই নয় যে, বাবা।

সর্বার্পণে সর্ব প্রাপ্তি

গুরু। তা কেন? নয়ই তো হয়। শোন, বাবা, শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আর একটি উপাখ্যান শুনেছি, সেটিও শোন। একজন সাধু একজন গৃহস্থের বাড়ীতে অতিথি হয়েছেন। গৃহস্থটি খুব ভক্তি পরায়ণ। সাধুর খুব সেবা করেছে। সাধুটি খুশী হয়ে বললেন, "বাবা, তোমার কিছু চাই?" গৃহস্থ বললেন, "আমার তো সবই আছে কিছুরই অভাব নেই। তবে আমার ছেলে পুলে কিছু নেই। যদি একটি ছেলে হয় তবে বেশ হয়।" সাধু উত্তর দিলেন, "বাবা, সে তো আমার হাতে নাই। আমি শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানাব। তিনি যদি দেন, তবে হবে।" এই ব'লে সাধুটি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে গিয়ে গৃহস্থের প্রার্থনা নিবেদন করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, "না, ওর ছেলে হবে না।" সাধুটি সে কথা গৃহস্থকে জানালেন। গৃহস্থ কি আর করবেন? ম্রিয়মাণ হয়ে রইলেন। এর বছর দুই বাদে সাধুটি আবার সেই গৃহস্থের বাড়ীতে এসেছেন। এসেই দেখেন ঘরের দাওয়াতে সুন্দর একটি ফুটফুটে ছেলে। সাধুটি জিজ্ঞাসা করলেন, "ছেলেটি কার?"

গৃহস্থ। আমার।

সাধু। তোমার? হতেই পারে না। শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে বলেছেন, তোমার ছেলে হবে না। তোমার ছেলে হবে কি!

গৃহস্থ। আপনি চ'লে যাওযাব কিছুদিন বাদেই একজন সন্ন্যাসী এসেছিলেন। তাঁবই আশীর্বাদে আমার ছেলে হয়েছে। আমারই ছেলে সত্যিই। আমি পাড়ার লোকদেব ডাকি। আপনিই তাদেব জিজ্ঞাসা করুন।

সাধু। না ডাকতে হবে না।

এই কথা ব'লে গৃহস্থেব আতিথ্য না নিয়েই সাধু সটান শ্রীশ্রীঠাকুবেব কাছে হাজির হলেন এবং বললেন, "কি ঠাকুর, আপনার চেয়েও বড কিছু আছে না কি ?"

শ্রীশ্রীঠাকুব। ব্যাপাব কি ?

সাধু। আপনি বলেছিলেন যে অমুক গৃহস্থেব ছেলে হবে না। তার ছেলে হল কেমন ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুব। তুমি আমাকে কঠিন প্রশ্ন করলে। আপাততঃ আমি ক্ষুধাতে বড কাতব। আমাব ক্ষুধা শান্তি কব। তারপরে তোমাব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি।

সাধু। কি খাবেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অনেক দিন নর মাংস খাই নি। নব মাংস খেতে ইচ্ছে যাচ্ছে। এ কথা শুনে সাধুর মনেই পড়ল না যে তিনিও নর ; তাঁব মাংসেও শ্রীশ্রীঠাকুর তৃপ্ত হতে পারেন। তিনি ভাবলেন নিজেব মাংস তো যে সে দিতে রাজী হবে না। দেখি সাধুদের ওখানে যাই। যদি সেখানে কিছু ব্যবস্থা হয়। এই ভেবে যে বনে সব মুনি ঋষিবা তপস্যা কবছিলেন সেখানে গিয়ে চেঁচাতে লাগলেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরের খিদে পেয়েছে। কে তাঁব জন্য মাংস দেবে বল ?" কেউ আব কোনও কথা বলেন না। কেবল একজন সন্ন্যাসী বললেন, "কি, শ্রীশ্রীঠাকুবের খিদে পেয়েছে ? কোথাকাব মাংস চাই ? বুকের ? না হাতেব ? না মুখের ?" সাধুটি উত্তব দিলেন, "তা তো শুনে আসি নি। আচ্ছা যাই, জিজ্ঞাসা ক'বে আসি।"

সন্ন্যাসী। না, না, তুমি বললে যে শ্রীশ্রীঠাকুরেব খিদে পেয়েছে। তুমি

যাবে, আসবে, অনেক দেরী হবে। তার চেয়ে এই আমি বুক থেকে, হাত থেকে, মুখ থেকে, নানা জায়গা থেকে মাংস দিচ্ছি। যেটি তাঁর ভাল লাগে তিনি সেটিই খাবেন।

সাধু মাংস নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে উপস্থিত হলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, "এইবার তোমার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছ? যে সন্ন্যাসী তার সর্বাঙ্গ থেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে আমাকে মাংস দিয়েছে, সেই সন্ন্যাসীই গৃহস্থের জন্যে ছেলের প্রার্থনা করেছিল। যে এমনভাবে তার সবটা আমাকে দিতে পারে, তাকে অদেয়, আমার কি থাকতে পারে বল? সে যদি চাইত আমাকে স্বয়ং গৃহস্থের বাড়ীতে ছেলে হয়ে যেতে হবে, আমাকে তাই-ই করতে হত। একটি ছেলে চেয়েছে। এ আর বেশী কথা কি?"

বাস্তবিক সর্বস্ব সমর্পণেই সর্বস্ব প্রাপ্তি। "যে যেমন জানে ব্যান" ব'লে সুতোর গুলি বগল দাবায় গুঁজে রাখলে তো চলবে না। দুই হাত তুলেই নাচতে হবে।

শিষ্য। হাঁ, বাবা, ঘেঁটু পূজোর মন্তরেও আছে,—

যে দেবে বাটা বাটা
তার হবে সাত বেটা।
যে দেবে বাটি বাটি
তার হবে সাত বেটি।

আমি আগে মনে করতাম এগুলি কি না কি। এখন দেখছি ঘেঁটু পূজোর মন্তরেরও মানে আছে।

গুরু। হাঁ, বাবা, সবেরই মানে আছে। সবাই বলতে শেখাচ্ছে, "মা নে; মা নে।" শিব সর্বস্ব সমর্পণ ক'রে এমন ভিখারীই হয়েছেন যে নিজের স্ত্রী অন্নপূর্ণার কাছে হাত পেতে ভিক্ষা করছেন। তাই না তিনি শিব। তাই না তিনি বিষ খেয়েও অমর। তাই না তাঁর মাথায় জটার বৈরাগ্য আর সাপের খলতা সমানভাবেই স্থান পায়। তাই না স্বয়ং কুবের তাঁর ভাণ্ডারী। বাবা, যে দিকে চাই, সে দিকেই সমর্পণের মহিমা বিঘোষিত হচ্ছে।

সমর্পণ ধ্বংস নয়, সমর্পণই সৃষ্টি, ধ্বংসই সৃষ্টি। বীজের বীজত্বের সমর্পণেই বৃক্ষের সৃষ্টি। কেবল রূপান্তর, কেবল রূপান্তর। কাঁচা পারা খেলে মহা অনর্থ; সেই পারা শোধিত হয়ে মকরধ্বজ হলে তাতে সর্বরোগের নিরাময়। শ্রীশ্রীঠাকুরের এমনি মহিমা। তাঁতে সমর্পণের এমনি মহিমা।

শিষ্য। বাবা, আর আপনাকে বকাব না আজ। কেবল আমার এই প্রার্থনাটি জানাচ্ছি যে আমার সমর্পণ যেন সুসম্পন্ন হয়। আমার জ্ঞান, আমার অজ্ঞান; আমার ভাল, আমার মন্দ, আমার কর্মফল, আমার পুরুষকার; সব যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণ কমলে উৎসর্গ করতে পারি।

—০✻০—

শ্রীগুরু

গুরুর প্রয়োজন

গুরু। বাবা, তুমি নরুবচন্দ্র কুণ্ডুর নাম শুনেছ?

শিষ্য। হাঁ, বাবা। ম্যানহোল (Manhole)-এর বিষাক্ত বাষ্প থেকে কর্পোরেশনের কুলীদের বাঁচাতে গিয়ে তিনি নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন। চক্রবেড়িয়া রোডে এই ঘটনার স্মৃতি-স্তম্ভ আছে।

গুরু। সে আমার বন্ধু। আমাদেব পাড়াতেই থাকত। বাড়ী বাড়ী থেকে মুষ্টি ভিক্ষা ক'রে চাল সংগ্রহ ক'রে দরিদ্রনারায়ণের সেবার যে ব্যবস্থা শ্রীশ্রীঠাকুর করেছিলেন, সে বিষয়ে আমাকে সে খুবই সাহায্য করত। কিন্তু তাকে বহুবার আমার গুরুদেবের কাছে যেতে বলাতেও সে যেতে চাইত না। বলত, "আমার গুরুতে কাজ নেই। গীতা পড়ব, সৎপথে থাকব, এই-ই যথেষ্ট।" আমি এ কথা আমার গুরুদেবকে জানিয়েছিলাম। তিনি আমাকে শিখিযে দিলেন, "তুই নরুবকে বলবি যে তাকে একটা সেতার, খানিকটা তার আর একটা গৎ-এর বই দেব। সে আমাকে একটা গৎ বাজিয়ে শোনাবে।" আমি পরের দিন নরুবকে এ কথা বলাতেই সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি এ কথা কোথায় পেলেন? এ কখনও আপনার কথা নয়।" আমি উত্তর দিলাম, "তা তো নয়ই। যাঁর কাছ থেকে আমি সব কথাই পেয়েছি, এ কথাটাও তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছি।" শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাটা নরুবের মনে লাগল। সেই থেকে সে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে যাওয়া সুরু করল। আর তার শেষ হল কুলীদের জন্য আত্মত্যাগে।

শিষ্য। বাবা, আমারও অনেক বন্ধু আছেন, যাঁদেরও গুরু সম্বন্ধে অদ্ভুত ধারণা।

গুরু। তাঁরা কে কী বলেন?

শিষ্য। একজন বলেন, "শ্রীভগবান আছেন, তাঁর পূজার্চনা বিধিও তো আবহমান কাল থেকে চ'লে আসছে। মাঝখান থেকে আবার একটা গুরু খাড়া করা কেন?"

গুরু। তুমি কিছু জবাব দিয়েছিলে কি?

শিষ্য। এখন হলে আপনার গুরুদেবের জবাবই দিতাম। তখন অন্য কথা বলেছিলাম।

গুরু। কি বলেছিলে, বাবা?

শিষ্য। আমি বলেছিলাম যে ডাক্তারখানাতে তো সবই ওষুধ। আমি নিজে গিয়ে ওষুধ মিশিয়ে খেলেই তো পারি, ডাক্তারের দরকার কি? আমার বন্ধুটি ডাক্তার কিনা, তাই এই কথা বলেছিলাম, বাবা।

গুরু। তোমার ডাক্তার বন্ধু কি উত্তর দিলেন?

শিষ্য। তিনি বললেন, "ডাক্তার হলে সুবিধে হয় বটে, কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে তো আর মেডিক্যাল কলেজ, এম্. বি. ডিগ্রী এ সব নাই। কি ক'রে ডাক্তারকে চেনা যাবে, পাওয়া যাবে?" আমি তখনই উত্তর দিলাম, "তবে গুরুর দরকার নেই, এ কথা নয়। গুরু পাওয়া যায় না, তুমি এই কথাই বলছ। এ দুটি কথাতে যে ঢের তফাৎ। কলকেতাতে খাঁটি দুধ দরকার নেই, এ কথা তো আর সত্যি নয়।" আমার বন্ধু হেসে বললেন, "কেন, কলকেতাতে খাঁটি দুধ পাওয়া যাবে না কেন? সব দুধের দোকানের সাইনবোর্ডেই খাঁটি দুধ লেখা আছে।" আমি উত্তর দিলাম, "ঠিক বলেছ, ভাই। শুধু একটুখানি মুশকিল। সে দুধে পেট ভরে না। পঞ্জিকাতে বিশ আড়া জল লেখা আছে। নিংড়ালে এক ফোঁটাও পাওয়া যায় না। আচ্ছা, ভাই, তুমিই বল যে প্রচলিত পূজার্চনা বিধির কী কী তুমি নিজে প্রতিপালন করেছ, আর কী কী ফল পেয়েছ?" আমার বন্ধু উত্তর দিলেন, "এখন রোগী-পত্তরের ভাবনা ভাবতেই সময়ে কুলোয় না, কখন ও সব করি বল? তোমাদের দিব্যি অবসর আছে। আমাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্থোপার্জন করতে হয়, বুঝলে?" আমি

হেসে বললাম, "তা তো বুঝেছি ; কিন্তু, ভাই, তুমি আমাকে সত্য ক'রে বল যে তুমি খেটে খেটে হয়রাণ হয়েছ ব'লে ক'টি রুগী ফিরিয়ে দিয়েছ ?" বন্ধুবর বললেন, "আরে ভাই, লাট সাহেবের গাড়ী এলে, হাজার ভীড় থাক—রাস্তা হয়ে যায়ই যায়।" আমি বললাম, "তিনি যে লাটের লাট। তাঁর জন্মে জায়গা দিতে পারি না কেন ? মনে হয় তিনি একখানা ছবি, না হয় একটা নুড়ি মাত্র। গুরু বোধ করিয়ে দেন যে তিনি লাটের লাট। এইটে গুরুর কাজ।"

গুরু আলো জ্বেলে দিলে তবে দেখা যাবে

গুরু। হাঁ, বাবা, বেশ বলেছ। তোমার অপর বন্ধুরা কে কী বলেছেন ? একবার বল তো শুনি।

শিষ্য। আর একজন, তিনি বড় ব্যবসাদার ; তিনি বললেন, "দেখ ভাই, মাঝে মাঝে স্ত্রী পুত্র নিয়ে তীর্থে যাই। অন্য সবার মত দার্জ্জিলিংএ হাওয়া খেতে যাই না। তীর্থ দর্শনে কি পুণ্য হয় না ? কত সাধু সেখানে আছেন। একজন গুরু, তিনি যত বড় সাধু হ'ন না কেন, কেবল তাঁর কাছে গিয়ে কি এত পুণ্য হতে পারে ?" আমি উত্তর দিলাম, "ভাই, তুমি কাল থেকে দোকানে বসে থাকা ছেড়ে দিও। মাঝে মাঝে তোমার সুবিধে মত এক একদিন তোমার দোকানটা ছুঁয়ে এস। তা হলেই তো তোমার ব্যবসা বেশ চলবে।" আমার বন্ধু বললেন, "তুমি কি বলতে চাও যে ব্যবসাদারি আর ধর্ম পালন এক জিনিস ?" আমি বললাম, "তা তো নয়ই। শ্রীভগবান সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তাঁকে পেলে আর কোনও জিনিসই তাঁর চেয়ে বড় মনে হয় না। সুতরাং ব্যবসাতে যদি এক আনা মন দিই, তবে তাঁর জন্মে পনর আনা মন দেওয়া উচিত। তাই করি নাকি ? আচ্ছা, ভাই, তীর্থে যাও তো বললে। কতবার সে সব কথা তোমার মনে ওঠে, বল তো ? তীর্থে যতদিন থাক, ততদিন কি ব্যবসার কথা তোমার মনে একেবারেই থাকে না ?" আমার বন্ধু তখন বললেন, "হাঁ, ভাই, তোমার কথা আমি বুঝেছি। কিন্তু তুমি কি আমাকে সব ছেড়ে ছুড়ে

কেবল 'হরি হরি' করতে বল ?" আমি উত্তর দিলাম, "তোমাকে কী করতে হবে—না হবে, সে যখন তোমার গুরু হবেন, তিনি ব'লে দেবেন। আমি শুধু এখন এইটে বোঝাতে চাইছি যে তীর্থ দর্শনে গেলে যে দেব দর্শন হবেই হবে এর কোনও মানে নেই। চোখ থাকলেই কি দেখা যায় ? আলো চাই-ই চাই। গুরু আলো জ্বেলে দিলে তবে তো দেখা যাবে।"

গুরু। হাঁ, ঠিক কথা, বাবা। তোমার বন্ধুরা তো বেশ মজার মজার কথা বলেন দেখছি। আর কে কে কী বলেছেন ?

শিষ্য। আর একজন অ্যাটর্ণী। ইনি বললেন, "দেখ, ভাই, গুরু আর বেশী কি বলবেন। পূজার্চনা করতেই তো তিনি বলবেন। তুমি তো জানই, ভাই, আমাদের বাড়ীতে পূর্বপুরুষদের আমল থেকেই পূজোর ঘটা। বার মাসে তের পার্বণ তো হচ্ছেই। আমি কোনটাই বাদ দিই নি। লক্ষ্মী পূজোই বল, আর সরস্বতী পূজোই বল, আর দুর্গা পূজোই বল, সবই তো বিধিমত হচ্ছে।" আমি উত্তর দিলাম, "পূজো হচ্ছে, সে কি আর আমি জানি না ? কিন্তু বিধিমত হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে ঠিক বলতে পারি না। ধর, যদি তোমাকে কেউ পূজো করতে চায়, তবে সে কী ভাবে পূজো করলে তোমার ভাল লাগবে ? সে যদি তোমাকে গোটাকয়েক 'সোটে কলা আর ঘোগা মণ্ডা' দেয়, সেই তোমার ভাল লাগবে ? নাকি, তুমি যে যে কাজ ভালবাস, সেই কাজগুলি সে করলেই তুমি বেশী খুশী হবে ? মা লক্ষ্মীর পূজো মানে তিনি যেটি নিজে করেন, সেটি করা। তিনি চঞ্চলা ; সব জায়গাতেই তিনি ছট্‌ফট্ করেন। কেবল নারায়ণের কাছে তিনি স্থির। যদি সত্যিকার লক্ষ্মীপূজা আমাকে করতে হয়, আমারও আর সবেতেই অসোয়াস্তি লাগবে, শুধু ভগবানের কাছে থাকলেই শান্তি পাব। এটি হয় কি ? দুর্গাপূজার সময়ে এ কাজটা হল না ও কাজটা হল না , এ এল না, সে এল না ; এই সব কথাই তো কেবল মনে হয়। তিনি জগতের মা, তিনি আমারও মা,—তিনি এসেছেন, আমার কাছেই এসেছেন, এই কথা মনে হয়ে মনটা কি

আনন্দে ভবে থাকে ? কেবলই কি ইচ্ছে করে, যাই, মায়ের কাছে একটু বসি গে, তাঁকে দুটি কথা বলি গে, তাঁর দুটি কথা শুনি গে ? ভাই, পূজো কাকে বলে, পূজো কি ক'রে, করতে হয়, এগুলিও গুরুর কাছে না শিখে নিলে কি ক'রে হবে ?”

গুরু। তুমিই তাঁকে শেখালে না কেন ?

শিষ্য। তিনি শিখতে চাইলে তবে তো শেখাব। তাঁর শেখবার ইচ্ছে হলে, আমার মতন কেন আমার চেয়ে ঢের ভাল শেখাবার লোকই তাঁর জুটে যেত।

গুরু। তোমার আর কোন্ বন্ধু কী কী বললেন ?

শিষ্য। আর একজন,—ইনি স্কুলের মাষ্টার,—ইনি বললেন, “দেখ, ভাই, এখন গুরু করণে আমার কোনও লাভ নাই। আমার মন এখন এত চঞ্চল যে তিনি যা বলবেন তা ঠিক ক'রে করতে পারব না। আগে মনটা ঠিক হ'ক তখন গুরু করণ নিশ্চযই করব।” আমি উত্তর দিলাম, “আরে ভাই, রোগ সেরে গেলে আর ডাক্তারের প্রয়োজন কি ? ভবরোগে আমাদের ধরেছে বলেই না ভব-রোগ-বিকার-বিনাশকের দরকার।” আমার মাষ্টার বন্ধুটি বললেন, “ভাই, ভবরোগ কেন বলছ ? সবারই কি আমার মত কম উপার্জন ? সবারই কি আমার মত এত বেশী অভাব ?” আমি উত্তর দিলাম, “ভাই, তোমার উপার্জন বেশী, অভাব কম, এ কথা আমি মোটেই বলতে চাই নে। কিন্তু তুমি কি এমন একজনকেও পেয়েছ, যিনি এই ব'লে তোমার কাছে কেঁদেছেন,—আমার অভাব এত কম, উপার্জন এত বেশী, আমি বেশ আছি।” আমার বন্ধু আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, “কেন, যখনই তোমার সঙ্গে দেখা হয়, তখনই তুমি বল, বেশ আছি।” আমি উত্তর দিলাম, “আমার যে গুরু লাভ হয়েছে। তোমার গুরু লাভ হলে তুমিও এই কথাই বলবে। যার গুরু লাভ হয়েছে, তাকেই এই একই কথা বলতে হবে।”

"যাঁর কথা করিয়া প্রত্যয় জগদ্গুরু করে লাভ"

গুরু। ঠিক কথা, বাবা। তোমার বন্ধুদেব যদি কারু গুরু লাভ হয় তবে তোমাকে দেখেই হবে।

শিষ্য। বাবা, আমিও তো আপনাকে দেখেই, আপনার কাছে আপনার গুরুদেবের কথা শুনেই গুরুর প্রয়োজনীয়তা বুঝেছি। কিন্তু গুরুর প্রয়োজনীয়তা বোঝা এক কথা, আর গুরু লাভ আর এক কথা।

গুরু। কথা দুটি বটে, কিন্তু জিনিস একই। পিপাসা আছে, তাই জল আছে। পিপাসার অস্তিত্বই জলের অস্তিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। আরও ভাল ক'রে বলতে গেলে বলতে হয়, পিপাসাই জল, জলই পিপাসা।

শিষ্য। আমার সব বন্ধুর কথা এখনও বলি নি, বাবা। আর একজন বন্ধু, তিনি শাস্ত্র টাস্ত্র পড়েন। "কালাপাহাড়ের" মত তিনি সাধনা মোটেই করেন নি বটে, কিন্তু "কালাপাহাড়ের" মতই তিনি বললেন ঃ—

কেবা গুরু, কোথা তাঁর স্থান ? মম সম
মানবে প্রত্যয়, হায়, কেমনে করিব ?
কেমনে জানিব বাক্য মিথ্যা নহে তাঁর !
কথায় প্রত্যয়, আর নাহি হয়, দেখে
শুনে মন নাহি মানে, ·

* * *

হায়, অন্ধ-বিশ্বাস আশ্রয়,
যুক্তিশূন্য অনুমান।
যাহে বিশ্বব্যাপী কহে,
নর কলেবরে বিরাজিত মানিব কেমনে ?
গুরু, গুরু, কেবা গুরু, কোথায় কোথায়।
কি প্রত্যয় কথায় তাঁহার ?
মম সম ক্ষুদ্র নর, আবদ্ধ এ দেহের পিঞ্জরে,—
জন্ম-মৃত্যু মাঝে,

সুখে দুখে দোলে কয় দিন,
ক্ষীণ তনু পলে পলে,
জীবনের তাপ হবে লীন,
ভবে চিহ্ন মাত্র নাহি রবে আর,
সীমা শূন্য বিস্তার—বিস্তার,
বিপুল সংসার—
লক্ষ্য শূন্য -পন্থাহারা—কাহারে বিশ্বাস।

গুরু। তুমি কি বললে ?

শিষ্য। আমি আর কি জবাব দেব ? চিন্তামণির কথারই আবৃত্তি করলাম :—

ক্ষুদ্র নর তোমা সম গুরু।
গুরু কল্প-তরু ভবে,
ভীরু জনে
অভয় প্রদানে
আবির্ভাব ধরামাঝে,
দীন নর-সাজে
সমাজে বিরাজে,
নামে হৃদি-তন্ত্রী বাজে।
চরণ-রাজীব-রাজে লইলে শরণ,
মোহের বন্ধন খোলে,
সুখ-দুখ ভোলে,
তমো বিনাশন, ভাতে নবীন নয়ন।
গুরু কৃপা যার,
তার কিবা অগোচর ?
গুরুর কৃপায়,
অনায়াসে ইষ্ট বস্তু পায়,
পূর্ণ হয় আশ,
দূরে যায় ত্রাস,
অবিশ্বাস-তম-নাশ জ্ঞানের প্রভায়।

গুরু। বাবা, গিরিশবাবুর কথা যে তোমার সব মুখস্থ দেখছি।

শিষ্য। বাবা, ঐ মুখস্থ পর্যন্তই। গ্রামোফোন তো আর গায়ক নয়। গিরিশবাবুর পাঁচসিকে পাঁচ আনা বিশ্বাসের কাছে আমার বিশ্বাস। গিরিশবাবুর এ কথাটিও চমৎকার ঃ—

*　　*　　*

সাগর লঙ্ঘিয়া পরস্পরে করে দেখা,—
প্রাণ বোঝে কোথা তার টান।
এ সন্ধান বিষয়ীর নহেক গোচর।

*　　*　　*

ঈশ্বর লইয়া তর্ক-যুক্তি করে অনুমান,
যত করে স্থির,
সন্দেহ-তিমির
ততই আচ্ছন্ন করে।
ঈশলুব্ধ প্রাণ ব্যাকুলিত জানিতে সন্ধান,
কি উপায়ে পুরাইবে
মন-আশ,
শ্রীনিবাস
তার প্রতি সদয় হইয়ে দেন মিলাইয়ে বাঞ্ছিত রতন তার।
অকস্মাৎ কোথা হতে কেবা আসে
তাঁর ভাবে হয় হৃদে আশার সঞ্চার।
বিশ্বাস বিকাশে প্রাণে,
মানে মনে জ্ঞানে,
ঈশ্বরের বাক্য বলি।
সে হয় নিমিত্ত গুরু তার,—
যাঁর কথা করিয়া প্রত্যয় জগৎগুরু করে লাভ।
এই ক্ষুদ্র নিমিত্ত এ স্থানে আমি,
বিশ্বাস ঈশ্বর-দাতা,—বাক্যরূপে তিনি বিরাজিত।

এটি তো কতবারই আবৃত্তি করেছি। কতবারই তো প্রার্থনা করেছি, এটি আমাতে স্ফুরিত হ'ক। কিন্তু তা হয় কই? আমার

কীই বা ভক্তি, কীই বা বিশ্বাস, যাতে ক'রে আমার প্রকৃত গুরুদর্শন হবে ? শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন যে, ভক্তি মেয়েমানুষ, অন্দর মহল পর্যন্ত যেতে পারে। গুরুভক্তি থাকলে তবে তো গুরুর ভিতরটাও দেখা যাবে।

গুরু। এ কাতরতা কেন, বাবা ? শোন বাবা, একটা মজার গল্প শোন। একজন গুলিখোরের গুলি ফুরিয়েছে। সে গুলির খোঁজে রাস্তায় বেরিয়েছে। কিন্তু কি ক'রে আর সবাইকে স্পষ্টাস্পষ্টি জিজ্ঞাসা করে যে তাদের কাছে গুলি আছে কিনা। তাই একটা ফন্দি করেছে। রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে দুই হাত দিয়ে সুতো পাকাবার ভঙ্গী করছে। সবাই সমান চ'লে গেল। পরে একজন এল। তার চোখ প্রায় বোজা। সে চোখ চেয়ে ভাল ক'রে দেখলেও না যে সুতো সত্যিই আছে কিনা। সুতো আছে মনে ক'রে, তার মাথাটা নীচু ক'রে সেই রাস্তা দিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে, গুলিখোর তখনই তার কাছে গিয়ে বলছে, "ভাই, মাল-টাল কিছু আছে ?" সে বললে, "আছে বই কি।" তখন দুই গুলিখোরে গলাগলি ধ'রে গুলি খেতে চলল। গুলিখোরই গুলিখোরকে চেনে। অপরে চিনতে পারবে কেন ?

অভিমান ত্যাগে পরম নির্ভরতা ও পরম শান্তি

শিষ্য। আপনার কথাতে ভয় বাড়ে বই কমে না। গুরুর কোন্ লক্ষণ আমাতে আছে, যার সাহায্যে তাঁকে চিনে ফেলতে পারব ? গুরু সম্পূর্ণরূপে আসক্তি পরিশূন্য হওয়াই চাই। মিথ্যার নিদান আসক্তি, তাঁর বেলায় একটুও থাকবে না, নতুবা তাঁকে কেমন ক'রে বিশ্বাস করা যাবে ? তাঁর আসক্তি একটুও নাই, আমার আসক্তি ষোল আনাই আছে—তাঁকে চিনবার যোগ্যতা আমার হবে কি ক'রে ?

গুরু। জান, বাবা, কুঁদ শুধু শুধু ঘুরতে পারে ; তা হলে যেমন ছিল তেমনিই থাকে। আর যদি বাটালির মুখে পড়ে, তবে আর শুধু শুধু ঘোরা হয় না। চেঁচে-ছুলে চমৎকার হয়। তার পরে আবার রং দিয়ে দিয়ে আরও কত বাহার করা হয়।

শিষ্য। বাবা, আপনার কথা আমি বুঝেছি। বলছেন যে মহাপুরুষ সংশ্রব হলে সংসারে মিছামিছি ঘোরা হবে না, আসক্তি যাবেই। বাবা, আসক্তি ত্যাগে যদি কষ্ট হয় হ'ক। তবু তো পরিষ্কার হওয়া যাবে। মিছামিছি সংসারে ঘুরে ঘুরে মরা কেন? সেই যে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, একজন রাজ্যের যত ছুতো-হাঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে বেড়াত, আর বলত, "আর পারি নে।" আবার তাই-ই করছে। কেনই বা কোমর ব্যথা করা, আর কেনই বা বলা,—কিছুই বুঝি না।

গুরু। ছেলেবেলা লাট্টু খেলেছিলে? যে লাট্টুটার আল্ চোখা সেটি বন্ বন্ ক'রে ঘুরে ঘুরে এদিকে ওদিকে চলাফেরা করে। আর যদি লাট্টুর আল না থাকে, তবে সে বেশী ঘুরতে পারে না। যিনি ঘোরাচ্ছেন, তাঁর পায়ের কাছেই গড়িয়ে পড়ে। আলটা হচ্ছে অভিমান। অতি তীক্ষ্ণ। কিন্তু কতটুকুই বা। সেটুকু ছাড়লেই পরম নির্ভরতা, পরম শান্তি।

শিষ্য। বাবা, বেশীই হ'ক আর অল্পই হ'ক, সেটি তো যাওয়া চাই-ই চাই। এ অভিমান যাবে কি ক'রে?

গুরু। গুরুর বিনয় দেখে আমাদের অভিমান লজ্জায় মাথা তুলতে পারবে না। বাস্তবিক গুরু সকল বিষয়েই গুরু। বিনয়েতেও গুরু। আমার গুরুদেবের জুতো চাটার কথা তো তোমাকে বলেছি। দেখ, বাবা, যদি একটা ঘুড়ি কাটতে হয়, তার তলা দিয়ে সুতো না চালালে সেটি কেমন ক'রে লটকান যাবে?

শিষ্য। বাবা, আপনি তো কত ভাবেই বোঝান। খেলার কথা দিয়েই তো কত বলেন। আপনার তো সবই খেলা। কিন্তু কই, বাবা, আমার আসক্তি যায় কই?

গুরু। তোমার মতলব মতন হচ্ছে না বলেই যে যাচ্ছে না, তারই বা মানে কি? কাঁচ কাটতে গিয়ে পাথর দিয়ে যদি প্রচণ্ড ঘা দিই তবে কাঁচ গুঁড়ো হয়ে যাবে মাত্র। কাটা হবে কি? কাটতে হলে হীরে চাই। সেটি কাঁচের মত দেখতে হলেও কাঁচ নয়। কাঁচের চেয়ে ঢের বেশী কঠিন। সেটি দিয়ে দাগ দিতে হয়। দাগটা খুব

স্পষ্ট নয়। তবু দাগ পড়েছেই। তখন টুক ক'রে একটু ঘা দিলে দাগ বরাবর চমৎকার কাটা হয়ে যায়। যা দিয়ে কাটা হবে তার নির্দেশ মতই কাটতে হবে, অন্যভাবে হবে কি ?

শিষ্য। বাবা, আপনার সঙ্গে আমি কোনও দিনই কথায় পারিনি। আজই বা পারব কেমন করে ?

বরবধূ—গুরুশিষ্য

গুরু। শোন, বাবা, আজ খেলার কথা হচ্ছে। আজ খেলার কথাই হ'ক। ধর, একটি খুকী পুতুল খেলছে। পুতুলের ছেলে, পুতুলের মেয়ে করেছে। বিয়ে থাওয়া, তত্ত্বতল্লা সবই হচ্ছে। সুরকীর ঘণ্ট হয়েছে। কাদার চচ্চড়ি হয়েছে। একে খেলা ছাড়া আর কি বলি বল ? কিন্তু শুধু কি খেলাই ? খুকি কি এইভাবে সংসারই সাধছে না ? মেয়ের উপমা এই জন্যে দিচ্ছি যে, যা পরিবর্ত্তনশীল, তাই-ই প্রকৃতি। ব্যাটাছেলেও প্রকৃতি, মেয়েছেলেও প্রকৃতি। শ্রীভগবানই একমাত্র পুরুষ। ঘট বা পট বা বিগ্রহের সামনে আমরা ছেলেখেলাই করি। লাটসাহেব বসে থাকলে তাঁর সামনে থেকে তাঁর বিনা অনুমতিতে উঠে যেতে পারি না। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের পায়ে গোটা কয়েক ফুল ছুঁড়ে দিয়েই মাছের চুপড়ি নিয়ে বাজার করতে যাই। একে খেলা ছাড়া কি বলব বল ? কুবের যাঁর ভাণ্ডারী, লক্ষ্মী যাঁর দাসী, তাঁকে আমরা দেবার মত কীই বা দিতে পারি ? তবু তাঁকেই সাধা হচ্ছে। সাধতে সাধতে মেয়েটি বড় হচ্ছে। তার আর পুতুল খেলা ভাল লাগছে না। সে তখন নাটক নভেল পড়ছে। পূজো করতে করতে আমাদের এমন একটা অবস্থা আসে যখন শাস্ত্র টাস্ত্র পড়তে ইচ্ছে হয়। মেয়েটির যেমন প্রণয়ের কথাই বেশী ভাল লাগে, আমাদেরও তেমনি ভক্তদের জীবনী পড়তে আকাঙ্ক্ষা হয়। কোন্ ভক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরকে কি ভাবে পেয়েছেন, কেমন ক'রে তাঁকে সম্ভোগ করেছেন, এইগুলি জানতে ইচ্ছে করে। বই পড়তে পড়তেই মেয়েটির যৌবন আসে। তার জীবন তখন তার কাছে ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে।

সে আগেও যা করেছিল, এখনও তাই করে বটে; কিন্তু তার ভাল লাগে না। আগের মতই নাটক নভেল পড়ে বটে, কিন্তু এখন ভাবে, এ তো অপরের স্বামীর কথা হচ্ছে, আমার স্বামী কই? আমাদেরও মনে হতে থাকে যে শ্রীশ্রীঠাকুর এসে তাঁর দুই একজন প্রিয় ভক্ত নিয়ে অপূর্ব লীলা করেছেন, এটি আমরা শুধু বইতে পড়ব? আর কিছুই হবে না? তবে তো তাঁর আসা আমাদের পক্ষে নিরর্থক। "ঈশলুব্ধ প্রাণ ব্যাকুলিত জানিতে সন্ধান।" ব্যাকুলতা ধর্ম জীবনের যৌবন। এখন কন্যা অরক্ষণীয়া হয়েছেন; এবার তাঁকে পাত্রস্থ করতে হবে। সুপাত্র চাই। পাত্রের কুল শীল, উপার্জন, সঙ্গী সাথী, মেজাজ,—কত কি দেখে তবে লৌকিক পাত্র নির্বাচন করতে হয়। লৌকিক পাত্র সুষ্ঠুভাবে কন্যার সংসার যাত্রা নির্বাহ করাতে পারবেন কিনা, এটা দেখে তবে কন্যাকে সম্প্রদান করতে হয়। ধর্মের ব্যাপারেও তাই দেখতে হয়, যাঁকে আমার সংশয়-ব্যাকুল সন্দেহ-কাতর মনটা সমর্পণ করব, তিনি কি আমার ভার নিতে পারবেন? তাঁর কি নিজের আসক্তি ত্যাগ হয়েছে যে তাঁর কথা শুনে আমারও আসক্তি যাবে? পাত্র নির্বাচন হল। এইবারে বিবাহ। প্রথম অনুষ্ঠান শুভদৃষ্টি। পাত্র কন্যা পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করেন। গুরু শিষ্যের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করেন; শিষ্যও গুরুকে শুভ, ইষ্ট ব'লে দেখেন। তার পরে কি হয়? যে পিতৃগৃহে এতদিন ধ'রে, পরম আদরে, পরম স্নেহে, কন্যা লালিতা পালিতা হয়েছেন, তার সঙ্গে সব সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে কন্যা স্বামীর গৃহে যাচ্ছেন। গুরুলাভের পর আমাদেরও পূর্বেকার সকল সঙ্গ পরিহার করতে হবে। এটা বুঝতে হবে যে নার্সারিতে গাছের চারা হয় বটে, কিন্তু নার্সারিতে থাকবার জন্য নয়, অন্য উদ্যানের জন্য। এটি যদি না মনে হয় তবে গুরু লাভ কথার কথা মাত্র। গুরু এ বিষয়ে কেবলই প্রেরণা দেন। বিবাহের সময়ে অপরে অনেক যৌতুক দিতে পারে। কিন্তু একটি জিনিস শুধু স্বামীই স্ত্রীকে দিতে পারেন। সেটিই তাঁর স্বামী লাভের নিদর্শন। সেটি দেখতে শুনতে বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু তার ক্ষয় ব্যয় নেই। সেটি হাতের লোহা। গুরুও "বিশ্বাস" ব'লে একটা জিনিস

শিষ্যে সঞ্চারিত করেন। বিশ্বাসী ভক্তপ্রবর গিরিশচন্দ্র বলেছেন, "তাঁর ভাবে হয় হৃদে আশার সঞ্চার, বিশ্বাস বিকাশে প্রাণে।" শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, "মানুষ গুরু মন্ত্র দেন কানে, জগৎগুরু মন্ত্র দেন প্রাণে।" বাস্তবিক প্রাণেতেই এর বিকাশ। তাই শিষ্যের প্রাণের সব বিকাশেই—শিষ্যের কথায়, কাজে, চিন্তায় এরই সাক্ষ্য তখন কেবলই পাওয়া যায়। আর কি হয়? কন্যা বিবাহের পূর্বে বাঁকা সিঁথি করতেন; মাথার চুল কোনও সময়ে এক দিকে বেশী, আবার কোনও সময়ে অন্য দিকে বেশী থাকত। বিবাহের পরে তিনি সোজা সিঁথি করেন। বাস্তবিক গুরু লাভের পূর্বে যখনই আমাদের কোনও বাসনা চরিতার্থ হয়েছে তখনই সুখ পেয়েছি; যখনই কামনা পূর্ণ হয় নি, তখনই দুঃখ পেয়েছি। কোন সময়ে সুখের ভাগ বেশী, কোনও সময়ে দুঃখের ভাগ বেশী; কোনও সময়েই অবিমিশ্র সুখ পাই নি। গুরু লাভের পরে বোঝা যায় যে সুখ দিয়ে শ্রীভগবান তাঁর দিকেই আমাকে আকর্ষণ করেন, দুঃখ দিয়ে শ্রীভগবান সংসার থেকে আমার আসক্তি কাটান। দুইয়ের ফল একই। তাই তখন সুখ দুঃখে সমজ্ঞান হয়। "সুখ-দুখ তব পদ-ধূলি বলি মাথায় তুলিয়া লব", এটি তখন আর কথার কথা থাকে না। কেমন ক'রে এটি হয়? স্বামী যেমন পরম স্নেহভরে কন্যার চিবুকটি তুলে ধ'রে পরম যত্নে, পরম আদরে, সিঁথিতে উজ্জ্বল সিঁদুর দিয়ে দেন, গুরুও তেমনি তাঁর প্রাণ নিংড়ান ভালবাসা দিয়ে শিষ্যের কুল-কুণ্ডলিনী জাগ্রতা ক'রে, শিষ্যকে তাঁর প্রেমের চিহ্নে চিহ্নিত ভক্তে পরিণত করেন। ফল কি হয়? কন্যা স্বামী গৃহে এসে পিতৃগৃহেরই মতন সব কিছু করছেন,—কুটনো কুটছেন, রান্না করছেন, ঘর দোর সাফ করছেন। কিন্তু তাই বলে তিনি রাঁধুনী বা ঝি নন। তিনি তাঁর ইচ্ছামত স্বামীর বাড়ীর রাঁধুনী বা ঝিকে বরখাস্ত করতে পারেন। তিনি সর্বত্র স্বাধীনা, কেবল তাঁর স্বামীর কাছেই পরাধীনা। প্রতি কার্যেই তিনি পরম প্রীতি পাচ্ছেন, তা সে যতই কেন তুচ্ছ কাজ হ'ক না। গুরু লাভের পূর্বে শিষ্য যা করতেন পরেও তাই করেন, কিন্তু মনটা অনেকটাই তফাৎ হয়ে যায়। "তস্য ভাসা সর্বমিদং

বিভাতি” এটি শুধু মুখের ভাষা মাত্র থাকে না, অন্তরে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হতে থাকে।

কন্যা এখন জুড়িয়ে গিয়েছেন। কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। যদি কন্যার পুত্র লাভ না হয়, স্বামীর সত্তায় যদি তিনি সত্ত্বতী না হন, তবে তাঁর বিবাহ নিরর্থক, নারী জন্মই বৃথা। ঠিক সেই মত, গুরুর প্রেম বৈরাগ্য যদি শিষ্যে সঞ্চারিত না হয়, তবে শিষ্যের গুরু করণ মিথ্যা, মনুষ্য জন্মই বিফল।. এই সঞ্চার অতি সূক্ষ্ম। এটি শিষ্যের অগোচরেই ঘটে। স্ত্রী যে ভাবে স্বামীর কাছে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে সমর্পণ করেন, ঠিক সেই ভাবে শিষ্য গুরুর কাছে আত্মদান করলে, তবেই এটি সম্ভব হয়। যেমন স্বামীর দুই ফোঁটা জল থেকে চুল, নখ, রক্ত, মাংস কত কি হয়, তেমনি গুরুর একটু স্পর্শ, দৃষ্টি বা অন্য কিছু পেলে শিষ্য বুঝতে পারেন যে জগতের সব কিছু সেই গুরুই, তাঁ থেকেই সব হযেছে। গুরুর গুরুত্ব এখানেই। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় স্বামী ও স্ত্রী একই ভাবে জীবন যাপন করছেন; কিন্তু স্বামী থেকে স্ত্রী একটু কিছু পান যার ফলেই পুত্র লাভ হয়। তেমনি গুরু এবং শিষ্য উভয়েই ধ্যান, জপ, শাস্ত্রচর্চা, পূজার্চনা ইত্যাদি করছেন বটে, কিন্তু গুরু থেকে শিষ্য একটু কিছু পেলে তবেই শিষ্যেতে ঈশ্বরীয ভাবের সঞ্চার হয। স্ত্রী নিজের রক্ত দিয়ে ভ্রূণ বাড়ান মনে হয় বটে কিন্তু সে রক্তও স্বামীর উপার্জিত ধনে ভরণ পোষণের ফলেই স্ত্রী পান। তেমনি শিষ্যও গুরুর কাছ থেকে দেবভাব পেযে সেটিকে বাড়িযে থাকেন, কিন্তু তিনি বিলক্ষণ জানেন এ পুষ্টিও শ্রীগুরুরই পরোক্ষ দান। সন্তান-সম্ভাবিতা জননী গৃহকার্যে উদাসিনী হন; ঈশ্বরীয় ভাব এলে শিষ্যের কাছেও সংসার আলুনি লাগে। পুত্র প্রসব হবার পরে স্বামী বলেন, “তুমি এতদিন বৌ ছিলে। বাড়ীর ভিতরে বদ্ধ ছিলে। এখন তুমি গিন্নী হয়েছ। ছেলে কোলে ক'রে পাড়ার সকলের তত্ত্ব ক'রে এস।” গুরু তেমনি শিষ্যকে বলেন, “এতদিন চারাগাছে বেড়া দেওয়া ছিল। এখন গাছ বড় হয়েছে। এখন হাতী বাঁধলেও গাছের কিছু হবে না। তুমি আমার কাছে যা শুনেছ তা সবাইকে

বল। তাতে তোমার নিষ্ঠার অণুমাত্র লাঘব হবে না।" এত যে সব ঘটল, এর বীজ ছোট্ট খুকীর সেই ইচ্ছা মাত্র। তা থেকেই সব কিছু হয়েছে।

ইচ্ছার বিকাশ

শিষ্য। হাঁ, বাবা, রবীন্দ্রনাথের "জন্ম-কথা" কবিতাতে মা তাঁর খোকাকে বলছেন :—

ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে॥
ছিলি আমার পুতুল খেলায়, প্রভাতে শিব পূজার বেলায়
তোরে আমি ভেঙেছি আর গড়েছি।
* * *
আমার চিরকালের আশায়, আমার সকল ভালবাসায়
* *
কত কাল যে লুকিয়েছিলে কে জানে।
যৌবনে যখন হিয়া, উঠেছিল প্রস্ফুটিয়া
তুই ছিলি সৌরভের মত মিলায়ে।
আমার তরুণ অঙ্গে অঙ্গে, জড়িয়ে ছিলি সঙ্গে সঙ্গে,
তোর লাবণ্য কোমলতা বিলায়ে॥

বাবা, ইচ্ছারই বিকাশ। কিন্তু আমার ক্ষুদ্র প্রাণের ক্ষুদ্র ইচ্ছা। তাতে কি এই বিকাশ সম্ভব?

গুরু। প্রাণের ইচ্ছা বললে না? প্রাণে কে আছেন? তিনিই তো। তিনিই তাঁকে চাইছেন। রুখবে কে বল?

ভক্ত-ভগবানের খেলা

শিষ্য। বাস্তবিক, আমি তো তাঁকে নিয়ে খেলাই করি। ভক্তদের ইচ্ছা মানে প্রগাঢ় নিষ্ঠা, অপরিসীম ব্যাকুলতা। রবীন্দ্রনাথের "বালিকা বধূ" ব'লে আর একটি কবিতা আছে। তাতে লিখেছেন—

ওগো বর, ওগো বঁধু,
এই যে নবীনা বুদ্ধিবিহীনা এ তব বালিকাবধূ।
* * *

তুমি কাছে এলে ভাবে তুমি তার খেলিবার ধন শুধু,
ওগো বর, ওগো বঁধু
* *
কহে এরে গুরুজনে
'ও যে তোর পতি,' 'ও তোর দেবতা' , ভীত হয়ে তাহা শোনে।
কেমন করিয়া পূজিবে তোমায়
কোনমতে তাহা ভাবিয়া না পায়—
খেলা ফেলে কভু মনে পড়ে তার, 'পালিব পরাণ পণে
যাহা কহে গুরুজনে।'
* *
শুধু দুর্দিনে ঝড়ে—
দশদিক্ ত্রাসে আঁধারিয়া আসে ধরাতলে অম্বরে,
তখন নয়নে ঘুম নাই আর,
খেলা ধূলা কোথা পড়ে থাকে তার—
তোমারে সবলে রহে আঁকড়িয়া, হিয়া কাঁপে থর থরে—
দুঃখ দিনের ঝড়ে।
মোরা মনে করি ভয়
তোমার চরণে অবোধ জনের অপরাধ বুঝি হয়।
তুমি আপনার মনে হাস,
এই দেখিতেই বুঝি ভালবাস—
খেলা ঘর দ্বারে দাঁড়াইয়া আড়ে কী যে পাও পরিচয়।
মোরা মিছে করি ভয়।
তুমি বুঝিয়াছ মনে,
একদিন এর খেলা ঘুচে যাবে ওই তব শ্রীচরণে।
* *
ওগো বর, ওগো বঁধু,
জানো জানো তুমি, ধূলায় বসিয়া এ বালা তোমারই বধূ।
রতন-আসন তুমি এরি তরে,
রেখেছ সাজায়ে নির্জন ঘরে—
সোনার পাত্রে ভরিয়া রেখেছ নন্দন বন-মধু,
ওগো বর, ওগো বঁধু।

কিন্তু, বাবা, এ খেলাটা যে একতবফা। শুধু তিনিই খেলবেন, আর আমি জ্বলব, এ কেমন খেলা ?

গুরু। কেন, তুমিও তো তাঁরই খেলাব খেলুড়ে। তোমাকে না নিয়ে তাঁর যে খেলাই হয় না। তোমাব জন্যেই তো তাঁর এই খেলা।

শিষ্য। আমার যে খেলাতে কেবলই হাব হচ্ছে। তিনি আমার আসক্তিগুলিকে পরাভূত কবতে দিযেছেন, আমি যে কেবলই তাদের কাছে হেরে যাচ্ছি।

গুরু। খেলাতে জিততে চাও ? তবে যার তার গোলাম হলে হবে না, তাঁর গোলাম হতে হবে,—রংএব গোলাম হতে হবে। রংএর গোলামের ক্ষমতা এত বেশী যে বাজে রাজা, বাজে রাণীকে পর্যন্ত অনায়াসে ধরতে পাবে। ব্রহ্ম সত্য হলে জগৎ মিথ্যা হতে পাবে না। কারণ সত্য থেকে সত্যই উদ্ভূত হয়। বাস্তবিক, এই চৌদ্দ ভুবন তাঁরই,—এ রংএবই চৌদ্দ এবং রংএর গোলাম ছাড়া আব কারু কাছে এ কিছুতেই ধরা দেয় না। তারই পক্ষে বলা যায়,—

"তাব চৌদ্দ ভুবন ধ্বংস হলেও আশমানেতে বানায় ঘর।" যে মুহূর্তে তোমাব বোধ হবে যে তুমি শ্রীভগবানের দাস, সেই মুহূর্তে তোমার শক্তি অজেয় হবে।

গুরু একান্ত নিজ জন

শিষ্য। বাবা, আপনি তো কত কথাই বলেন। কিন্তু মনে প্রেম জাগে কই ? এ দেহে তিনি বিলাস কববেন এই ভাবনাতে দেহে পুলক আসে কই ? যে যৌবনে নিজেকে সমর্পণ না করা পর্যন্ত স্থির থাকা যায় না, সে যৌবন কই ?

গুরু। আচ্ছা বাবা, লৌকিক প্রণযের কথাই ভাব। ধর, বধূ নিতান্ত বালিকা। যৌবন-চাঞ্চল্য এখনও আসে নি। তখন তিনি কি দেখছেন ? দেখছেন, পিতৃগৃহে তাঁর দাদারা, এমন কি তাঁর ছোট ভাইরা পর্যন্ত তাঁকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। সেই সব দাদারা তাঁর স্বামীর সঙ্গে কত সমীহ ক'রে কথা কইছেন। তাঁর স্বামীর মন-

যোগাবার জন্যে বাপ মা পর্যন্ত কত ব্যস্ত। সেই স্বামী বিনা কারণে তাঁকে কতই না স্নেহ করেন, এই সব দেখতে দেখতে বালিকা বধূর মনেও প্রীতির সঞ্চার হয়। কিশোরীর মনেও প্রেম জাগে। প্রথমে গুরুর স্নেহ পেয়ে মনে হয়, গুরুর কিছু মতলব নিশ্চয়ই আছে। এখন কিছু বলছেন না বটে, পরে কিন্তু কিছু মোটা রকম আদায়ের অপেক্ষাতেই আছেন। কিন্তু যখন তাঁর সঙ্গগুণে বোঝা যায় যে তিনি বিনা কারণেই শিষ্যকে স্নেহ করছেন, তিনি সম্পূর্ণ অনাসক্ত, তিনি শুধু শিষ্যের কল্যাণই চান, তখন শিষ্যের মন আর্দ্র দ্রবীভূত হয়। গুরু বলছেন, এই-ই যথেষ্ট, সে সম্বন্ধে অন্য বিচার আর মনেই ওঠে না। গুরু একান্ত নিজ জন, এ কথা সে প্রাণে প্রাণে বুঝতে পাবে।

শিষ্য। বাবা, সংসারে আমরা যাকে নিজ জন বলি তার কাছে আমরা হাতে হাতে কিছু পাই। একটি অভাব স্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ পূরণ করতে পারেন না। তাই তিনি এত আপনার।

গুরু। বাবা বেশ ক'রে বোঝ। যে অভাবের কথা তুমি বললে, সে অভাব কে জাগিয়েছেন? তোমার স্ত্রীই তো। যদি কেউ তোমাকে আগুনের ছ্যাঁকা দেন, তার পরে ফুঁ দেন, তিনিই তোমার আপনার? আর যিনি ছ্যাঁকা মোটেই দিতে দেন না, আগুনের কাছেই আসতে দেন না, তিনি তোমার আপনার নন! আসক্তির জ্বালার পরে মিথ্যা প্রলেপ ভাল? না, আসক্তি ত্যাগই ভাল? প্রলেপের পরে আবার জ্বালা আছে যে। সেটা ভুলি কেমন ক'রে? গুরু আসক্তি ত্যাগ করান। তাই তিনি আপনার। মুশকিল এই যে আমাদের প্রলেপে এতই মোহ যে জ্বালার কথা প্রলেপের সময়ে মনেই থাকে না। কত প্রলাপই যে বকি!

শিষ্য। আমাদের মোহান্ধ নয়ন; আমরা প্রেয়কেই শ্রেয় মনে করি।

গুরুই পুরোহিত, তিনি পুরো হিত করেন

গুরু। গুরুর কাজই তো এই,—শিষ্যকে মোহমুক্ত করা। তুমি একটু আগে দুর্গাপূজার কথা বলছিলে। সেই পূজার কথাই হ'ক।

কে পূজা করেন? পুরোহিত। পুরোহিত কে? না যিনি পুরো হিত করেন। সাধারণ পুরুতঠাকুর শান্তি স্বস্ত্যয়ন করেন। তাতে সব সময়ে যে রোগের শান্তি হয় এমন নয়। তা হলে তো সংসারে ডাক্তার আর থাকতই না। যদিই বা কখনও কোনও প্রিয়জন শান্তি স্বস্ত্যয়নের পরে রোগমুক্ত হলেন, তবুও কি পুরো হিত হল? সে প্রিয়জন কি আর কখনও মারা যাবে না? তবে পুরো হিত কেমন করে হবে? পুরো হিত হবে তখন, যখন আমাদের মোহ কেটে যাবে, আমাদের সংশয় আর থাকবে না, আমাদের দুঃখের অতিনিবৃত্তি হবে। গুরুই সেই পুরোহিত যিনি এই ভাবে পুরো হিত করতে পারেন।

গুরুর প্রতিমা পূজা

শিষ্য যেন প্রতিমা। তার চোখ আছে, সে কেবল আঁকা চোখ; কারণ শ্রীভগবানকে দেখতে পাচ্ছে না। সে প্রাণহীন পুত্তলি। শ্রীভগবানের স্পর্শ অনুভব করে না। বেশ রংচং দেওয়া, রাংতা দিয়ে মোড়ান, ঘাম তেল দিয়ে চকচকে করা; ভিতরে কিন্তু বাঁশ, খড, গোবর, মাটি। শিষ্যও তেমনি বাইরের দিক দিয়ে দেখলে ভব্যচব্য সুবেশধারী; ভিতরে কিন্তু নানা দুষ্প্রবৃত্তি, কামনা বাসনা গজগজ করছে। চুরি করে না,—সে কেবল লোক-লজ্জার ভয়ে, রাজার শাসনের ভয়ে। যদি অপরে ঘুণাক্ষরেও না জানতে পারত, এবং কোটি টাকা বিনা হাঙ্গামায় পাওয়া যেত, তবে চুরি করত কিনা এ কথা জোর ক'রে বলা যায় না। চুরি জিনিসটাই খারাপ, এ বোধ কয়জনের আছে? গুরু এ সব বিলক্ষণই জানেন। তবু তিনি সেই প্রতিমারই অর্চনা করতে আসেন। এসেই বলেন, "ওরে, প্রতিমাকে আসনে তুলতে হবে। বাজা, বাজা।" তাঁর সবই ছল। প্রতিমাকে আসনে তোলা হবে ব'লে নয়—তিনি এসেছেন, এই জন্যই বাদ্য। তিনি যে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী। এসেই শঙ্খ বাজিয়ে বলেন, "ওরে, ভয় কি? এই যে আমি এসেছি। তোর জন্যই এসেছি। তুই যে সংসার চক্রে কাটা পড়ার আতঙ্কে ত্রস্ত হচ্ছিস, এ যে আমারই চক্র। এতে কাটা পড়বি কেন? সংসারের গদা মনে করিস

না। এ আমাবই গদা। আমি কি সত্যিই তোকে মাবতে পারি? বাবা কি ছেলেকে মেবে ফেলবাব জন্য মারেন? তাঁব অন্য উদ্দেশ্য আছেই আছে। এই যে পদ্ম দেখছিস, এর আব একটা নাম পঙ্কজ। তোব কামনা বাসনার পাঁকে ভবা মনই এই পদ্ম। তোব ঐ মনটা আমাকে দিলে আমার হাতেব শোভা হবে।" তিনি এসে প্রতিমাব সিংহাসনখানি পঞ্চগুঁড়ি দিযে বেশ করে সাজালেন। গুরুও ঠিক তাই কবেন। তিনি শিষ্যের বাড়ীতে গিযে বাড়ীব লোকদেব এবং পাড়া পড়শীদের ভিতবে ধর্মভাব জাগবিত ক'রে দেন। তাঁব প্রাণেব শিষ্য সেখানে যাতে শ্রীভগবানকে নিয়ে থাকতে পাবে সেই ব্যবস্থা করবাব জন্যই তিনি যান। তিনি লৌকিক গুরুর মত বার্ষিক আদায়ের জন্য যান না। তাব পব আব একবাব বাজনা বাজিযে প্রতিমাকে উঁচু সিংহাসনে তোলা হল। আর তিনি নিজে বসলেন ভূঁযে। গুরু শিষ্যকে কেবলই প্রাধান্য দেন। স্বামীজীর কথা বলতে শ্রীশ্রীঠাকুব একেবাবে অজ্ঞান। কত লোকে তো এখনও পর্যন্ত স্বামীজীবই জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্যের কথা বলে। শ্রীশ্রীঠাকুরকে তাবা এখনও পর্যন্ত আধ পাগলা অশিক্ষিত বামুন ব'লেই জানে। পুরোহিত প্রথমে চাবদিকে আলোচাল ছড়িয়ে ভূত শুদ্ধি কবলেন। গুরুও শিষ্যকে শিখিয়ে দেন, "যেই আসুক না কেন তাব কাছেই তুই শ্রীশ্রীঠাকুরেব কথা কইবি,—বাজে সঙ্গ বাজে আলাপ, যা প্রলাপ মাত্র,—সব ত্যাগ হয়ে যাবে। ভূত সব পালিয়ে যাবে।" পুবোহিত আর কি কবেন? প্রতিমাব চারদিকে কাণ্ডেব লাল সুতো দিয়ে ঘিবে দেন। যাঁবা বর্তমান পূজা পদ্ধতিব আলোচনা করেছেন, তাঁবা বলেন যে বৈদিক যুগে যজ্ঞ করবাব সময়ে হিংস্র জন্তু বা অসভ্যেরা এসে যাতে যজ্ঞ পণ্ড না কবতে পাবে এইজন্যে চাবদিকে বেড়া দেওযা হত। তন্ত্র নির্দিষ্ট লাল সুতো সেই বেড়াব প্রতীক। গুরুও তেমনি শিষ্যকে নিষ্ঠা পালন করতে বলেন। তাকে বোঝান, "যদি দশ জাযগায গিয়ে দশ রকমেব কথা শুনিস, তোর চঞ্চল মনে আবও চাঞ্চল্য আসবে। যদিই বা দশ জায়গায একই কথা শুনিস তবু সেই একই কথাতে দশটা ভাব

মেশান থাকবে। তাতেও চাঞ্চল্য আসবে। আগে তোর মন স্থির হ'ক। তখন কি করতে হবে না হবে, কি বলতে হবে না হবে, সে তুই নিজেই বুঝতে পারবি। তখন দশজনের কাছে যাস, কিন্তু শেখার আর কিছু বাকী থাকবে না।" এগুলি হবার পরে প্রতিমার চক্ষুদান প্রাণ প্রতিষ্ঠা এই সব হয়। যে শিষ্য গুরুতে নিষ্ঠাবান, গুরুর নির্দেশ মত চলতে ব্যগ্র, তাঁরই মোহান্ধ নয়ন উন্মীলিত হয়, তাঁরই প্রাণে ঈশ্বরানুভূতি ঘটে। তখন শিষ্য আরও অগ্রসর হবার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠেন। প্রতিমা সজীব হন। পুরোহিত তখন ভোগ নিবেদন করেন। "তিক্তান্নং প্রথমে ভোজ্যং।" সুক্ত দিয়ে আরম্ভ। গুরু শিষ্যকে বলেন, "ওরে তুই live করতে জানিস না, তোর liver খারাপ হয়ে গিয়েছে। তোকে তেতো খেতে হবে। নইলে liver ভাল হবে কেমন করে? একটু ধ্যান জপ কর, একটু ত্যাগ কর, একটু আত্মবিচার কর, তবে তো হবে।" শিষ্যের ভাল লাগে না। তাঁর প্রতি ভক্তিতে যত হ'ক না হ'ক, ভব রোগের ভয়ে ভীত হয়ে তাঁর কথা শোনেন। তাঁর কথা শোনার ফল এই হয় যে শিষ্য শীঘ্রই বুঝতে পারেন যে ধ্যান জপ ইত্যাদির অন্য উদ্দেশ্য আর কিছু নয়,—শুধু গুরুগত চিত্ত হওয়া। যেই তাঁর এই বোধ হয়, অমনি গুরু তাঁকে বলেন, "আর তেতো খেতে হবে না। এখন তোর liver ভাল হয়ে গিয়েছে। এবারে সন্দেশ খা।" তখন বাস্তবিকই ধ্যান জপ ইত্যাদিতে বড়ই প্রীতি আসে; নানা দিব্য অনুভূতি হয়। তখন শিষ্য জুড়িয়ে গিয়েছেন। গুরুর কাজ কিন্তু তখনও বাকী আছে। তখন তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে, ধূপ ধুনো পুড়িয়ে, পঞ্চ প্রদীপ জ্বেলে, কর্পূর পুড়িয়ে, যে প্রতিমার তিনিই চক্ষুদান করেছেন, যে প্রতিমার তিনিই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেই প্রতিমার সামনে আরতি আরম্ভ করেন। তখন শিষ্যের তনু মন প্রাণ বিভোর হয়ে যায়। ঘণ্টার কাঠিটা একবার এ পাশে একবার ও পাশে ঢলে পড়ছে। শিষ্য অনুভব করেন, "তিনি আমার মনের মতন হয়ে আমার কাছে ধরা দিয়েছেন; আমিও তাঁর মনের মতন হয়ে তাঁরই পায়ে ঢলে পড়ি। ধূপ ধুনো পুড়ে তবে সুবাস হচ্ছে; আমিও

আত্মাহুতি দিই। আমাব পঞ্চেন্দ্রিয় নিঃশেষে পুড়ে জ্ঞানেব আলোক দিক। আমার কামনা বাসনা তাঁবই পূজোতে কর্পূরেব মত উবে যাক।" এ সব বিচিত্র ভাব-তবঙ্গ প্রবাহিত হযে সাগব-সঙ্গমে যায়। এবও পরে কর্ণে শুধু তাঁরই মঙ্গল বাদ্য; নাসিকাতে তাঁবই শ্রীঅঙ্গেব সুবভি। ধূপ ধুনোব ধোঁয়াতে দৃষ্টি নিবদ্ধ। সব ইন্দ্রিয় পবিতৃপ্ত, নিরুদ্ধ। তাব পবে যে কি হয তা বলাই যায না। সে যে সমাধিব ব্যাপাব।

"যে করেছে সৃজন, সেই তো ভজে সবারে"

শিষ্য। বাবা, এ কল্পনাব সীমাব কথাও নয়, এ কল্পনাব পাবের কথা। আব আমি এ চাইও না। আমার সাধ হয় পূজো কবি। কতদিন সন্ধ্যার সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুবেব সন্ধ্যাকালীন আচরণ স্মবণ কবি। তাঁব একটি দিনও বৃথায় যায় নি, তবু তাঁব কী ব্যাকুলতা। আব আমাব একদিন কেন, কতদিনই তো একেবারে ব্যর্থ হচ্ছে। যখন বাড়ীতে বাড়ীতে শঙ্খ বাজে, তখন মনে হয এ দেহ যদি তাঁরই মন্দিব হয়, তবে এব অন্তবে সেই শঙ্খ ধ্বনিত হচ্ছে না কেন? আকাশ বাতাস তাঁর মঙ্গলবাদ্যে পবিপূর্ণ হবে আর শুধু এইখানটাই জড় হয়ে থাকবে?

গুরু। শোন, বাবা, একদিন মীরাটে শ্রীশ্রীঠাকুব আমাকে জিজ্ঞাসা কবলেন, "ভগবান সম্বন্ধে কি বুঝলি বল।" আমি উত্তর দিলাম,

"কেউ তো ভাই ভজে না তা'বে
যে কবেছে সৃজন সেই তো ভজে সবাবে।"

এ কথা শোনা মাত্র তাঁব গভীর সমাধি। সমাধি ভঙ্গের পরে তাঁর মুখে অপূর্ব ভাব। সে চিত্ত-বিমোহন সমাধি অন্তে স্বর্গীয় আনন্দের ছটা তাঁতেই, কেবল তাঁতেই দেখেছিলাম।

শিষ্য। বাবা, এ কথা আমি আগেও আপনাব কাছে শুনেছি। আমার মনে হয কি জানেন? আপনার গুরুদেব লিখেছেন যে শ্রীভগবান যতি-জন-বঞ্জন। আমি তো আর যতি নই। কি ক'বে তিনি আমার

প্রসন্ন হবেন ? শম-দম, যম-নিয়ম প্রভৃতিব কী পালন করি আমি ?

গুরু। বাবা, আগে তুমি বেশ ক'বে বোঝ, তাব পবে এই কথা বল। দেখ, কোনও কিছুর ঘটনাতেই আমাদের মনে একটা ছাপ লাগিয়ে দেয়। যদি কোনও অনুকূল ঘটনা ঘটে, সংস্কাবে যে লুকোন ভাবটি আছে, সেটি তখনই ফুটে ওঠে। আব সেই পূর্বেকার ভাবটিও দৃঢ় হয়ে হৃদযে আসন ক'বে বসে। প্রীতির অনুকূল যা কিছু তোমাব মনে উঠছে তাতে ক'রে প্রীতিই পুষ্ট হচ্ছে। বিরুদ্ধ ভাব যদিই বা আসে, সেও প্রীতিকে সরিয়ে দিতে পারে না। এ প্রীতি তো তুচ্ছ, খণ্ডিত, লৌকিক প্রীতি নয়। এ যে সাগর,—সাগরে যাই আসুক, সে তাকে নিজেব মনের মতন ক'রে নেবে।

শিষ্য। বাবা, ভক্তির বিন্দুই আমার নেই, আব আপনি ভক্তির সিন্ধুব কথা বলছেন।

গুরু। আমরা জীবাত্মাকে ক্ষুদ্র ব'লে অভিমান করি বটে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইনি হ্রস্বও নন, দীর্ঘও নন। যেমন, তেমন। কেমন ? যেমন নিরবচ্ছিন্ন অনন্ত বিস্তারিত ব্যোম ধারণার অতীত হয়েও ঘটের ভিতরে যেন শান্ত ভাবে প্রকাশ পাচ্ছেন। ঐ প্রকার জীবাত্মা। অজ্ঞান বালক আকাশকে নীলবর্ণ দেখে, কিন্তু বিজ্ঞান চক্ষু তাকে অবর্ণই দেখে।

"সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়া এনেছ তোমারি দুয়ারে"

শিষ্য। ধর্ম জগতে আমি নিতান্ত শিশু। ধর্ম জগতের আমি কীই বা বুঝি আর কীই বা জানি। সুতবাং আমি অজ্ঞান বালক তো নিশ্চয়ই। শুধু তাই কেন, যেটুকু প্রেম থাকলে শুধু ভূমিতেই দৃষ্টি নিবদ্ধ না রেখে উর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করতে ইচ্ছে হয়, সেটুকু প্রেমই বা কই ?

গুরু। প্রেমের আড়ম্বরে শ্রীভগবানকে পাওয়া যায় না। আবার অতি স্বল্প উদ্গমেও ভগবৎ-সম্ভোগ হয়ে থাকে। উদ্দেশ্যবিশিষ্ট বহু ভক্তিতেও শ্রীভগবান দূরে থাকেন। কিন্তু অহৈতুক স্বল্প প্রেমেও তিনি

নিকট হন। আজ্ঞাবাহী পুত্রের সামান্য কার্যে পিতা যেমন প্রীতি পান, শ্রীভগবানও ভক্ত-বশ্যতায় সেইরূপ প্রসন্ন হন। আর তাঁর একটি নাম "অহৈতুক কৃপাসিন্ধু"। রেলের গাড়ীর কী শক্তি আছে, বল। যত শক্তি সব ইঞ্জিনের। গাড়ী কেবল ইঞ্জিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে আর বেলাইন (derailed) হচ্ছে না। গাড়ীর ভিতরে যাই থাকুক না কেন, ইঞ্জিন হরিদ্বারে গেলে গাড়ীও সেই সঙ্গে সঙ্গে হরিদ্বারে যাবে। ইঞ্জিন যখন খুব জোরে চলে, চারদিকে কত ধুলো ওড়ে। মহাপুরুষ এলে তাঁর সম্বন্ধে কত নিন্দা, কত কটূক্তি না হয়। যেখানকার ধুলো সেইখানেই পড়ে থাকে। ইঞ্জিন কিন্তু গাড়ীগুলি নিয়ে গন্তব্য স্থানে ঠিক পৌঁছে দেয়,—বড় জোর তাদের গায়ে একটু ধুলো পড়ে মাত্র। সাতেও থাকব না, পাঁচেও থাকব না, আমার গায়ে কোনও দাগ যেন না লাগে, এ রকম ভাল মানুষি ধর্ম নয়। এ তামসিক হৃদয় দৌর্বল্য। ক্ষমা একে বলে না। নিন্দা, গ্লানি-আসে আসুক,—কিছুতেই বেলাইন হব না, লক্ষ্য ঠিক থাকবে, এ না হলে যাওয়া যায় কি? আবার কোনও কোনও সময়ে দেখা যায় ইঞ্জিনের মুখ ঘোরাবার ব্যবস্থা না থাকাতে, ইঞ্জিন উল্টো মুখেই গাড়ী টানছে। কয়লার দিকটা সামনে ক'রে, নলের দিকটা গাড়ীর সঙ্গে লাগিয়ে,—উল্টো মুখে টানা হচ্ছে বটে, কিন্তু উল্টো দিকে টানা হচ্ছে কি? তা তো নয়। গাড়ী ঠিক দিকেই চলেছে। এখানে গুরু তাঁর "দক্ষিণ মুখে" নন, অন্য মুখে, দুঃখের ভিতর দিয়ে, তথাপি ঠিক দিকেই টানছেন। আমরা ভয় পাই। ভাবি, বুদ্ধি তাঁর ভুল হয়েছে। আমাদের অভিমান মাথা তোলে। সিগন্যাল আপ (Signal up) হয়। অমনি ইঞ্জিন থেমে যায়। বাস্তবিক গুরুকে গুরুজ্ঞান না করলে গুরুশক্তির ক্রিয়া হবে কি ক'রে? কিন্তু যে বুদ্ধিমান, সে বুঝতে পারে যে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে নিজেও থেমে গেলাম যে। তখনই তার অভিমান আবার নত হয়। অমনি আবার ইঞ্জিন চলাও শুরু করে। প্রথমে আস্তে আস্তে চলে। ক্রমশঃ বেগ বাড়ে। এত বেড়ে যায় যে যখন অন্ধকার বনের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলে, তখন চলছে কিনা

বোঝাই যায় না। যখন ষ্টেশনে একটু থামে, আলো জ্বলে, লোকজনের কোলাহল হয়, তখনই মনে হয় এ তো আগের ষ্টেশন নয়, সুতরাং এগিয়েছি বই কি। গুরু এইভাবে আমাদের অজ্ঞাতসারেই আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়ে দেন। "সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়া এনেছ তোমারি দুয়ারে।"

শিষ্য। পথ চলার সময়ে কি কিছুই বোঝা যায় না ?

গুরু। যায় বই কি। কিন্তু যে শিষ্য চতুর, সে ভাবে পথের কথা ভেবে ভেবে সময় নষ্ট করি কেন ? গুরুর সঙ্গে আছি সেটি ভেবে আনন্দ করি না কেন ? পাতা গুণে লাভ কি ? আম খাওয়া যাক। কেমন ক'রে হচ্ছে সেইটিই কি বড় কথা ? হচ্ছে, এটাই কি বড় কথা নয় ? বাস্তবিক, শিষ্যের করবার আর কীই বা আছে! গুরু শিষ্যের অহংকারের গাছটা কেটে দিয়ে একটু তফাতে থাকেন। শিষ্যের অহংকারটা মড়মড় ক'রে পড়ে মাত্র।

গুরু শিষ্যকে গুরুজ্ঞান করেন

শিষ্য। বাবা, আপনি বিশ্বাসের কথা কতই তো বলেন। আমি তো সে রকম বলতে পারি না। কেবল এ রোগ, সে রোগ, এ কামনা সে আসক্তি সেই সব কথাই কেবল বলি।

গুরু। ডাক্তারকে তো সব লক্ষণ বলতেই হয়। তিনি হয়তো এক কৌটা জল মাত্র ওষুধ দেবেন।

শিষ্য। লক্ষণই কি সব ঠিক ভাবে বলতে পারি ?

গুরু। তিনি নাড়ি দেখতেও জানেন যে। গুরুদেব যে শিষ্যকে গুরু জ্ঞান করেন। তাঁর তো গুরু ভক্তি আছে। তাঁর ভক্তিও যে অন্দর মহল পর্যন্ত যেতে পারে। তাই তিনি শিষ্যের ভিতরটাও দেখতে পান। শোন, বাবা, আমার জীবনের একটি ঘটনা বলি শোন। একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের সবাইকে বললেন, "তোদের কার কি মনের কথা আমাকে খুলে বল।" আমি উত্তর দিলাম, "যে ডাক্তার আমার মনের কথা জানতে পারেন না, তাঁকে দিয়ে আমার চিকিৎসা হবে

না।” এটি যে আহাম্মকি, পরে নিজেই বুঝলাম। যদি তিনি আমার সব কথা জানেন, এই বিশ্বাস আমার সত্যিই হয়ে থাকে, তবে সে সব কথা তাঁকে বলতে বাধা কি? শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, “ডুবে ডুবে জল খেলে শিবও জানতে পারেন না।” এ কথা বললেন বটে কিন্তু তাঁর অন্তর্যামিত্বও তখনই আমার কাছে প্রকাশিত করলেন। তিনি হঠাৎ বললেন, “চিল শকুনি অনেক উঁচুতে ওড়ে বটে, কিন্তু গো ভাগাড়েই তাদের দৃষ্টি।” বাস্তবিক, ঠিক সেই সময়ে যদিও আমি ভক্তি বিশ্বাসের কথাই বলছিলাম, মনে মনে কিন্তু ভাবছিলাম, আমার অপুত্রক স্নেহ-পরায়ণ খুড়ীমার অনেক টাকা আছে, সে টাকা তিনি আমাকেই দিয়ে যাবেন।

শিষ্য। এ রকম ঘটনা আমার জীবনেও তো বহুবারই ঘটেছে। কিন্তু তাই ব'লে আপনার মতন ভক্তি বিশ্বাসের কণামাত্রও পেয়েছি কি? আপনার বিষয়ে আমি যত ভাবি, আমার ততই ভয় বাড়ে। ভাবি, যে মনে ঈশ্বর উপলব্ধি হয় সে মনের সঙ্গে আমার মনের কত প্রভেদ। “বাপকো বেটা, সিপাইকো ঘোড়া, কুছ নেহি তো থোড়া থোড়া।” আমার বেলায় থোড়া থোড়াও দেখি না যে।

আমরা তাঁর আশ্রিত ; তাঁর নিজ জন

গুরু। আচ্ছা, বাবা, তুমি কখনও গড়ের মাঠে বা পার্কে বড় লোকের ছেলেদের ঝি চাকরেরা বেড়াতে নিয়ে গিয়েছে দেখ নি? ছেলে, খেলা করতে করতে একটু দুষ্টুমি করলে বা একটুখানি সরে গেলেই ঝি চাকরেরা কড়া শাসন করছে। হয়তো কান মলেই দিচ্ছে। আর শাসাচ্ছে, “যদি এসব কথা বাড়ীতে গিয়ে রাজা বাবা বা রাণীমাকে বলবি তবে কাল তোর হাড় গুঁড়ো করে দেব।” ছেলে ভয়েই অস্থির। রাজা বাবা, রাণীমা তার কাছে শব্দ মাত্র। ভাবে এই ঝি চাকরই তার মনিব। কিন্তু যখন সেই ছেলে সাবালক হয়, সে যখন আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়, সে চেয়ারে বসে গুরু গম্ভীর স্বরে ডাকে, “বেয়ারা”। আর অমনি চাকরটা হাত জোড় ক'রে “হুজুর” ব'লে হাজির হয়। তখন ছেলেটি

বলে, "আমাকে মেরেছিলি যে বড় ?" চাকরটা জবাব দেয়, "ও সব কথা ভুলে যান। ও সব কথা ভুলে যান।" আমরা এখন ভাবছি যে আমরা ইন্দ্রিয়ের দাস। তাদের কাছে কেবলই মার খাচ্ছি। যে মুহূর্তে বুঝব যে আমরা শ্রীভগবানের সন্তান, তখনই ঐ ইন্দ্রিয়গুলিই আমাদের দাসানুদাস হয়ে যাবে। আমরা তাঁর আশ্রিত, তাঁর নিজ জন, এটি অতীব সত্য কথা। এই বোধটা আমাদের হওয়া মাত্র বাকী।

শিষ্য। বাবা, আপনি তো একই কথা কতবার কত রকম ক'রে বোঝান। আমি যে কূল পাই না। তাই না আকুল হই।

গুরু। কূল দেখে মানুষ জাহাজে চড়ে নাকি ? কাপ্তেন দেখেই তো চড়ে। ভব-সাগর অকূল, কূল তো পাওয়াই যায় না। "মনে করি কুলে রই, কুল তো আর রয় না।" তাই না কাপ্তেনের যোগ্যতা দরকার। কেন, তুমিও তো এই সব কথা কত নিজেই বল।

"দূরের মানুষ এলো যেন আজ কাছে"

শিষ্য। বাবা, আমি তো আপনাকে বলেছি যে আমি গ্রামোফোন মাত্র। "His Master's Voice" গ্রামোফোন। আপনার কথার পুনরাবৃত্তি করি মাত্র।

গুরু। আমিও কি নিজের কথা বলি ? আমিও তো শ্রীশ্রীঠাকুরের গ্রামোফোন।

শিষ্য। না, বাবা, আপনি গ্রামোফোন কেন ? আপনি রেডিও। বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ; কিন্তু সে আমাদের বুদ্ধিগোচর নয়। ঈশ্বরীয় ভাবে সবই পূর্ণ ; আমরা কিন্তু তা বুঝতে পারি না। দুটি উঁচু বাঁশে লম্বা তার যেমন খাটান আছে, আপনিও তেমনি দুহাত তুলে শ্রীশ্রীঠাকুরের জয়ধ্বনি দিয়ে আপনার মনটি কামনা বাসনার জগতের বহু উচ্চে বেঁধে দিয়েছেন। আবার ব্যবহারিক সত্তাতেও যে দেশের, যে ভাষার, যে অবস্থার কথা আমাদের শোনা দরকার ঠিক সেই wave length-এই আপনার রেডিও বসিয়ে দেন। তাই না কড়কড় শব্দ,—যা বাক্য মনের বাস্তবিকই অতীত, তা পর্যন্ত আপনার ভিতর

দিয়ে আদাদের ভাবাতে আমাদের বোধগম্য হচ্ছে। আপনি গ্রামোফোন হবেন কেন? আপনি রেডিও।

গুরু। কেন, রেডিও থেকে যেটা শোনা যাচ্ছে, সেটা অপর কেউ বলেন নি কি? তিনি অলক্ষ্যে আছেন। দূরে আছেন, তাই ব'লে তিনি নাই কি?

শিষ্য। বাবা, আপনার কথা শুনলে মনে হয়—

"দূরের মানুষ এল যেন আজ কাছে।
তিমির আড়ালে নীরবে দাঁড়ায়ে আছে।
বুকে দোলে তার বিরহ ব্যথার মালা।
গোপন মিলন অমিত গন্ধ ঢালা।
মনে হয় তার চরণের ধ্বনি জানি।
হার মানি তাই অজানা জনের কাছে।"

শাস্ত্রে, সাধুদের জীবনীতে ভগবৎ বিষয়ক কত কথাই না আছে। সে সব আমরা তো আর কাজে লাগাতে পারি না। সমুদ্রে অগাধ জলরাশি আছে; কিন্তু সে জল তো আর পান করা যায় না। খানিকটা সমুদ্রের জল বৃষ্টিতে রূপান্তরিত হলে তবে সেটি সুস্বাদু, সুপেয় হয়। গুরুই এই রূপান্তর ঘটান।

যিনি ঈশ্বরকে পাইয়ে দেন, তিনিই সদ্‌গুরু

গুরু। বাবা, তোমার এ উপমাটি চমৎকার। সমুদ্রের জলে উত্তাপ পড়লে তবে তো মেঘ হবে। গুরুর উপদেশে ব্যাকুলতার উদয়েই এই পরিবর্তন। মেঘ দেখে প্রথমটা মনে হয় একি জল? এ যে কালো, এ যে আকাশে ঘুরে বেড়ায়। এ জল হবে কি ক'রে? মনে তখন কত সংশয়, কত সন্দেহ কিন্তু মেঘের গতি ঊর্দ্ধদিকে। যত ওপরে ওঠে, ততই ঠাণ্ডা হয়। এমন একটা অবস্থা আসে যখন মেঘ আর মেঘ থাকতে পারে না, বৃষ্টিতে পরিণত হয়ে পৃথিবীকে স্নিগ্ধ, পবিত্র করে। যদি পাহাড়েও পড়ে, তবু নদী হয়ে,—তবে সমুদ্রে ফিরে যায়। আবার দেখ, নদীতে সর্বত্রই জল আছে বটে,

কিন্তু যেখানে সেখানে নাওয়া যায় না ; জলও আনা যায় না। ঘাট চাই। এখানেও গুরুর দরকার।

শিষ্য। আপনি আপনার গুরুদেবকে দেখেছেন। আপনি মনে করেন সব গুরুই বুঝি আপনার গুরুদেবের মতন। এমন কত গুরু আছেন যাঁরা শুধু মন্ত্র দেন, শিষ্যের কি হচ্ছে না হচ্ছে খবরও করেন না, তাঁর বার্ষিকটা ঠিক মত পেলেই হল।

গুরু। এ তো সেকালের পাঠশালের গুরু। পড়া কর বা না কর, ক্ষতি নাই। তাঁর জন্যে তামাক,—চুরি ক'রেই পার আর যেমন ক'রেই পার,—আনতেই হবে। এঁর কাছে পড়া কেমন ক'রে হবে ? গুরুরও ছেলে হচ্ছে, শিষ্যেরও ছেলে হচ্ছে, তিনি শিষ্যকে কি শেখাবেন ? তাঁর নিজেরই শক্তি নাই, কেমন ক'রে তিনি শক্তি সঞ্চার করবেন ?

শিষ্য। তবে এঁদের গুরু বলা কেন ?

গুরু। বাবা, সবাই গুরু, পাঠশালের গুরুও গুরু, এণ্ট্রান্স স্কুলের গুরুও গুরু। পাঠশালের গুরু পাঠশাল থেকে পাস করিয়ে দিতে পারেন। এণ্ট্রান্স স্কুলের গুরু ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু যদি এম. এ. পাস করতে হয় তবে ইউনিভার্সিটিতে যেতে হবে। যাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, তিনিই কেবল ঈশ্বর দর্শন করাতে পারেন। আমার গুরুদেব স্তব করেছেন, "জয় সদ্‌গুরু ঈশ্বর-প্রাপক হে।" আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "সদ্‌গুরু বললেন কেন ?" তিনি বোঝালেন, "যিনি ঈশ্বরকে পাইয়ে দেন, তিনিই সদ্‌গুরু।"

দীক্ষা

শিষ্য। তবে কি প্রচলিত দীক্ষাতে কোনও ফল নাই ?

গুরু। বাবা, দীক্ষা তিন রকমের আছে—মান্ত্রী, শাক্তী ও শাম্ভবী। মান্ত্রী দীক্ষাতে গুরু কোনও বীজ বা মন্ত্র দেন। সেটি শিষ্য জপ করেন। মন্ত্র কি ? ঈশ্বরের নাম তো ? তা জপ করলে চিত্ত খানিকটা শুদ্ধ হবে বই কি। গুরু তো অন্যায় কাজ করতে বলছেন না, চুরিও

করতে বলছেন না, বাটপাড়িও করতে বলছেন না। কিন্তু এ মন্ত্রে স্বয়ং গুরুদেবের যদি ঈশ্বর দর্শন না হয়ে থাকে, তবে এতে ক'রে শিষ্যের কি ক'রে ঈশ্বর দর্শন হবে? দ্বিতীয় প্রকারের দীক্ষা, শাক্তী দীক্ষাতে শক্তিমান গুরু আগ্রহান্বিত শিষ্যে শক্তি সঞ্চার করেন। গুরুর শক্তি আছে কিনা সেটি নিঃসংশয়ে বোঝা যায়,—তাঁর আসক্তি পরিশূন্যতা দেখে। তাঁর বিভূতি অবশ্য থাকেই, কিন্তু বিভূতি আসক্তেরও থাকতে পারে। ম্যাজিক আছে, সিদ্ধাই আছে,—এগুলি দেখিয়ে দেখিয়ে টাকা, মান বা মেয়েমানুষ সংগ্রহের চেষ্টা হতে পারে। যিনি শ্রীভগবানকে পেয়েছেন, তাঁর কি এ সবে কিছুমাত্র আসক্তি হতে পারে?

"কেহ কাঞ্চনের তরে,
জটা ধরে শিরে ;
কাহারও বা সাধুর আকার
নারী সহ করিতে বিহার,—
সন্ন্যাসীর ভান ভুলাইতে বামাগণে,
* * *
কেহ অষ্টসিদ্ধি করে আশ।—
অহেতুকী ভক্তির বিকাশ
অতীব বিরল ভবে।"

আসক্তিশূন্য ভক্তিমান গুরু দুর্লভ। তার চেয়েও বেশী দুর্লভ আগ্রহান্বিত শিষ্য। "গুরু মিলে লাখ লাখ, চেলা না মিলে এক।" ঈশ্বরকে পাবার আগ্রহ কার?

"নিরঞ্জনে কে বা চায়?"

শিষ্য। আপনি ঠিক বলছেন, বাবা। এত মন্দির, এত মসজিদ, এত গির্জা—ঈশ্বরকে কিন্তু কেউ চায় না। সেদিন যখন শ্রীশ্রীঠাকুর বাড়ীতে আসছিলাম, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পার্কে দুটি ছেলে খেলা করছিল। ঝগড়া হয়েছে। বলিষ্ঠ ছেলেটি রোগা ছেলেটিকে মেরেছে। সে জোরে পারে নি। সে কাঁদতে কাঁদতে বলছে, "ভগবান আছেন। তিনি

তোমাকে দেখবেন।” আমরাও শ্রীভগবানকে এই ভাবেই চাই। তাঁকে দিয়ে কিছু না কিছু কাজ করিয়ে নেব, এই জন্যই তাঁকে চাই। কান্নাও সেই জন্যই। শ্রীভগবানের জন্য নয়।

গুরু। যে এ কথা বুঝেছে, তার আগ্রহ হয়েছেই হয়েছে। আগ্রহ হলেই গুরু এসে যাবেনই যাবেন। কর্ষিত ভূমি হলে বীজ উড়ে এসে পড়ে। এ অদ্ভুত ব্যাপার। কিন্তু প্রতি ভক্তজীবনেই এর সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এ বিষয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখা ছাড়া বুঝবার অন্য উপায় নাই। তৃতীয় দীক্ষা শাম্ভবী দীক্ষা,—এর চেয়েও অদ্ভুত। “শম্ভু” শব্দে সমানার্থে “ষ্ণ” প্রত্যয়, স্ত্রীলিঙ্গে “ঙী”কার, এই ক'রে “শাম্ভবী”। “শম্ভু” শিব; অদ্বৈত জ্ঞানের প্রতীক। গুরু শিষ্যকে আলাদা দেখছেন না। শিষ্যে শক্তি সঞ্চার করবার তাঁর কোনও অভিপ্রায়ই নাই। এ “হঠাৎ সিদ্ধের” ব্যাপার। “রুদ্রযামল”, “বায়বীয় সংহিতা” প্রভৃতি অপ্রচলিত তন্ত্রে এ দীক্ষার যে বর্ণনা আছে, তাও অদ্ভুত। “গুরোরালোক-মাত্রেণ স্পর্শাৎ, সম্ভাষণাদপি”, শুধু গুরুর দর্শনে, কিংবা তাঁর স্পর্শে, কিংবা তিনি ডেকে কথা কইছেন,—এতেই জিনিসটা হয়ে গেল। অবতার পুরুষ ছাড়া কেউ শাম্ভবী দীক্ষা দিতে পারেন না। আধুনিক যুগে ভক্তপ্রবর গিরিশচন্দ্রের শাম্ভবী দীক্ষা হয়েছিল মনে হয়। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করছেন, “গুরু কি?” শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তর দিচ্ছেন, “কেন, তোমার তো গুরুলাভ হয়ে গিয়েছে।” গিরিশবাবু মনে মনে ভাবছেন, “বাঃ, বেশ কথা তো! গুরু কি, আমি জানি না, আর আমার গুরুলাভ হয়ে গেল?” কিন্তু তাঁর যে গুরুলাভ হয়েছিল, তা আজ কারও বুঝতে বাকী নেই। মহাপ্রভুর সময়েও গোবিন্দদাস কামার তাঁর স্ত্রীর গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরে গঙ্গাতে ডুবে মরতে এসেছিলেন। তিনি মহাপ্রভুকে চিনতেনও না। মহাপ্রভু তখন ধর্ম ব্যাখ্যাও করছিলেন না,—গঙ্গাতে হুল্লোড় করে সাঁতার দিচ্ছিলেন। কী যে গোবিন্দদাস দেখলেন জানি না। কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই কিছু দেখেছিলেন। তাঁর ডুবে মরা হল না। স্ত্রীর অনুতপ্ত মনের কাতর অনুনয়েও তিনি

আর বাড়ী ফিরে গেলেন না। মহাপ্রভুর সঙ্গেই জুটে গেলেন। তাঁর তল্পী বয়ে সমস্ত দাক্ষিণাত্য তাঁব সঙ্গে সঙ্গে ঘুবলেন। এ দীক্ষাও শাম্ভবী দীক্ষা। পৌবাণিক যুগে এর কতই তো বর্ণনা আছে। পুতনার স্তনে বাস্তবিকই বিষ ছিল। ব্রজের কত শিশু সে স্তন্য পান ক'রে মারা গিয়েছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে সেই স্তন্য দিতে তিনি তো মারা গেলেনই না, পুতনারই মাতৃগতি হল। যেখানে শ্রীভগবানের শক্তি বিশেষভাবে প্রকট, যেখানে তিনি অবতার হয়ে এসেছেন, সেখানেই এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যায়।

আসক্তি ত্যাগের ইচ্ছা গুরুকরণের উপাদান

শিষ্য। বাবা, এ সব তো আগেও পড়েছিলাম। কিন্তু এ সব কখনও ভাবিই নি। এখন বুঝছি শ্রীশ্রীঠাকুর কেন বলেছেন, "শেষ চিক এখানকে দিয়ে। অবতার পুরুষের হাতে চাবিকাঠি থাকে।"

গুরু। হাঁ, বাবা, ঠিক কথা। কিন্তু তিনি যে আমাকেই উদ্ধার করবেন, তাব নিশ্চয় কি? অবতাব পুরুষ চাবি ঘুরিযে একথা তো কখনও বলেন নি, "যা, তোরা সব মুক্ত হয়ে যা।" তা হলে তিনি এলে সবাই উদ্ধার হয়ে যেত। এই জন্যই আমাদের শাক্তী দীক্ষাব চেষ্টা করাই দরকার। আমাদের শ্রীভগবানেব জন্য আগ্রহ জাগান দবকার। আবাব দেখ চিন্তামণি বলছেন, "তুমি যেমন ডেকেছ, অমনি তিনি এসেছেন। তুমি চিনতে পাব নি।" তাঁকে চিনতে হলে অনাসক্ত মনের ব্যাপাব বুঝতে হবে। আসক্ত গন দিয়ে সেটি বোঝা ভাবি কঠিন। যখন আমরা আসক্তি ত্যাগেব জন্য আন্তরিক চেষ্টা কবি, তাতে যদি বিফল মনোবথও হই, তবুও আসক্তি ত্যাগেব মহিমা বুঝতে পারি, মহাপুরুষের মহত্ব কিসে, এ বিষয়ে ঠিক ঠিক ধাবণা হয়। সুতবাং দেখা যাচ্ছে, গুরুকরণের একটি মাত্র উপাদান, আমাদের আসক্তি ত্যাগের ইচ্ছা। সে ইচ্ছা হলে, পরে পবে সবই হয়ে যাবে।

শিষ্য। বাবা, আমার গলদ যে কোথায়, সে আমি বিলক্ষণ

জানি। কিন্তু, বাবা, আপনাকে সত্যি সত্যি বলছি, আসক্তি ত্যাগের চেষ্টা যে একেবারেই করি না এমন নয়। সংসারের দোষ প্রতি নিয়তই দেখতে পাই। কিন্তু কামনা বাসনা অতিক্রম করবার শক্তি সব সময় পাই না। এই বিফলতাতে মন প্রাণ অবসন্ন হয়ে যায়। নৈরাশ্যে মন ভরে যায়। আর যদিই বা কোনও সময়ে ক্ষুদ্র কোনও কামনা অন্ততঃ বাহ্যতঃ ত্যাগ করতে পারি, তখনই আত্মপ্রসাদ অনুভব করি। অন্যকে বলি না বটে কিন্তু মনে মনে হয়, "বেশ করেছি।"

সাধু সঙ্গের ফল অব্যর্থ

গুরু। এই জন্যই তো গুরুকে দরকার। তিনি ভবনাথকে ঠাট্টা ক'রে বলেন, "ওঃ, ভবনাথের বড্ড ত্যাগ হয়েছে। সে মাছ পান ত্যাগ করেছে।" মথুরবাবুকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন যে, না, তাঁর স্ত্রী ত্যাগ হয় নি। অন্য দিকে দেখ, তিনিই তো নৈরাশ্যের আলো, পতিতপাবন, অধমতারণ; তিনিই কোনও সময়ে সুতীব্র ব্যাকুলতা জাগিয়ে আমাদের মনপ্রাণ দগ্ধ ক'রে দেন। আবার সুস্নিগ্ধ নির্ভরতার নিষেকে সেই মন প্রাণ শান্ত ক'রে দেন।

"পরীক্ষার অনল জ্বেলে,
আপনি দাও মা তাতে ফেলে,
আর আপনিই দাও তার উপায় ব'লে,
যেরূপে যার বাঁচে জীবন।"

স্বামীজী বলেছেন,

"Companionship of the saint is very rare indeed and it is extremely hard to recognise one, but its effect is infallible."

সাধুসঙ্গ সুদুর্লভ এবং সাধু চেনাও সুকঠিন। কিন্তু সাধুসঙ্গের ফল অব্যর্থ। গুরুর সঙ্গ গুণেই সন্দেহের মেঘ কেটে যায়,—বিশ্বাসের সূর্য প্রতিভাত হয়। সঙ্গের ফল বাস্তবিকই অব্যর্থ।

শিষ্য। বাবা, এই ফল কবেই যে আমার বেলায় ফলবে?

গুরু। ফল ফলাবও যে একটি প্রক্রিয়া আছে, বাবা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "শান্তিনিকেতনে" এ কথাটা বেশ ক'বে বুঝিয়েছেন। দেখ, যখন বর্ষাব সময়ে মাটি সবস তখন আম গাছে আম ফলে কি? শরতের প্রচুব সূর্যালোক, হেমন্তেব শিশিব সবই বৃথা ব'লে মনে হয়। তার পব শীতকালে যখন জমি শুষ্ক, কঠিন,—যখন কুয়াশাতে সূর্যও আবৃত হঠাৎ একদিন মুকুলের উদগম হয়। সে মঞ্জবীতে কেবলই ভ্রমরেব গুঞ্জন। সুবাস আছে, কিন্তু ফল তখনও দেখতে পাওয়া যায় না। গুঞ্জন থেমে যায, মঞ্জরী ঝবে পড়ে—তখন খুব ছোট ছোট ফল দেখা যায়। আমেব পাতা দেখে তবে ফলেব অনুমান হয। সে ফল এতই ছোট, অন্য ফলের সঙ্গে তাব এত বেশী সৌসাদৃশ্য। ক্রমে ফল বড হচ্ছে। তখন আম ব'লে স্পষ্ট বোঝা যায। কিন্তু বোঁটা থেকে টেনে না নিলে ছেঁড়া যায় না। শাঁসেব সঙ্গে খোসার সঙ্গে এত আঁটাআঁটি যে না কেটে খোসা ছাডান যায না। আঁটিব সঙ্গেও শাঁস ঠিক সেই ভাবে জড়িত। মাধুর্যের লেশ মাত্র নেই। তীব্র টক। আসক্তিব বিষে একেবাবে পবিপূর্ণ। কিন্তু এই তো শেষ নয। আম বড হচ্ছে। সোনালী বৌদ্র লেগে লেগে আমে সোনালী রং ধরেছে। আগে পাতার আবেষ্টনে আম চেনাই যেত না। এখন সে অনন্তেব আভাস পেয়ে সাংসাবিক আবেষ্টন থেকে তফাৎ হয়েছে। সোনালী বং-এ একটু বাদেই প্রেমের লাল বং ধবেছে। এখন আর আসক্তি নাই। বোঁটা আপনিই খসে যাচ্ছে। অতি সহজেই শাঁসটী খোসা এবং আঁটি থেকে আলাদা কবা যাচ্ছে। কি মধুর স্বাদ, কি মিষ্ট গন্ধ এখন। ত্যাগের অমৃতের আস্বাদন পাওয়া যাচ্ছে। অমৃত কেন? আম জানে যে সে অবিনাশী। বীজ রূপেই যে তাব জীবন নিহিত। কাকে ঠুকরিয়ে তাকে ফেলে দিক আর যত্ন ক'রে তাকে নার্সারিতেই লাগাক ফল সমানই। সে জানে যে সে মরতে পারে না। তাই তাব সংশয় নাই, ভয় নাই। এ সবগুলি ঠিক পরে পবে আছে। আবম্ভেব সঙ্গে শেষটা অচ্ছেদ্য বন্ধনে গাঁথা। ভয় কি, বাবা?

"শুধু সাধ হয় ও রাঙ্গা চরণে করিতে জীবন দান"

শিষ্য। বাবা, আপনার আশ্বাস বাক্যই একমাত্র সম্বল। অন্য ভরসা আর কি আছে ? বসে বসে যখন আপনার ধৈর্যের কথা ভাবি, তখন আমার অধৈর্য লজ্জায় সংকুচিত হয়। মোহের বশে এমন সব কুকার্যই করেছি যে আপনার কথা শুনে শুনে যখন মোহের ঘোরটা একটু কেটেছে তখন সেই সব কুকার্যের কথা আপনাকে বলতে গিয়ে কত সংকোচই বোধ হয়েছে। আপনি নির্বিকার ভাবে শুনেছেন। বরং আমার লজ্জা কাটাবার জন্য বলেছেন, "থাক্ থাক্, আর বলতে হবে না। আমি বুঝতে পেরেছি।" এক এক সময়ে মনে হয়েছে আমার মনের সমস্ত কলুষের কথা সবাইকে খুলে বলি ; আমাকে লোকে মন্দ ভাবে ভাবুক ; আপনার মহিমা তো বিঘোষিত হবে। আপনি আমাকে সে বিষয়েও নিবারণ করেছেন। কিন্তু আমি যে কী তা তো আপনার অগোচর নেই। এই অপদার্থের জন্য আপনার এত চেষ্টা, এত শ্রম, এত কষ্ট স্বীকার। এসব কথা যখন ভাবি, তখন মনে হয়, "সত্যিই আপনি অনুপম-সংযম।"

"যবে মনে পড়ে, করুণার ছবি মম দুঃখে ম্রিয়মাণ।
মম পাপ তাপ বহি নিজ শিরে ছটফটি যায় প্রাণ।
দেব কি মানব পরিচয়ে আজ
হেন প্রেমিকের বল কিবা কাজ
শুধু সাধ হয় ও রাঙ্গা চরণে করিতে জীবন দান।"

জন্ম-মৃত্যু

স্বাধ্যায়

শিষ্য। বাবা, বই পড়ে পড়ে মাথা খারাপ হয়ে যায়। সব গণ্ডগোল ঠেকে।

গুরু। তবে বই পড় কেন? না পড়লেই তো পার।

শিষ্য। না পড়ে কবি কি? না পডার চেযে পডা ভাল তো?

গুরু। কেন, পডাব চেয়ে ভাল কিছু নাই বুঝি। স্বাধ্যায় মানে কি? স্মৃতিব জন্যে আবৃত্তি সহকারে অধ্যযন। যদি অধ্যয়ন স্মৃতিব জন্য না হয়, পুনঃ পুনঃ সেটি যদি মনে না ওঠে, তবে আব স্বাধ্যায় হবে কি ক'বে? যেটি শাস্ত্রে পডা হবে সেটিব দ্বাবা জীবন ক্রমাগত শাসিত করা চাই, তবে তো স্বাধ্যায হবে।

শিষ্য। সেইখানেই তো গোলমাল। শাস্ত্রেব নির্দেশ অনুযায়ী চলা যায় না এই জন্যেই তো গণ্ডগোল। শাস্ত্র ভুল, বলতে পারি না। কিন্তু তাব মানেও তো বুঝি না।

গুরু। কেন, কোনটাতে আটকাল?

অজামিলের কথা ও হরিনামের মহিমা

শিষ্য। ধরুন, অজামিলের কথা। সারা জীবন অন্যভাবে কাটাল। মববাব সমযে একবাব ছেলেকে, তাব নাম ধরে ডাকল। ছেলের নাম "নাবায়ণ"। তাতেই উদ্ধাব হযে গেল?

গুরু। এর তাৎপর্যটা কী বল তো? তুমি কি এব মানে এইটে করতে চাও যে গোটা জীবনটা যেমন ভাবে ইচ্ছে কাটাও, মরবার সময়ে একবাব হরিনাম করবে, আর উদ্ধার হয়ে যাবে?

শিষ্য। কেন, শাস্ত্র কি ভুল?

গুরু। প্রথমে দেখ, যদি হবিনাম তোমার জীবন ভোর না ক'রে থাক, তবে মরবাব সময়েই যে হবিনাম কবতে পারবে তারই বা

নিশ্চয়তা কি ? সেই বুড়ীর কথা জান না ? মরবার সময়ে ছেলে, নাতি সবাই মিলে বলছে, "হরি বল"। বুড়ী উত্তর দিলে, "অত কথা বলতে পারব না।" এতগুলি কথা আটকাল না, শুধু 'হরি' বলতেই বেধে গেল। জীবনে যে 'হরি' বললে না, মরণে সে কেমন ক'রে 'হরি' বলবে ?

শিষ্য। তা তো বটেই।

গুরু। যদি বল, তা তো বটেই, তবে কি করা উচিত ? হরিনাম এখনই আরম্ভ করা দরকার নয় কি ? অন্য পক্ষে দেখ, যদি হরিনাম মরণকালে উদ্ধার করতে পারে, তবে কি জীবনকালে পারে না ? মরণকালের হরিনামের মহিমাতে বিশ্বাস হলে, জীবনকালের হরিনামে অবিশ্বাস কেন ? আরও বলছি। অজামিল মৃত্যু আসন্ন দেখে একেবারে নিরুপায় হয়ে নারায়ণকে ডেকেছিল। ঠিক ঐ রকম কাতর হয়ে হরিনাম করা হচ্ছে কি ? নামের পিছনে যে বিষাদযোগ ছিল সে বিষাদযোগের শক্তিতেই নামের মহিমা স্ফুরিত হয়েছে, একথা বললে ভুল বলা হয় কি ?

শিষ্য। না, না, তা বলব কেন ? নামও করি না, কাতরতাও নেই, একথা অস্বীকার করি কি ক'রে ?

গুরু। কেন নাম হয় না, কেন কাতরতা আসে না, আমি ব'লে দোব ? মনে মনে ভেবে দেখ, সত্যিকার কারণটা কি ? অপরকে বলার কোনও দরকার নেই, নিজের মনে নিজেই ভেবে দেখ, মনের গূঢ় অভিপ্রায় এই নয় কি যে সংসারটাকে বেশ বাগিয়ে করা, আর হরিনাম টরিনাম শেষ সময়ে ক'রে বৈকুণ্ঠ লাভ করা। মনটা কেবলই ফাঁকি খুঁজছে। সুবিধাবাদী কিনা কেবল সুবিধার দিকেই দৃষ্টি।

শিষ্য। তবে কি হরিনামের ফল নাই ?

গুরু। না, না, তা বলছি না। হরিনামের মহিমা বোঝাবার জন্যই অজামিলের উপাখ্যান। কিন্তু প্রয়োগে ভুল হচ্ছে যে। ফাঁকি দিয়ে ভগবান লাভের চেষ্টা হচ্ছে যে। এইটি মনে মনে বেশ বিবেচনা ক'রে বোঝ যে, মায়ার সংসারের মিথ্যা জিনিস মিথ্যা আচরণের দ্বারা লাভ করা যেতে পারে। কিন্তু ভগবান সত্যস্বরূপ। তাঁকে পেতে

হলে সত্য আচরণ চাই-ই চাই। মিছে কথা ব'লে টাকা পাওয়া যেতে পারে। ভক্তের ভান ক'রে ভক্তের মান্য পাওয়া যেতে পারে। এই ক'রে ক'রে এমন বদ অভ্যাস হয়ে গিয়েছে যে সেই মিথ্যা আচরণ দ্বারা ভগবানকে পাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু তা হবার নয়। যতটুকুই তাঁর জন্য করা হ'ক,—আর আমরা কতটাই বা তাঁর জন্য করতে পারি,—যাই করি না কেন, তার মধ্যে যেন ফাঁকি না থাকে। তা হলেই ফাঁক পড়বে। সেই ফাঁক দিয়ে ভগবান পালিয়ে যাবেন, ধরা দেবেন না। সে মজার গল্পটা জান না? সেই যে একজন পাকা দাড়িওয়ালা লোক, টিকেট কালেক্টারকে হাফ টিকিট দেখাচ্ছিল। টিকেট কালেক্টার তার পাকা দাড়ি দেখানতে বুড়োটি উত্তর দিলে, "ও দাড়ি তো আমার নয়, ও যে বাবা তারকনাথের দাড়ি।" তারকনাথ ঐ বুড়োর কাছে শব্দ মাত্র। সত্যিকার তারকনাথ জানলে একথা উচ্চারণ করতেই পারত না। যিনি ত্রাণকর্তা তাঁর সামনে বেলেল্লাগিরি করা চলে কি?

"প্রভু মেরে জনম মরণ কী সাথী"

শিষ্য। বাবা, আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। কিন্তু আপনি বলুন মৃত্যুকালে ভগবান লাভ কি মিছে কথা? শ্রীশ্রীঠাকুরও তো বলেছেন, কাশীতে মড়ার কানে স্বয়ং শিব এসে মন্ত্র দেন।

গুরু। এ কথাতে বিশ্বাস আছে কি? তা হলে সবাই কাশীতে গিয়ে আত্মহত্যা করত এবং তখনই পেয়ে যেত।

শিষ্য। আমাদের না হয় বিশ্বাস নেই। কিন্তু ভক্তদের তো বিশ্বাস আছে। তাঁরা এভাবে আত্মহত্যা করেন না কেন?

গুরু। ভক্ত না হলে ভক্তের মনের ভাব বুঝবে কি ক'রে? ভক্ত জানেন এবং বোঝেন যে তাঁর দেহ তাঁর নিজের নয়, সেটি শ্রীভগবানে সমর্পিত। তাঁর আদেশ বিনা ভক্ত সে দেহ নষ্ট করবেন কি ক'রে? শ্রীরাধা বলছেন, "এ দেহে ঠাকুর বিলাস করেছেন। এ দেহে আগুনের অধিকার নেই; যমুনার অধিকার নেই।"

শিষ্য। আমি অবোধ, তাই ভক্তদের সঙ্গে আমাদের তুলনা করেছি। আমাকে ক্ষমা করুন। তাঁদের নামের সঙ্গে আমাদের নাম এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করা চলে না। তবু, বাবা, আপনি যদি অভয় দেন, তবে আর একটি কথা বলি।

গুরু। ঐ একটি কথা বুঝলেই তোমার সব বোঝা হয়ে যাবে তো? আর কিছুই বাকী থাকবে না তো?

শিষ্য। না, বাবা, তা নয়। এখন মনে যেটি উঠছে সেইটিই নিবেদন করতে চাইছি। আচ্ছা, বাবা, হাজরা মহাশয় তো ভক্ত ছিলেন না। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে মালা জপ করতে বারণ করলেন; কিন্তু তিনি সে কথা মানলেন না। সুতরাং তিনি তো ভক্ত ননই তবু শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, "মৃত্যুকালে হবে।"

গুরু। কী হবে ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর হাজরা মহাশয়কে আশীর্বাদ করেছেন ব'লে তোমার মনে হয়?

শিষ্য। কেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন পাবে।

গুরু। কী দর্শন পাবে? তাঁর কেমন দাড়ি, তাঁর কেমন রং, তাই দর্শন হবে?

শিষ্য। না, তা নয়।

গুরু। তবে কি?

শিষ্য। আপনি বলুন, বাবা, আমি শুনি।

গুরু। আচ্ছা, বাবা, তুমি তো জান,

"সন্তান যদ্যপি হয় অসিত বরণ,
প্রসূতির কাছে সেই কষিত কাঞ্চন।"

সন্তান প্রসূতির কাছে কষিত কাঞ্চন কেন? প্রসূতি তাকে রূপ দিয়েছে। অন্যে দেয় নি, তাই সে রূপ দেখতে পায় না। তুমি কি সে গল্প জান না? একজনের একটি কদাকার বেশ্যা ছিল। কি একটা হাঙ্গামা ক'রে সে পুলিশে ধরা পড়েছে। জজসাহেব বেশ্যাটাকে দেখে আসামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটাতে তুমি আসক্ত হলে কি ক'রে?" আসামী উত্তর দিলে, "হুজুর, আপনার চোখ দিয়ে তো একে কুরূপা

দেখছেন। আমার চোখ নিয়ে একে দেখতে পারেন?" বাস্তবিক সন্তানেই যদি রূপ থাকত তবে সবাই তাকে সুন্দর দেখত; শুধু প্রসূতিই তাকে সুন্দর দেখত না। মিষ্টতা কি জলে আছে? না, তৃষ্ণাতে আছে? যদি জলের মিষ্টতা চাও, তবে ছুটোছুটি ক'রে, হাঁপিয়ে, প্রবল তৃষ্ণা জাগাতে হবে। তাই তো শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, "এলে গেলেই হবে।" তিনি রূপ দিয়েছেন, রূপ দেখেছেন। রূপ কি ক'রে দিতে হয় তাঁর কাছ থেকে শিখে নিয়ে রূপ দিতে হবে। সে রূপ অপরূপ। সে মরণের সময়েও অপরূপ, জীবনেতেও অপরূপ। "প্রভু মেরে জনম মরণ কী সাথী। তুঁহুঁ না বিস্মরি দিনরাতি।" শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এক দিন গাইছিলাম, "অন্তে যেন চরণ পাই।" তিনি বললেন, "ওকি কথা! বল্ জ্যান্তে যেন চরণ পাই।" সত্যিই তো যে জিনিসটা এত ভাল যে, তাতে মৃত্যুভয় থাকে না, মরণেতেও শান্তি দেয়, তা থেকে জীবনেতেই বা বঞ্চিত থাকব কেন?

শ্রীভগবান থেকেই উৎপত্তি, তাঁতেই স্থিতি, তাঁতেই লয়

শিষ্য। বাবা, আপনার কথার বিরুদ্ধে কোনও যুক্তিই নাই বটে, কিন্তু—

গুরু। আবার বটে কিন্তু? বল, বল, সুযুক্তি হ'ক, কুযুক্তি হ'ক; সব বল। জান তো "পরিপ্রশ্নেন"। আহা, শ্রীশ্রীঠাকুর বসে বসে রাত ভোর কত কথাই বলেছেন। এখন যদি তিনি তোমাদের রূপ ধ'রে এসে সে কথা শুনতে চান, তবে কোন্ মুখে না বলি বল? তোমার প্রশ্ন বল।

শিষ্য। আমি বলছিলাম যে সাধুরা তো বলেছেন, মরণের ভয় কেন? তাঁদের কথা তো মিথ্যা নয়। মরণে সবাই শ্রীভগবানকে পাবে। শ্রীভগবান থেকেই উৎপত্তি, তাঁতেই স্থিতি, তাঁতেই লয়। তিনি ছাড়া আর কিছুই তো নাই সুতরাং মৃত্যুকালে সবারই হবে।

গুরু। হাঁ, বাবা, রামপ্রসাদ বলছেন, "কেউ বলে ম'লে ভূত প্রেত হব; আমি বলি, ম'লে যা ছিলাম তাই হব।" এ কথা রামপ্রসাদ

বলতে পারেন, অপরের কাছে এ সব কথা, কথার কথা মাত্র। যদি কারু ঠিক ঠিক ধারণা হয়ে থাকে যে, তাঁতে লয় হতেই হবে, কারণ তাঁ ছাড়া আর কিছুই নেই, তবে তো তার সব হয়েই গিয়েছে। তা হলে তার কখনও নিরানন্দ হতে পারে না ; তার মনে কখনও সংশয় আসতে পারে না। মুখে বেশ বলা যায়, বুদ্বুদের সমুদ্রেই উৎপত্তি, সমুদ্রেই স্থিতি, সমুদ্রেই লয়। অতএব বুদ্বুদ গিয়েও যায় না। তার উৎপত্তি, স্থিতি, লয় সবই একটা যাদু-কৌশল মাত্র। সমুদ্র আর বুদ্বুদ ছবিতে দেখে এ ধারণা হবে কি ক'রে? সমুদ্রে গিয়ে, বুদ্বুদ ওঠা, থাকা, ভাঙ্গা—আবার গড়া, আবার আসা, আবার ডোবা, বার বার দেখলে তবে জিনিসটা বোঝা যাবে। এখন মনে বোঝা হয়েছে। তখন মনে প্রাণে বোঝা হবে। মন বুঝেছে, প্রাণ বোঝেনি, একে ঠিক বোঝা বলা যায় না।

শিষ্য।—প্রাণে বোঝার ব্যাপারটা কি, বাবা?

গুরু। যদি প্রাণে কোনও জিনিস বোঝা হয়, তবে প্রতি কার্যে প্রতি আচরণে প্রতি কথায় তার সাক্ষ্য দেবে। কারণ কার্য, আচরণ, কথা সবই প্রাণ শক্তির বিকাশ। যদি মুখে এক রকম বলা হয়, কিন্তু কাজে অন্য রকম করা হয়, তবে প্রাণে বোঝা হয় নি। বাবা, তুমি কি শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শোন নি? "ঠিক মানুষ, তার ঠিক করণ, তার ঠিক লাভ।" কথায়ও বলে, "ধর্ম কর্ম।" ধর্ম তো শুধু বাক্য নয়, কর্মও।

জন্ম মৃত্যু আছেও বটে, নেইও বটে

শিষ্য। আচ্ছা, বাবা, আমরা বুঝি না বুঝি, জন্ম মৃত্যু সত্যই তো নেই। আমরা ধারণা করতে পারি বা না পারি, কথাটা তো আর মিথ্যে নয়।

গুরু। দেখ ঠিক বলতে হলে বলতে হয় যে জন্ম মৃত্যু আছেও বটে, নেইও বটে। এটি হেঁয়ালির মত শোনাচ্ছে, কিন্তু সত্যি কথাটা এই-ই। যাদুকর কতকগুলি টাকা করেছে দেখাচ্ছে। আমরা সহজেই

বুঝতে পারি যে তার যদি টাকা তৈরী করার ক্ষমতা সত্যিই থাকে, তবে আর সে এভাবে এ দুয়ারে ও দুয়ারে ম্যাজিক দেখিয়ে দেখিয়ে টাকা রোজগারের চেষ্টা করছে কেন ? সে টাকা তৈরী করে নি, শুধু দেখাচ্ছে যেন টাকা তৈরী করছে। টাকা তৈরীর ভানটা যত সুষ্ঠুভাবে করছে, ততই ম্যাজিক চমৎকার হচ্ছে, বাবা দেখছে তারা চমৎকৃত হচ্ছে। আর যাঁরা ম্যাজিক জানেন তাঁরাও চমৎকৃত হচ্ছেন। কিন্তু অন্য ভাবে। তাঁরা ভাবছেন, "এঁর হাতের এমন সুন্দর কসরৎ, কতদিন ধরেই সেধেছেন, আমরা তো এতটা সাধি নি", ইত্যাদি। এই জগতের মায়ার ম্যাজিক সংসারীকে একভাবে মোহিত করে সাধুকে অন্যভাবে মোহিত করে। একই জিনিস ঘটছে। সাধুর কাছে এক রকম, সংসারীর কাছে অন্য রকম।

নবাবকন্যা ও ফকিরের উপাখ্যান

শিষ্য। হাঁ, বাবা, এ কথাটি যদিও কঠিন, তবু আমি বেশ বুঝতে পারছি। পাছে আমার অসুবিধা হয় এ জন্যে আপনি কয়েকদিন আগেই যে ফকিরের গল্পটা আমাকে শুনিয়ে রেখেছেন।

গুরু। বল তো, বাবা, আমার এই ঠাকুরের মুখে গল্পটা এখন আর একবার শুনি। আহা, বুড়োমানুষ সমস্ত রাত্রি বসে বসে কত কথাই বলেছেন। একটু হাঁই তোলা নেই। একটু ঝিমুনো নেই। আমার কিন্তু ঘুম আসে। বলছেন, "নম্ভি নে নম্ভি নে। এ সব কথা কোথায় পাবি ?" বাস্তবিক, এ সব কথা কোথায় পাব ? মনে হয় বার বার শুনি। সেই টালারই জল, কিন্তু এ নলে, সে নলে দশ মুখে প্রবাহিত হয়ে আমাকে আপ্লুত করে যে। বল, বাবা, বল।

শিষ্য। বাবা, আপনি যদি আপনার ঠাকুরের কথা এমন ক'রে বলেন, আমি যে আমার ঠাকুরের প্রতি আমার আচরণ ভেবে লজ্জায় মরে যাই। আপনি কী মন নিয়ে আপনার গুরুদেবের কাছে বসতেন আর আমি কী মন নিয়ে আপনার কাছে বসি। তফাৎ তো খানিকটা হবেই,—কিন্তু এতখানি তফাতের লজ্জা আমি সইতে পারি নে যে, বাবা।

গুরু। তোমার তো লজ্জা সয় না, আমারও যে তর সয় না। লজ্জা টজ্জা এখন থাক্, ফকিরের গল্পটা বল।

শিষ্য। একজন ফকির রোজ ভোরবেলা নমাজের পরে আকাশের দিকে চাইতেন। সেই সময়ে সেই দেশের নবাবের পরমা সুন্দরী কন্যাও স্নানান্তে তাঁর চুল শুখাবার জন্য রাজপ্রাসাদের ছাদে বেড়াতেন। কোনও কোনও সময়ে ফকিরের দৃষ্টি সেই কন্যার উপরেও পড়ত। সে দেশের উজির এ কথা জানতে পেরে নবাবকে জানালেন। সে যুগে ফকিরদের খুব মান্য ছিল। ফকিরকে কন্যাদান করা খুব সৌভাগ্যের বিষয় ছিল। নবাব ফকিরের কাছে গিয়ে বিবাহের প্রস্তাব করলেন এবং বললেন, "আপনি তো আমার মেয়েকে দেখেছেন। সে তো আপনার অযোগ্যা নয়।" ফকির বললেন, "সে কী কথা? আমি তোমার মেয়েকে দেখেছি? সে কী কথা?" নবাব আশ্চর্য হয়ে উজিরের দিকে চাইলেন। ফকির মিছে কথা কইছেন? না, উজির মিথ্যাবাদী? উজির তখন বললেন, "দেখুন ফকির সাহেব, আপনি মনে করে দেখুন, কাল ভোর বেলায় আপনি ঐখানে দাঁড়িয়েছিলেন কিনা। প্রায় দশ মিনিট আপনি পূব আকাশের দিকে স্তব্ধ ভাবে চেয়ে রইলেন। তার পরে আবার পাঁচ মিনিট নবাবজাদীকে দেখলেন। তার পরে আবার আকাশের দিকে অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইলেন। আপনার চোখ কর্ কর্ করতে লাগল। জল পড়তে লাগল। এখন মনে পড়েছে?" ফকির সাহেব বললেন, "হাঁ, হাঁ, এখন মনে পড়েছে। নমাজের পর খোদাতাল্লার রূপ বোঝবার জন্য বড় ইচ্ছা করে। নমাজের পর পূব আকাশে লাল, সোনালী কত রংয়ের খেলা দেখি। আর নবাবজাদীকেও দেখি। ভাবি খোদাতাল্লার রূপের একটি কণামাত্র পেয়ে এগুলি এত সুন্দর দেখাচ্ছে। আমার খোদাতাল্লার কত রূপ! তোমার মেয়েকে দেখি না, খোদাতাল্লাকেই দেখি।" আপনি এই গল্পটা ব'লে বুঝিয়েছিলেন এই জগৎ সংসারে একই জিনিস সংসারীর মনে এক তরঙ্গের সৃষ্টি করে সাধুর মনে অন্য তরঙ্গের সৃষ্টি করে।

কিছুই ছিল না, আবার সবই ছিল

গুরু। হাঁ, বাবা, সাধু দেখেন সকাল বেলাতে আকাশে যে রংযের খেলা, সন্ধ্যা বেলাতেও সেই রংযেরই খেলা। কোন্‌টা জন্ম, কোন্‌টা মৃত্যু? সাধুর পক্ষে জন্ম মৃত্যু নাই ব'লে যে সংসারীর পক্ষে জন্ম মৃত্যু নাই, এমন নয়। বাবা, তুমি আমাকে যেমন গল্প শোনালে, আমিও তোমাকে তেমনি একটা গল্প শোনাই। দুটি লোক একটি ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। ঘরটি অন্ধকার। কিছুই নাই ব'লে মনে হচ্ছে। খানিকক্ষণ বাদে যখন ক্ষুদ্র একটি ছিদ্র পথ দিয়ে ক্ষীণ আলোকরশ্মি এসেছে তখন দেখা যাচ্ছে যে, না, ঘরে কিছুই নাই এমন নয়, অনেক কিছুই আছে। খাট, বিছানা, চেয়ার, টেবিল, কত কি আছে। একজন লোক ঐ সব জিনিস দেখে ঐ সবই নাড়াচাড়া করতে লাগল। অপর লোকটি ভাবলে, "বা রে, এতো বেশ মজা! কিছুই ছিল না, আবার সবই আছে। অন্ধকারে কিছুই নাই মনে হয়, আলোতে সবই আছে ব'লে মনে হয়। একটু ছিদ্র দিয়ে একটুখানি আলো এসেছে, তাতেই এত তফাৎ!" সে খাট, টেবিল ইত্যাদি ফেলে সেই ছিদ্রের কাছে এল, যদি আলোর রহস্যটা বোঝা যায়। যেই ছিদ্রটা আর একটু বড় করেছে অমনি আরও আলো এসেছে। তার তখন মনে হচ্ছে যে দেওয়াল ভেঙ্গে ফেলে কক্ষটি আলোকে আলোকময় ক'রে ফেলে। তা মনে করছে বটে কিন্তু যেই ছিদ্রটা তার বেরুবার মত বড় হয়েছে তখন ঘর আলোকিত হল কি না হল তা না দেখে একেবারে বাইরে এসেছে। এসে দেখে কত আলো। ক্রমে আলোর উৎপত্তিস্থলে গিয়েছে। গিয়ে দেখে সেখানে একটি প্রকাণ্ড টর্চ (torch)। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দেখতে পেল যে ব্যাটারীটা (battery) একবার ক'রে বালবের (bulb) সঙ্গে লাগছে, আলোটা জ্বলছে। খানিকক্ষণ বাদে ব্যাটারীটা আলাদা হয়ে রয়েছে। তখন আলো জ্বলছে না। কিন্তু আলো জ্বালাবার সব শক্তিই তাতে বজায় রয়েছে। এটি বুঝতে পেরেছ?

শিষ্য। হাঁ, বাবা, ব্রহ্মের একবার নিষ্ক্রিয় অবস্থা। একবার

সক্রিয় অবস্থা। শক্তি নাই তা নয়, তবে শক্তিটা প্রকাশ করছেন না। আবার শক্তির প্রকাশ যেমন শক্তির পরিচয়, শক্তির অপ্রকাশও তেমনি শক্তির পরিচয়। সর্বশক্তিমান কি না, শক্তি প্রকাশও করতে পারেন, অপ্রকাশও রাখতে পারেন।

"ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি"

গুরু। হাঁ, বাবা, আরও বল।

শিষ্য। যে লোকটি এই রহস্য বুঝতে পেরেছে সে টর্চের কাছেও থাকতে পারে, ঘরেও থাকতে পারে। কিন্তু ঘরে ফিরে গেলেও সে ঘরের অপর লোকটির মত ঘরে থাকবে না। সে জানবে এবং বুঝবে যে তার ঘরের সব কিছুই সেই আলোরই প্রকাশ মাত্র। তার নিজের কিছুই নাই। অপর লোকটি কিন্তু মনে করছে, সবই তার নিজের। আলো না থাকলেই সে বুঝবে যে তার সব গেল। আলোক-রাজ্য থেকে প্রত্যাগত লোকটি বুঝবে যা ছিল, তাই-ই আছে। কিছুই হয় নি, কিছুই যায়ও নি। আচ্ছা, বাবা, দু'জনের দু'রকম কেন হল? একজন বুঝলে যে তার ক্ষুদ্র চৈতন্য সত্তাতে যখন এতটা প্রতিভাত হয়েছে তখন চৈতন্য সত্তার সন্ধানেই জীবনপাত করা উচিত। আসক্তির প্রতিবন্ধক সে ভেঙ্গে ফেলে অগ্রসর হল। আর একজন বুঝতেই পারল না যে, "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।" কেন, এমনটা হল?

গুরু। জলে থেকে মাছ কি ক'রে বুঝবে যে জল কী? জল থেকে ডাঙায় গিয়ে ফের জলে এলে তবে তো বুঝবে জল কী? এ সবই সম্ভোগের জন্য। সে যা চায়, সে তাই পায়। কেউ মায়া দ্বারা মোহিত হতে চায়। কারু বা মায়াকে মোহিত করাই সাধ।

পূর্ণ জ্ঞান পূর্ণ ভক্তি এরই

শিষ্য। আচ্ছা, যিনি মায়ার ব্যাপারটা বুঝেছেন, তিনি আবার মায়ার মধ্যে থাকেন কেন?

গুরু। শিব মদন ভস্ম করেছিলেন। কৃষ্ণ তা কিন্তু করেন নি।

তিনি মদনকে মোহন করেছিলেন। ভাগবতকার তাঁকে বলেছেন, "সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ।" কিন্তু তিনি সংসারে এসেও সংসারীর মতন সংসার করেন না। তিনি ভক্তি, ভক্ত নিয়ে থাকেন। পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ ভক্তি একই। নিষ্ক্রিয় আর সক্রিয় ব্রহ্ম। দেখ বাবা, গান যিনি জানেন, তাঁকে কি সব সময়েই গাইতে হবে? তিনি গান গাইতেও পারেন, চুপ ক'রেও থাকতে পারেন। দুটিই তাঁরই অবস্থা। তফাতের মতন দেখাচ্ছে, কিন্তু সত্যিই তফাৎ নয়।

শিষ্য। বাবা, এ অবস্থা কি সাধারণ জীবের হয়?

গুরু। কেন হবে না? কেউ কিছু কম পায় নি। তবে সবাই সমান ভাবে ব্যবহার করে না। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক জগৎ। এখানে যে শুধু তমঃ আছে তা নয়, রজঃ আছে, সত্ত্বও আছে। কিন্তু এখানে অহং বুদ্ধি আছে। তাই মন, লিঙ্গ গুহ্য নাভি থেকে উপরে যায় না। এখানেও সৎকর্ম, সদাচার, সদালাপ সবই আছে। দান, পরোপকার এ সবই আছে। কিন্তু আমি দান করছি, আমি পরোপকার করছি, এই ভাবটা যায় না। এ সত্ত্ব বিশুদ্ধ সত্ত্ব নয়। এই সত্ত্বের তমঃ আছে। যথা,—"আমি কি ভগবানের পাকা ধানে মই দিয়েছি যে আমি তাঁকে পাব না? ধ্রুব, প্রহ্লাদ তাঁর ছেলে, আমি বুঝি কেউ নই? কালী, এবার তোমায় খাব।" আবার এই সত্ত্বের রজঃও আছে। যেমন, "আমি তাঁর সেবা করব। আমি অর্চনা করব ইত্যাদি, ইত্যাদি।" এই সত্ত্বের সত্ত্ব, বিশুদ্ধ সত্ত্ব। সেখানে অহং একেবারে নাই। মন তখন লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি থেকে হৃদয়দেশে উঠেছে। ঈশ্বর দর্শন হয়েছে। তখন আর সংশয় নাই; হৃদয়ের গ্রন্থি ভেদ হয়েছে। তার পরেকার সংসার, লিঙ্গ গুহ্য নাভির সংসার বা ধন জন মানের সংসার তো নয়। এই অবস্থাতে জন্ম মৃত্যু নাই, কর্মফল নাই, কর্মের বন্ধন নাই। সাধারণ সংসারীর কিন্তু এ সবই আছে। সে যদি ভগবানকে বাদও দেয়, এগুলিকে বাদ দিতে পারবে না। কারণ তাকেও বিবেক স্বীকার করতে হবে। ভালটা মন্দটা যে আছে সে কথা মানতে হবে। সে নিজের ইচ্ছায় আসে নি, নিজের

ইচ্ছায় যাবেও না,—এটি তাকে মানতেই হবে। সেই অদৃশ্য শক্তির অভিপ্রায় সে বুঝতে পারে না বটে কিন্তু সেই অদৃশ্য শক্তিকে সে অস্বীকার করতে পারে না। তার সবেতেই সংশয়। কর্মফল নেই এ কথা সে জোর ক'রে বলতে পারে না। কি ক'রে জন্ম হল সে যখন জানে না, তখন মৃত্যুর পরে কি হবে তাই বা সে কেমন ক'রে নিঃসংশয়ে জানবে? কিন্তু যে চায় সে এই সব সন্দেহের পারে যেতে পারে।

"অসতো মা সদ্গময় ; মৃত্যোর্মাঽমৃতংগময়"

শিষ্য। বাবা, আপনার কথা তো সবই সত্যি। কিন্তু আমাদের ধারণা হয় কই? সংশয় কাটাতে পারি নে, মায়ার পারে যেতে পারি নে।

গুরু। কেন, মায়ার চেয়ে মায়াধীশ বড নন? মৃত্যুর চেয়ে জীবন বড নয়? অসতের চেয়ে সৎ বড় নয়?

শিষ্য। বাবা, আপনি বলেন সৎ-এর ক্ষমতাই বেশী, অসতের ক্ষমতা কম। শাস্ত্রেও ঐ কথাই আছে। আপনি শাস্ত্র বহির্ভূত কথা বলবেনই বা কেন? কিন্তু এ যে কলিকাল এ যুগে সৎ-এর ক্ষমতা কম, অসতের ক্ষমতাই বেশী।

গুরু। কেন, বল তো?

শিষ্য। এই দেখুন না, আপনি ক্রমাগত সদসৎ বিচারের কথা বলছেন। যাবতীয় আসক্তির জিনিস বাস্তবিকই অসৎ; ওগুলি থাকবে না। আর আপনি যা বলছেন তাই তো সৎ। আবহমান কাল থেকে ঐ কথাই নানা দেশে, নানা যুগে, নানা মহাপুরুষ নানা শিষ্যকে নানা প্রসঙ্গে বলেছেন। সৎ অমৃত; অসৎ মৃত্যু। এ কথা বৈদিক যুগ থেকেই চ'লে আসছে। "অসতো মা সদগময় ; মৃত্যোর্মাঽমৃতংগময়।" এ প্রার্থনা শুধু গানেই রইল, প্রাণে হল কই?

গুরু। না, বাবা, তুমি এ রকম বলবে কেন? তুমি নিজেকে হীন মনে কর কেন? আচ্ছা, ভেবে দেখ তোমার ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে কেবল তোমাকে অসৎ শেখান হয়েছে। "লেখাপড়া করে যেই, গাড়ী

ঘোড়া চড়ে সেই," এই কথাই শোনান হয়েছে। লেখা পড়ার যে অন্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে, গাড়ী ঘোড়ার চেয়েও যে ভাল জিনিস থাকতে পারে, তার দিকে তোমার দৃষ্টিও দিতে দেওয়া হয় নি,—ভাবনা তো দূরের কথা। দিদিমা বললেন, "তোর একটা রাঙ্গা বৌ এনে দেব।" কথা বার্তা, কাজ কর্ম, সবেতেই অসতে আসক্তি জন্মাবার সাধনা চলেছে। সে এমন সাধনা যে অসতের সঙ্গ থেকে একটুও আলাদা হতে দেয় নি। সাধুরা সব পাগল, না হয় ভণ্ড। কিন্তু যদি একজনও সত্যিকার সাধু না থাকেন, তবে ভণ্ড সাধু চলত কি ক'রে? আসল টাকা যদি একটিও না থাকে তবে মেকি টাকা অচল। কিন্তু সে দিকে মনই দিতে দেওয়া হয় নি। এমন নিরন্তর, ঐকান্তিক সাধনা,—সাধনাতে এমনই পাকা হয়ে যাওয়া যায় যে সাধনা করেছি ব'লে মনেই হয় না। আচ্ছা, বাবা, তুমি ভেবে দেখ এই ভাবে কেউ সাধুর কথা শোনে কি? সৎ-এর সঙ্গ করে কি? সব কাজ কর্ম সেরে যদি অবসর হয়, তবে একটুক্ষণের জন্য সাধুর কাছে আসে। তখনও যথেষ্ট পিছটান। অসতের কত কথাই মনে হচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বসে থাকতে থাকতে একটি ভদ্রলোক হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, আপনি তো বললেন যে, ভগবান অবতার হয়ে আসেন। তিনি এখানে এলে বৈকুণ্ঠের কি দশা হয়?" শ্রীশ্রীঠাকুর হেঁসে বললেন, "এই তুমি বাড়ী ছেড়ে এসেছ; তোমার বাড়ীর যেমন দশা, এই রকম আর কি?" "নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।"

শিষ্য। হাঁ, বাবা, আপনি ঠিকই বলেছেন। অসতের সঙ্গ আমরা যতদূর নিষ্ঠার সঙ্গে নিবিড়ভাবে করি, সৎ-এর বেলায় তার কিছুই করি না। হাঁ, বাবা, মদালসার উপাখ্যানে বলা আছে যে রাণী মদালসা এক একটি পুত্র জন্মাবামাত্র তাকে দোলনায় দোল দেবার সময় থেকে তার স্বরূপ তাকে বোঝাতেন; তার ফলে প্রাপ্তবয়স্ক হলেই সে সন্ন্যাসী হয়ে যেত। রাজা বেগতিক দেখে একটি ছেলে নিজের অভিপ্রায় অনুযায়ী লালন পালন করলেন। রাণীকে দিলেন না। সেটি বড় হয়ে সংসারী হল; বহু দুঃখ পেল। সে অলর্ক অর্থাৎ পাগলা কুকুর।

আমরাও পাগলা কুকুরের মত,—উদ্দেশ্যবিহীন কেবল ঘেউ ঘেউ করি, কেন যে করি, জানি না। শুকনো হাড় চিবাই, নিজের মুখের রস নিজেই খাই, আর ভাবি যে হাড়ের রস খাচ্ছি। এ মোহ যে কী, তাই ভাবি। কবেই যে মোহ মুক্ত হব!

গুরু। বাবা, পাহাড়ে যতক্ষণ চিড় না ধরে ততক্ষণই ভাবনা। যদি একবার চিড় ধরে, তবে তার মধ্যে জল সেঁধিয়ে সেঁধিয়ে পাহাড় দুই ফাঁক ক'রে দেয়। কামনা বাসনা যে খারাপ, এ কথা ঠিক ঠিক মনে হ'লে, কামনা বাসনা যাবেই যাবে। গাছের শিকড় কেটে দিলে ডাল পাতা ফুল ফল সেই রকমই তখন থাকে বটে, কিন্তু কতক্ষণ? রস পাচ্ছে না, শুকিয়ে যাবেই যাবে। হাওয়া এলে পড়ে যাবেই যাবে।

আসক্তি ছাড়তে পারছি না, না চাইছি না

শিষ্য। গীতাতে শ্রীভগবান বারে বারে বলছেন, মৃত্যু সংসার-পথ, মৃত্যু সংসার-সাগর। কামনা বাসনাই সংসার, কামনা বাসনাই মৃত্যু। মৃত্যু ভয়ে সবাই অশান্ত। এ থেকে অব্যাহতি কে না চায়? শান্তি কে না চায়?

গুরু। শান্তি মুখে চাইছে, মনে হয়তো অন্য কিছু চাইছে।

শিষ্য। তা কেমন ক'রে হবে, বাবা?

গুরু। তবে সেদিনকার একটি ঘটনা বলি শোন। একটি ভদ্রলোক এসেছেন, বলছেন, "কোথায় শান্তি পাই?" আমি বললুম, "কেন, এখনই আপনাকে শান্তি দিতে পারি।" ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে চাইলেন। আমি বললুম, "দেখুন, আপনার যে দুটি ছেলে আছে, সে দুটিকে আমি এখনই মেরে ফেলব। তা হলেই আপনার শান্তি হবে।" ভদ্রলোক আঁতকে উঠলেন। তখন আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললুম, "দেখুন, আপনি শান্তির চেয়ে বড় জিনিস পেয়েছেন। সুতরাং শান্তি তো আপনি চাইছেন না।"

শিষ্য। বাবা, আমাদের মনে যে এত রকমের প্যাঁচ আছে তা তো জানতুমই না। কত শাস্ত্রই তো পড়েছি। মনের প্যাঁচ এভাবে কোথাও দেখালো নাই তো!

গুরু। না, বাবা, তা নয়। শাস্ত্র মানে কি ? কোনও গুরু তাঁর কোনও শিষ্যকে যে উপদেশ দিয়েছেন, তাই শাস্ত্র। স্থান কাল পাত্র ভেদে উপদেশ বিভিন্ন তো হবেই। সেগুলির প্রয়োগ জানা চাই। ডাক্তারখানায় যা আছে সবই তো ওষুধ। কিন্তু সে ওষুধের প্রয়োগ বিধি আমি জানি না। ডাক্তার জানেন। তাই ডাক্তারের নির্দেশ মত ওষুধ না খেলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

শিষ্য। বাবা, আমি যে অজ্ঞান। আমি কি তত্ত্বজ্ঞ যে আমার এ ধারণা হবে ?

গুরু। কেন, তুমি কি তত্ত্বজ্ঞ নও ? তত্ত্বজ্ঞান মানে ব্রহ্মজ্ঞান না ব'লে যদি অন্য মানে করি ? যদি বলি তত্ত্বজ্ঞান মানে যেটা যা, তার সম্বন্ধে ঠিক সেই জ্ঞান ? সংসার কী তা তুমি কি জান না ? এতটা বয়স হয়েছে, অসতের দাগা বিস্তর খেয়েছে, অসতে যে জ্বলুনি, তা কি তুমি জান না ? তোমার কি এখনও মনে হয় যে অসতে সুবিধে করা যায় ? তোমার আরও বেশী টাকা থাকলেই কি সুবিধে হত ? তোমার থেকে বেশী টাকা আছে, এমন বিস্তর লোক সংসারে রয়েছে। তারাই বা কি সুখে আছে ? অসতের স্বরূপ বুঝেছ বই কি। আবার অন্য পক্ষে ভগবান যে ভাল জিনিস তাও বুঝেছ বৈকি। নইলে শ্রীশ্রীঠাকুর-বাড়ীতে এসেছ কেন ? এটা অবশ্য বলতে পার যে সংসার কতটা খারাপ, আর ভগবান কতটা ভাল, তা বুঝতে পার নি। তা হলে অসতের আসক্তি ছেড়ে ভগবানকেই জড়িয়ে থাকতে। এখন মনে হচ্ছে যে, সংসারটা হাতের পাঁচ, উটি থাকুক আর সেই সঙ্গে ভগবান লাভও হয়ে যাক। "যে যেমন জানে ব্যান" ব'লে, একটা হাত চেপে নাচার অভিনয় করছ। দু হাত তুলে জয়ধ্বনি দিয়ে, সত্যি সত্যি নাচতে পারছ না। "বাবা সব পেঁচি মাতাল, বুচকি আগাল, কিনছে সুরা আনা আনা। তুই পাঁচ সিকের বোতল কিনে মালটি টেনে ধুলোয় গড়াগড়ি দে না।"

শিষ্য। বাবা, আপনি এত ক'রে বলেন কিন্তু পারি কই ? আসক্তি ছাড়তে পারি কই ?

গুরু। পারছ না, না, চাইছ না? ভক্তপ্রবর গিরিশবাবুর কথা মনে কর। তিনি শেখাচ্ছেন যে মনে মনে প্রিয়ের মুখে ছাই দাও। মনে মনে ছাই দিতেই আঁতকে উঠি, কেমন ক'রে বলি ছাড়তে চাইছি, কিন্তু ছাড়তে পারছি না?

শিষ্য। বাবা, সবার তেজ কি সমান হবে? শাস্ত্রেও তো আছে যে মুক্ত পুরুষদেরও প্রারব্ধ কর্ম ক্ষয় করতে হয়।

গুরু। এ তোমার বই পড়া বিদ্যা। যদি কেউ মুক্তই হলেন, তবে তাঁর প্রারব্ধ-টারব্ধর কথা কেন?

শিষ্য। তা নইলে শরীরটা চ'লে যেত যে। প্রারব্ধ ক্ষয়ের জন্যই তো দেহ থাকে।

গুরু। এ বুঝি second class নিকৃষ্ট মুক্তি? আর বিদেহ মুক্তি বুঝি first class উৎকৃষ্ট মুক্তি? তবে বুঝি আমরা শুধু second class নিকৃষ্ট মুক্তদের কাছ থেকেই উপদেশ পাই, তাঁদের কাজ কর্ম, আচার ব্যবহার দেখি, তাঁদের কথা বার্তা শুনি? আর first class উৎকৃষ্ট মুক্তরা জগতের কোনও উপকারেই আসেন না, বুঝি? তবে তো first class উৎকৃষ্টের চেয়ে second class নিকৃষ্টই আমাদের কাছে ভাল।

অকর্তা জ্ঞান ও কর্ম বন্ধন ক্ষয়

শিষ্য। বাবা, আমি কিছু বুঝতে পারছি না; আপনি বুঝিয়ে দিন।

গুরু। কর্ম কর্তার সঙ্গে বাঁধা। যে মুহূর্তে অকর্তা জ্ঞান হয়, সেই মুহূর্তে কর্ম বন্ধন খসে যায়। কর্ম বন্ধন খসে যায় বলছি, কর্ম খসে যায় বলি নি। তখনও কর্ম থাকে, কিন্তু বন্ধন থাকে না। সাপের মুখে বিষ আছে কিন্তু তাতে সাপের কোনও অনিষ্ট হয় না। যিনি জীবন মরণের রহস্য বুঝতে পেরেছেন, তিনি যুগপৎ জীবিত ও মৃত। সেই মুক্ত পুরুষ খেলা করেন, কিন্তু তিনি লিপ্ত হন না। তাঁর যে বেলেখেলা। তিনি চোর হন না। খুব ছোট ছোট ছেলেদের

যেমন বেলেখেলা, তারা চোর হয়েও চোর হয় না, তিনিও তেমনিই। তবে তিনি বালকবৎ, সত্যি সত্যি বালক নন। তাঁর কিছুতেই আঁট নেই, এই হিসেবে তিনি বালক। কিন্তু তিনি অসংলগ্ন কথা বলেন না বা অনুচিত কাজ করেন না। আভ্যন্তরিক সত্তাতে তাঁর কিছুই নেই ; ব্যবহারিক সত্তাতে তাঁর ভাল মন্দ, উচিত অনুচিত, কার্য অকার্য সবই আছে। বাবা, শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, হাতীও নারায়ণ, মাহুতও নারায়ণ। কিন্তু তিনি মাহুত নারায়ণের কথাই শুনতে বলেছেন। তিনি বোঝাচ্ছেন, যে নারায়ণ সংসারের মদমত্ত হাতীর কাছ থেকে সরে আসতে বলছেন, সেই নারায়ণের কথাই শুনতে হবে।

শিষ্য। কে মাহুত, কে হাতী বুঝি কি ক'রে? আমাদের তত্ত্বজ্ঞানের অভাবের কথা আপনাকে তো আগেই বলেছি। চঞ্চলা প্রকৃতিই বা কে? অচঞ্চল পুরুষই বা কে? কিছুই জানি না. কিছুই বুঝি না। এ কথা তো আপনাকে পূর্বেই নিবেদন করেছি।

সূক্ষ্ম বিষয়ে ধারণা হবার আগে স্থূল বিষয়ে ধারণা চাই

গুরু। আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি যে তুমি জান বই কি। প্রকৃতি চঞ্চলা কেন? প্রকৃতি হাত নেড়ে নেড়ে বারণ করছেন, "ওরে, এদিকে আসিস না, আসিস না।" আবার বোঝাচ্ছেন একটা আঙুল নাড়ালে কতগুলি আঙুল দেখায়। একই বহু। স্থিরতা একটা অবস্থা, চঞ্চলতা আর একটা অবস্থা ; স্থিরতায় এক, চঞ্চলতায় বহু। এ থেকে কি এই মনে হয় না যে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, এ কথা না ব'লে ব্রহ্মও সত্য, জগৎও সত্য এ কথাই বলা উচিত? দুই-ই এক বটে কিন্তু ব্যবহারিক সত্ত্বাতে তফাৎ। শ্রীশ্রীঠাকুর বুঝিয়েছেন জল মাত্রেই নারায়ণ, কিন্তু সব জল খাওয়া যায় না ; হাতীর বাইরের দাঁতটা দেখাবার জন্য, ভিতরের দাঁত খাওয়ার জন্য। আমার পরিচিত সেই ভদ্রলোকটির কথা তোমায় বলি নি? তিনি গোলাম পালোয়ানের ছবি উপরে এবং তার নীচে শ্রীশ্রীঠাকুরের

ছবি তাঁর ঘরে টাঙ্গিয়ে রেখেছেন দেখে আমি আপত্তি করেছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, "তুমি না ঠাকুর বাড়ী যাও শুনি? সেখানে বুঝি এই জ্ঞান পেয়েছ? বরং তুমি আমার কাছে এস, আমি তোমাকে বুঝিয়ে দেব গোলাম পালোয়ানও যা ঠাকুরও তাই, সব একই।" আমি হেঁসে বললুম, "আচ্ছা ভাই, বল, বাবা যা মাও তাই?" তিনি উত্তর দিলেন, "হাঁ, নিশ্চয়ই। এটা বুঝতে পার না?" আমি তখন জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমার মাও যা তোমার স্ত্রীও তাই?" ভদ্রলোক কোনও উত্তর না দিয়ে তখনই গোলাম পালোয়ানের ছবিটা নামিয়ে নিলেন।

শিষ্য। হাঁ, বাবা, আপনি একদিন এই রকমের আর একটি দৃষ্টান্তও দিয়েছিলেন।

গুরু। কোনটি বল তো?

শিষ্য। ঐ যে একজন রাজা গুরুদেবের কাছে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" শুনে নিজের প্রাপ্তবয়স্কা কন্যাতে আসক্ত হলেন। এবং রাণীর কাছে বললেন, "গুরুদেব বুঝিয়েছেন এতে কোনও দোষ নেই।" রাণী বিপদ বুঝে গুরুদেবকে আনালেন এবং তাঁর আদেশ মত সোনার থালে ক'রে রাজার অন্ন ব্যঞ্জনের সঙ্গে চুল, নখ, মূত্র, বিষ্ঠা এই সবও রেখে দিলেন। রাজা খেতে বসেই আঁতকে উঠেছেন। গুরুদেব তখন বললেন, "তোমার যখন সবেতেই সমদৃষ্টি, তখন এগুলিও খেতে হবে বই কি।"

গুরু। হাঁ, ঠিক কথা। যাঁর অদ্বৈত জ্ঞান হয়েছে, তিনি কি নীতি বিগর্হিত কাজ কিছু করতে পারেন? কোন্ মহাপুরুষ কোন্ দুর্নীতির কাজ কোন্ কালে করেছেন? যারা দুর্নীতিপরায়ণ, তারাই শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে তাদের দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে চায়। সয়তান বাইবেলের নজির দেখায়। শ্রীশ্রীঠাকুর কি চমৎকার কথাই বলেছেন। "ওরে, ওসব অদ্বৈত জ্ঞান ট্যান থাক। শুধু জেণ্ট্‌ল্‌ম্যান্ (gentleman) হ।" রামছাগলে চড়তে পারে না, হাতী চড়তে চায়। সে সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম জিনিস, তার বিষয়ে ধারণা হবার আগে স্থূল বিষয়ে ধারণা চাই

তো। কই, স্থূল বিষয়ে ধারণাই বা কই? কে না জানে মরতে হবে? মলে তারাই গোবর জল ছড়া দেবে, যাদের আমি গোলাপ জল আজীবন দিয়ে এসেছি। কেউ ভাববে না যে আমার নিজের কি হবে; আমাকে কিন্তু খাবি খাওয়ার সময়েও শুনতে হবে, "ওগো, আমার কি ক'রে গেলে গো?" আমার ছেলের গলাতে চাবি উঠবে। আমার জন্য আলোচাল চটকান পিণ্ডি জুটবে। এ দিকে বিষয় আশয় যদি কিছু রেখে যাই, তা নিয়ে লাঠালাঠি বাধবে, উকিল ব্যারিষ্টারদের ভোগে লাগবে। এই তো সংসার। এ আবার মানুষে সাধ ক'রে করে? আবার বলে, আমি ভারি বুদ্ধিমান। এ বিষয়েই ধারণা হল না, ব্রহ্মজ্ঞান তো ঢের পরের কথা।

"যেনাহং নামৃতঃ স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্"

শিষ্য। বাবা, অসতের প্রতি আসক্তি কাটিয়ে দিন। সেটি না কাটলে জন্ম মৃত্যুর রহস্য ভেদ হবে না, শাস্ত্রেও তো এই কথাই বহু স্থানে নানা প্রসঙ্গে আছে।

গুরু। তুমি তো শাস্ত্র ভালবাস। শাস্ত্রবাক্য প্রতিপালন কর। আসক্তি কাটাও।

শিষ্য। তা পারি না বলেই তো আপনাকে বলছি যে আসক্তি ঘুচিয়ে দিন।

গুরু। আচ্ছা, বাবা, তুমি যখন সংসারে আসক্ত হয়েছিলে, তখন কি কারু কাছে প্রার্থনা করেছিলে যে সংসারে আসক্ত করিয়ে দিন? ধর, যখন বিবাহ ক'রে স্ত্রীকে নিয়ে এলে, তখন তাঁর কাছে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করেছিলে কি যে "তোমার প্রতি আমার ভালবাসা গজিয়ে দাও?" মন চেয়েছিল, আসক্ত হয়েছিলে। এখন মন চাইলেই আসক্তি যাবে।

শিষ্য। কেন মনটা চায় না, বাবা?

গুরু। মনটাকে অনেক দিন ধ'রে নাই দেওয়া হয়েছে। এখন পাগলা কুকুরটা মাথায় উঠে বসেছে। চাবুক লাগিয়ে ওটাকে নামাতে

হবে। ক্রমাগত ভাব,—তাই তো, আমি নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করি, যদি কেউ আমার নির্বুদ্ধিতার ইঙ্গিত মাত্র করে আমি ভীষণ রেগে যাই; কিন্তু আমার বুদ্ধি কই? এ আমি কী করছি? দশজনে যা করছে, আমিও যদি তাই-ই করি, তবে দশজনের জন্য সংসার যে ব্যবস্থা করছে, আমার জন্যেও সেই ব্যবস্থাই করবে। জন্মাব, ঘর বাড়ী করব, ছেলেপুলে হবে, মরে যাব।—জীবন কি মাত্র এইটুকু? তা হলে পশুতে মানুষেতে তফাৎ কি? আমি অমৃত, একথা না বুঝলে মনুষ্য জন্ম বৃথা। 'যেনাহং নামৃতঃ স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্?' বৈদিক যুগ থেকেই ব্রহ্মবাদীদের এ প্রার্থনা চ'লে আসছে। এটি কি আমাদের প্রাণে ধ্বনিত হবে না? এই রকম ভাবতে ভাবতে মনটা ব্যাকুল হবে। তার পরেই 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ', হৃদয়ের গ্রন্থি ভেদ হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয়—জন্ম মৃত্যু সম্বন্ধে সংশয় তো বটেই।

তাঁকে বুঝলেই জন্ম-মৃত্যুর রহস্য ভেদ হবে

শিষ্য। আচ্ছা, এ সব ভুল ধারণা যাবে কি ক'রে?

গুরু। ভুল বুঝলেই যাবে। দেখ, লৌকিক ভাবেও দেখ, তুমি মারা যাওয়ার পরে তোমার ছেলে তোমার নাম উল্লেখের পূর্বে ৺ঈশ্বর বসাবে। অর্থাৎ তুমি ৺ঈশ্বর হয়েছ। আচ্ছা, যদি তাই-ই হয় তবে তোমার ছেলে আলোচাল চটকে দেয় কেন—যা প্রেতেও খেতে পারে না? শ্মশানে একবার সেই আলোচালের শ্রাদ্ধ করা হল। তাতে তুমি উদ্ধার হলে না। অশৌচান্তে পুনর্বার তোমাকে তিল আলোচাল খেতে হল। এমন কি তখনও তোমার উদ্ধার নাই। তার পরে গয়াতে তোমার পিণ্ড দেওয়া হল। তখনও হল না। বছর বছর তোমাকে সেই পিণ্ড খাবার জন্য আহ্বান করা হল। তোমার কিছুতেই উদ্ধার নেই। এ কী বল তো। আমি তো বুঝতে পারি না।

শিষ্য। আচ্ছা, বাবা, আপনিই বলুন যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের মাতৃবিয়োগ

হলে তিনিও দশটাকা দিযে রামলালঠাকুরকে ব্রাহ্মণভোজন করাতে বলেছিলেন। তিনি সবাইকে শ্রাদ্ধান্ন খেতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু তাঁকেও ব্রাহ্মণভোজন করাতে হয়েছে। আমরা তো কোন্ ছার।

গুরু। তিনি যদি উটি না করতেন তবে তাঁকে আমরা এত অদ্ভুত মনে করতাম যে তাঁর জীবন অনুযায়ী আমাদের জীবনও যে গঠিত করতে হবে সে কথা কল্পনাতেও আমাদের মনে স্থান পেত না। তাঁর এই আপাতবিরুদ্ধ আচরণ কি শ্রীভগবানের গীতার বাণীরই পুনরুক্তি নয়? "অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন" (হে অর্জুন, আমিই জীবন এবং মৃত্যুস্বরূপ; আমিই সৎ এবং অসৎ; ৯।১৯) একবার বলছেন "মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্" (আমিই সর্বহর মৃত্যু; ১০।৩৪) আবার বলছেন, "প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্য" (আমিই অমৃতের প্রতিষ্ঠা স্বরূপ; ১৪।২৭) বাস্তবিক তাঁকে বুঝলেই জন্ম-মৃত্যুর রহস্য ভেদ হবে,—তার আগে নয়।

শিষ্য। বাবা, এ সব তো কতই পড়েছি,—কতই শুনেছি। গীতাতে শ্রীভগবান তো স্পষ্টই বলেছেন ঃ

"অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥" (১৩।২৫)

যাঁরা ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ অথবা কর্মযোগের দ্বারা আত্মদর্শনের কথা জানেন না তাঁরাও অন্যের নিকট থেকে শুনে উপাসনা করেন। এবং শুনতে শুনতে মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে থাকেন।

কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী,—মনের দুটি রূপ

গুরু। এ 'অন্য' কিন্তু যে কেউ হলে হবে না। যাঁর আত্মদর্শন হয়েছে তাঁর উপদেশ শুনলে হবে। অন্য কারু কথাতে হবে না। যাজ্ঞবল্ক্যের উপাখ্যানেরও এই-ই উপদেশ। যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রী—কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী। কাত্যায়নী ভোগসুখে রতা। মৈত্রেয়ী গৃহকার্যে উদাসিনী; সর্বদাই স্বামীর কাছে বসে বসে ব্রহ্মবিদ্যা শোনেন।

অবশেষে যাজ্ঞবল্ক্য যখন সংসার ছেড়ে চ'লে যাবেন তখন তাঁর সব সম্পত্তি সমান দুই ভাগে ভাগ ক'রে এক ভাগ কাত্যায়নীকে আর এক ভাগ মৈত্রেয়ীকে দিলেন। কাত্যায়নীব মনে ভয ছিল যে তিনি স্বামীর কাছে বসতেন না; তিনি বুঝি মৈত্রেয়ীব চেয়ে কম পাবেন। কিন্তু সমান পাওয়াতে তিনি খুবই খুশী হলেন। কিন্তু মৈত্রেয়ী খুশী হতে পারলেন না। তিনি স্বামীকে জিজ্ঞাসা কবলেন, "এ সবেতে কি মৃত্যুকে অতিক্রম করা যাবে?" যাজ্ঞবল্ক্য উত্তব দিলেন, "না"। তখন মৈত্রেয়ী আর্তস্বরে ব'লে উঠলেন, "যাতে ক'বে আমি মৃত্যুব পাবে যাব না, তা নিয়ে আমি কি কবব?" খানিকক্ষণ আগেই তো তোমাকে এ কথা আমি বলেছি। বাবা, তুমি যাজ্ঞবল্ক্যের মত ব্রহ্মবাদী ঋষি হও আর নাই হও, তোমাব মনের এ দুটি রূপ কি তুমি দেখতে পাও না? একটি মন ধন জন মানে মত্ত। আর একটি মন কিন্তু এ সবে ব্যাজাব। সে মনটি বলে, "এ সব কী হচ্ছে?" যত আসক্তি কমে আসবে, যত জ্ঞান চর্চা কববে, তোমাব মনের কাত্যায়নীব ভাব ততই ক্ষীণ হবে, তোমার মনেব মৈত্রেয়ীর ভাব ততই প্রবল হবে। এ ছাড়া অন্য উপায় আর কি আছে?

মৃত্যুকে বরণ করার চেষ্টা মৃত্যুর রহস্য ভেদের উপায়

শিষ্য। বাবা, এক এক সময়ে আমার সন্দেহ হয় যে এ সব সম্বন্ধে আমার জানবার ইচ্ছেটা লৌকিক কৌতূহল মাত্র, যেমন নব্য পদার্থ-বিদ্যাব নূতন তথ্য পড়তে ইচ্ছা হয়। সেই প্রেরণা কই, যে প্রেবণাতে মনে হয যে, এই তথ্য না বুঝলে সবই বৃথা, সবই বাজে, সবই নিরর্থক?

গুরু। কেন, বাবা, তুমি তো কত মৌলিক গবেষণা করেছ। সে সব তথ্য জানার আগে জগৎ অন্ধকার ছিল, আর সেই সব তথ্য জানার পরে জগৎ আলোতে পরিপূর্ণ হল, ব্যাপারটা কি এই রকম ব'লে মনে হয়েছে? তাতো নয়। কোনও কোনও জিনিস তোমার কাছে অদ্ভুত ঠেকেছিল, সেগুলিব তথ্য উদ্‌ঘাটন না করা পর্যন্ত তুমি নিজে

কিছুতেই শান্ত হতে পার নি। তাঁর আবিষ্কারে জগতের তথ্যের ভাণ্ডার পূর্ণ হল এ কথা কোনও মনীষীই মনে করতে পারেন না। তাঁর নিজের মনে একটু সন্তোষ হয, এইমাত্র। এ নেশার ব্যাপার। নেশা করাতে জগতের হিতাহিত হল, এ নিয়ে কে মাথা ঘামায়? আমি নেশা করলে থাকি ভাল, এইমাত্র বলা যায়। বাবা, আমরা মৃত্যু থেকে অব্যাহতি পাওয়ার চেষ্টা করি, তাই মৃত্যু বুঝি না। যদি মৃত্যুকে বরণ করার চেষ্টা করি, তা হলে মৃত্যুর রহস্য ভেদ হয়ে যায়।

"মরণ রে, তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান"

শিষ্য। কি ক'রে বরণ করার চেষ্টা করি বলুন?

গুরু। কেন, বাবা, একটু আগেই তো গীতার কথা হল। শ্রীভগবান বলছেন, আমিই মৃত্যু। তুমি শ্রীভগবানকে বরণ ক'রে নেবে না? কেন, পূজার ঘরে যেমন প্রদীপ জ্বালো, মৃতের কক্ষেও তো তেমনি করেই আলো দাও।

শিষ্য। হাঁ, বাবা, রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতাতে আছে:

মরণ রে,
তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান।
মেঘবরণ তুঝ, মেঘজটাজুট,
রক্ত কমল কর, রক্ত অধর-পুট,
তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব,
মৃত্যু অমৃত করে দান।
তুঁহু মম শ্যাম সমান॥

গুরু। আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি যে মৃত্যু থেকে অব্যাহতি পাবার চেষ্টা বৃথা। চাঁদ সওদাগর লোহার ঘর তৈরী করেও লখীন্দরকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন নি। মৃত্যুকীট অলক্ষ্যেও আত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। মৃত্যুর কি একটা রূপ নেই? সেকি শুধুই শূন্যতা? অঙ্কের শূন্য O গোল—পরিপূর্ণ। শূন্যই পরিপূর্ণ।

"শ্যামের নাগাল পেলুম না লো সই"

শিষ্য। বাবা, এও আবার হেঁয়ালির কথা হচ্ছে।

গুরু। তা তো হবেই। কারণ আমরা যদি মনেতে দেওয়ালের কথা ভাবি এবং মুখে ফাঁকার কথা বলি, তবে তো উল্টোপাল্টা ঠেকবেই। ঘরের বড় ছোট আছে, ভাঙ্গা গড়া আছে। কিন্তু ফাঁকার কি? দেওয়াল থাকলেও ফাঁকা, না থাকলেও ফাঁকা। ফাঁকার আবার বড়, ছোট কি? ঘরের ফাঁকাও ফাঁকা, বাইরের ফাঁকাও ফাঁকা। এটা উপমা হল,—এটা মা নয়। এর থেকেও জিনিসটা সূক্ষ্ম। শাস্ত্রে বলছে, "ব্যোমাতীত নিরঞ্জন।"

শিষ্য। বাবা, তবে এ সব বলা কেন?

গুরু। এ ছাড়া ধারণা হবার উপায়ও আর কিছু নাই যে। শ্রীশ্রীঠাকুরের অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখানর কথা ভাব। গুরু শিষ্যকে একটি জ্বলজ্বলে তারা দেখিয়ে বললেন যে "এটিই অরুন্ধতী।" তিনি বিলক্ষণ জানেন যে উটি অরুন্ধতী নয়; কিন্তু শিষ্যের চোখ যদি নীচের দিকেই থাকে, তবে সে উঁচু জিনিস দেখবে কি করে? তাঁর মতলব এই যে শিষ্যের মন কামনা বাসনার জগতের স্থূল স্তর থেকে উচ্চ স্তরে নিয়ে যাবেন। মা যখন বলেন, "আয় চাঁদ আয় চাঁদ," তখন তাঁর অভিপ্রায় ছেলেকে কোনও মতে দুধ খাওয়ান, চাঁদ ধরা নয়। এও ঠিক তাই-ই। শিষ্যের চোখ যখন আর নীচের দিকে যায় না, তখন গুরুদেব আগের থেকে ক্ষীণালোক আর একটি নক্ষত্র দেখিয়ে বলেন, "এটিই অরুন্ধতী।" এই রকম করতে করতে যখন শিষ্যের দৃষ্টি সূক্ষ্মের দর্শনে অভ্যস্ত হয়েছে তখন তিনি বলেন, "এই যে দুটো তারা খুব মিটমিট ক'রে জ্বলছে, এরই মাঝামাঝি এদের চেয়েও নিষ্প্রভ আর একটি তারা আছে। সেটিই অরুন্ধতী।" তাই বলছিলাম যে বাক্যের দ্বারা যতটা বলা যায় ততটা বলতে হবে এবং মনের দ্বারা যতটা ভাবা যায় ততটা ভাবতে হবে, তারপর সেই বাক্যমনাতীত উপলব্ধি হবে।

শিষ্য। গুরু তবে কি প্রথমে শিষ্যকে মিথ্যা স্তোক দেন?

গুরু। না, বাবা, মা কি ছেলের কাছে মিছে কথা বলেন? মায়ের

ছেলেতে সম্বন্ধের চেয়ে ঢের বেশী নিবিড় সম্বন্ধ গুরু-শিষ্যতে। সে একই জিনিস। এপিঠ ওপিঠ মাত্র।

"গুরুশিষ্যে নাস্তি পাট।
তবে যাবে আনন্দের হাট॥"

শিষ্য। বাবা, এ অনেক উঁচু কথা হচ্ছে। আপনাকে একদিন আমি বলেছিলাম যে শ্রীরাধার একটা কথাও আমি বলতে পারি নে। এখন মনে হচ্ছে তাঁর একটা কথা আমি বলতে পারি—"শ্যামের নাগাল পেলুম না লো সই।"

"মৃত্যু সুন্দর, মধুর। মৃত্যুই জীবনকে সহজ ক'রে রেখেছে"

গুরু। বাবা, শ্রীভগবানের কথা তো উঁচু কথা হবেই। ভুঁয়ে দাঁড়িয়ে যদি নাগাল না পাই, ভুঁই থেকে লাফিয়ে ধরতে হবে। "ত্যাগেনামৃতমশ্নুতে" জান তো বাবা? তুমি তো রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমাকে শুনিয়েছ। আমিও তোমাকে তাঁর একটি প্রবন্ধ থেকে একটুখানি শোনাচ্ছি। এটি ১৩১৫ সালের ৩১শে চৈত্র তারিখে বর্ষশেষের শান্তিনিকেতনের বাণী :—

"অবসানকে, বিদায়কে, মৃত্যুকে, আজ আমরা ভক্তির সঙ্গে গভীর ভাবে জানব, তার প্রতি আমরা অবিচার করব না। তাকে তাঁরই ছায়া বলে জানব—যস্য ছায়াঽমৃতম্ যস্য মৃত্যুঃ।

"মৃত্যু সুন্দর, মধুর। মৃত্যুই জীবনকে সহজ ক'রে রেখেছে। জীবন বড়ো কঠিন, সে সবই চায়, সবই আঁকড়ে ধরে তার বজ্রমুষ্টি, কৃপণের মতো ছাড়তে চায় না। মৃত্যুই তার কঠিনতাকে রসময় করেছে, তার আকর্ষণকে আলগা করেছে, মৃত্যুই তার নীরস চোখে জল এনে দেয়, তার পাষাণ স্থিতিকে বিচলিত করে।

"আসক্তির মতো নিষ্ঠুর শক্ত কিছুই নেই, সে নিজেকেই জানে, সে কাউকে দয়া করে না, সে কারো জন্যে কিছু মাত্র পথ ছাড়তে চায় না। এই আসক্তিই হচ্ছে জীবনের ধর্ম, সমস্তকেই সে নেবে ব'লে সকলের সঙ্গেই সে কেবল লড়াই করছে।

"ত্যাগ সুন্দর, ত্যাগ কোমল। সে দ্বার খুলে দেয়। সঞ্চয়কে সে কেবল এক জায়গায় স্তূপাকাররূপে উদ্ধত হয়ে উঠতে দেয় না। সে ছড়িয়ে দেয়, বিলিয়ে দেয়। মৃত্যুরই সেই ঔদার্য। মৃত্যুই পরিবেষণ করে, বিতরণ করে। যা এক জায়গায় বড়ো হয়ে উঠতে চায় তাকে সর্বত্র বিস্তীর্ণ ক'রে দেয়।"

আসক্তি-শূন্যতাই পরিপূর্ণতা

শিষ্য। হাঁ, বাবা, আপনি আগে যে দেওয়াল ভাঙার কথা বলেছিলেন এও তো তাই-ই। দেওয়ালে ঘেরা আছে বলেই, এঘর, ওঘর থেকে বড় করবার প্রয়াস। নতুবা আর বড় ছোট কিসের ?

গুরু। 'আসক্তি-শূন্যতাই পরিপূর্ণতা' এখন আর হেঁয়ালি ঠেকছে না তো ?

শিষ্য। সেটা মনে বুঝেছি। কিন্তু প্রাণে বোঝা হয়েছে কি ? এ দুটির তফাৎ তো আপনি ব'লে দিয়েছেন। আগুনে হাত পোড়ে এটা প্রাণে বুঝি ব'লে আগুনের কাছেও যাই না। আসক্তির ধার দিয়েও যখন যাব না তখনই প্রাণে বোঝা হবে যে,'আসক্তি-শূন্যতা' অবস্থাটা কি।

গুরু। গাছের বীজ কি বীজের গাছ, এ সম্বন্ধে অনন্তকাল ধ'রে তর্ক করা যেতে পারে। এই যে আসক্তি ত্যাগের ইচ্ছে হয়েছে, এই-ই যথেষ্ট। জানো না, বাবা, যখন শিষ্যেরা সমিধ হাতে নিয়ে ব্রহ্মবিদ্ ঋষির কাছে যেতেন, তখন তাঁর কি আনন্দ হত। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে সাগ্রহে বলতেন, "কী, তোমাদের ব্রহ্মজ্ঞানের বাসনা হয়েছে ?" ছোট্ট একটি বীজ। তাকে কামনা বাসনার ধূলা মাটির তলাতে চেপে দেওয়া হল। সে কিন্তু বাড়ছেই। সেই মাটি থেকেই রস আকর্ষণ ক'রে কেবলই বাড়ছে। সেই ধূলিস্তর বিদীর্ণ ক'রে সে উপরে উঠছে, একটি সরু সুতোর মতন,—দেখা যায় বা না যায়। দুটি কচি কচি পাতার দুটি ছোট্ট ছোট্ট হাত জুড়ে সে অনন্ত আকাশের দিকে চেয়ে প্রার্থনা করছে, "এ অনন্তের উপলব্ধি কি আমার হবে ?" অমনি কাজ শুরু হয়েছে। মাটি থেকে, হাওয়া থেকে, আলো থেকে, তাকে জীবনীশক্তি যোগান হচ্ছে। সে কেবলই বাড়ছে, কেবলই বাড়ছে। কত হাত বার ক'রে সে কত প্রার্থনাই করছে। প্রকাণ্ড

প্রকাণ্ড ডাল হয়েছে। তার থেকে কত ঝুরি নেমেছে। সেখানেও এক একটি কাণ্ড গজিয়েছে। সবটা প্রায় যোজন ব্যাপী। কত শত তাপিত তার তলাতে এসে শান্তিলাভ করছে। তার কিন্তু প্রার্থনার বিরাম নাই। তা থেকে ছোট ছোট ফল ঝরে পড়ছে। তার প্রত্যেকটির মধ্যে সে পুনর্জীবন লাভ করছে। সে জানে সে অমৃত। তার কাছে জন্ম মৃত্যুর রহস্য ভেদ হয়ে গিয়েছে।

"মর্ত্যামৃতং তব পদং মরণোর্মিনাশম্"

শিষ্য। বাবা, এ উপমাটি চমৎকার! আমার কি তেমন সবল একাগ্র ঊর্দ্ধ দৃষ্টি? আমার দৃঢ়তা কই? আমি হাওয়াতে দুলি। আমার সন্দেহ হয় যে আমার আত্মবিশ্বাসের মূলই নাই। শুধু একটি অতি ক্ষীণ লতা মাত্র।

গুরু। বাবা, স্বর্ণলতা বা আলোকলতা দেখ নি? তারও তো মূল নেই, পাতা নেই। তার এইটুকু মাত্র বিশেষত্ব যে, সে যে গাছটিকে অবলম্বন ক'রে রয়েছে তা ছাড়া অন্য কিছু থেকে রস নেয় না। সেই রসেই পুষ্ট হচ্ছে, বর্ধিত হচ্ছে। আর কেবল জড়াচ্ছে, কেবল জড়াচ্ছে। শেষে এমন একটি অবস্থা আসে যে, গাছটি আর দেখাই যাচ্ছে না। সেটি আলোকলতার কুঞ্জ বলেই মনে হচ্ছে।

শিষ্য। বাবা, আপনার সঙ্গে কথায় আমি কোন দিনই পারি নি। আজই বা পারব কেমন ক'রে? সে চেষ্টা বৃথা চেষ্টা। আর আমি সে চেষ্টা করতেও চাই নে। আপনার কথা কিভাবে শুনলে আমার আসক্তি ত্যাগ হবে, জন্ম-মৃত্যুর রহস্য বুঝতে পারব, আমাকে তাই-ই বলুন আপনি। আমার এক এক সময়ে এমন অসোয়াস্তি হয় যে আপনাকে আর কী বলব, বাবা।

গুরু। কেন, বাবা, যেমন ক'রে শুনছ এমনি ক'রে শুনলেই হবে। শোন, বাবা, একটা মজার গল্প শোন। এক রাজকন্যা স্বয়ম্বরা হবেন। তিনি খুব বিদুষী ছিলেন। তিনি একটা মড়ার মাথা এক টুকরো মখমলের উপরে রেখে দিয়েছিলেন। বিবাহার্থী কেউ এলেই

জিজ্ঞাসা করতেন, "এ মাথাটি পণ্ডিতের মাথা, না মূর্খের মাথা?" কত লোকই আসে। কেউ বলে পণ্ডিত, কেউ বলে মুর্খ। রাজকন্যা অমনি জিজ্ঞাসা করেন, "আপনার এ সিদ্ধান্তের কারণ কি?" কেউ তার উত্তর দিতে পারে না। রাজকন্যার বিবাহও হয় না। অবশেষে একজন একটি সোনার শলা হাতে ক'রে এলেন। তিনি শলাটি মাথাটির এক কানে ঢুকিয়ে অপর কান দিয়ে বার করবার চেষ্টা করলেন। তা হল না। কান দিয়ে ঢুকিয়ে মুখ দিয়ে বার করবার চেষ্টা করলেন তাও বিফল হল। যতবারই শিকটা কানের ভিতর দেন, ততবারই হৃদয়ের দিকেই আসে। তখন তিনি রাজকন্যাকে বললেন,' 'দেখুন, ইনি পণ্ডিত। ইনি যা কিছু শুনেছেন, এক কান্ দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বার ক'রে দেন নি। আবার তা নিয়ে-বৃথা বাদানুবাদও করেন নি। সেগুলি মনন ও নিদিধ্যাসন করেছেন। সুতরাং ইনি নিশ্চয়ই পণ্ডিত।" রাজকন্যা তাঁরই গলাতে বরমাল্য দিলেন। শোনা ঠিক হচ্ছে কি না হচ্ছে, সেটি বোঝা যাবে কাজ দেখে,—তা শরীরেরই হ'ক, আর মনেরই হ'ক। অরও দেখ, বাবা, ঋষিরা কি সব অদ্ভুত কথাই ব'লে গিয়েছেন। তাঁরা সত্যদর্শী, তাঁরা বাজে বলেন নি, কিন্তু তাঁদের কথা এমন অদ্ভুত যে, না ভেবে উপায়ই নাই। শ্রবণ হলেই মনন, নিদিধ্যাসন হবেই।

"ভয়াদস্য অগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥"

এর ল্যাজা মুড়ো যদি বাদও দিই,—যদি এ তর্ক না করি যে, পরমেশ্বর থেকে আবার ভয় কিসের,—"ন বিভেতি কুতশ্চন" ইত্যাদি—যদি "ইন্দ্র" কথার মানে নিয়ে একটা জটিল তর্কের অবতারণা না করি, যদি "পর্জ্জন্য" অর্থাৎ "জল" এই সাধারণ অর্থেই "ইন্দ্র" শব্দটি নিই,—তা হলেও বলতে হবে যে ঋষি বোঝাতে চাইছেন যে অগ্নির, সূর্য্যের, জলের ও বায়ুর মতন মৃত্যুও একটি প্রবহমান শক্তিমাত্র। এ ছাড়া আর হাতী ঘোড়া কিছু নয়। আবার মজা দেখ, বাবা, বার বারই সেই

একই কথা ঘুরে ফিরে আসছে। স্বামীজী শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্তব করবার সময়ে বলেছেন :

"মর্ত্যামৃতং তব পদং মরণোর্মিনাশম্।"

"তোমার শ্রীচরণ মরজগতে অমৃতস্বরূপ, মৃত্যুরূপ ঊর্মীর বিনাশকারী।" কি সুন্দর কথা। মরণকে ঊর্মীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। এর আগেও এ উপমা হয়েছে,—যেমন বিদ্যাপতি বলেছেন,

"তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগরে লহরি সমান ॥"

তারও আগে এই উপমা আরও বহু জায়গাতে করা হয়েছে। কিন্তু তাই ব'লে এর চমৎকারিত্ব বা মনোহারিত্ব একটুও কমে নি। ঊর্মীর জল কি সত্যই ঊর্মীর সঙ্গে সঙ্গে চ'লে আসে? তাতো নয়। শুধু প্রবাহই চ'লে আসে। যেখানকার জল সেখানেই একটু উপর নীচ করে মাত্র। মরণেতেও সত্যিই বিনাশ নাই—বিনাশের মতন দেখাচ্ছে মাত্র। এ প্রবাহও আবার সৃষ্টিরই প্রবাহ।

শিষ্য। কি সব অদ্ভুত কথাই বলছেন, বাবা।

"পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে"

গুরু। না, বাবা, অদ্ভুত কথা হবে কেন? সৃষ্টি কথাটাও যা সৃজন কথাটাও তো তাই-ই। সংস্কৃত ভাষাবিদ্‌দের কাছে সৃজন কথাটা অশুদ্ধ ব'লে মনে হবে। তাঁরা বলবেন, ওটা হবে "সর্জন"। ব্রহ্মবিদ্ পুনঃ সংস্কৃত ক'রে উটকে বলবেন "বিসর্জন"। বাস্তবিক তিনি নিজেকে বিসর্জন করেছেন তাই না সৃষ্টি। আবার সৃষ্ট আছে বলেই লয়ও আছে। তাঁতেই সৃষ্টি আর তাঁতেই লয়। শ্বেতাশ্বতর কি বলছেন?

"য একোঽবর্ণো বহুধাশক্তিযোগাদ্
বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ চ দেবঃ" (৪ ১)

"তিনি স্বপ্রকাশ যিনি অদ্বিতীয়, যিনি নির্বিশেষ, যিনি অজ্ঞাত প্রয়োজনে নানা শক্তি সহকারে সৃষ্টির আদিতে বিবিধ পদার্থের বিধান

করেন এবং প্রলয়কালে যাঁতে বিশ্ব লীন হয়।" সৃষ্টিতে যিনি, লয়েতে যিনি, তিনি কি স্থিতিতেও নাই? স্থিতিতেও তিনিই। কেবল তিনিই আছেন। তাঁকে জানি না, চিনি না; তাই না ভয়, তাই না সংশয়। খোকার কাছেই মা শুয়ে আছেন। অন্ধকারে খোকা তাঁকে দেখতে পাচ্ছে না। ডুকরে কেঁদে উঠছে। কিন্তু মা কি সত্যই নাই? তিনি আছেন; তিনি আছেন। অন্ধকারে চোখ দিয়ে দেখা যায় না। হাতড়ে দেখতে হয়। হাতে মায়ের স্পর্শ পাওয়া যায়। মাও অমনি সাড়া দেন, "খোকা, এই যে আমি।" মা খেলতে ভালবাসেন। আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে ভালবাসেন। "টুকি টুক্" দিচ্ছেন। তিনি হরবোলা কিনা। মনে হয় তিনি বুঝি কত দূরেই আছেন। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। আর আমাদের খেলতে ভাল লাগে না। চীৎকার ক'রে ডাকি, "মা, ওমা, তুমি কোথায়?" তিনি অমনি পাশ থেকেই হেসে বলেন, "কি রে, ভয় পেয়েছিস? এই যে আমি।" আমরা 'মা'কে বাদ দিয়ে 'আমার', 'আমার' করছি, তাই কেবল 'আর', 'আর' করতে হচ্ছে। কেবলই বৃথা হয়রাণ হতে হচ্ছে। আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি কখনও হচ্ছে না। মায়ের হাসিভরা মুখ, দুষ্টুমিভরা চোখ যদি একবার দেখতে পাই, তবে জানব জন্ম মৃত্যু এ সব কথার কথা মাত্র। তিনিই, কেবল তিনিই। তুচ্ছ মাটিও আমার 'মা'-টি।

শিষ্য। বাবা, রবীন্দ্রনাথের একটি গানে আছে:

"দুখের বেশে এসেছ ব'লে তোমারে নাহি ডরিব হে,
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় করি ধরিব হে।
আঁধারে মুখ ঢাকিলে স্বামী, তোমারে তবু চিনিব আমি,
মরণরূপে আসিলে প্রভু চরণ ধরি মরিব হে।
নয়নে আজি ঝরিছে জল ঝরুক জল নয়নে হে,
বাজিছে বুকে, বাজুক তব কঠিন বাহু-বাঁধনে হে।
তুমি যে আছ বক্ষে ধ'রে, বেদনা তাহা জানাক মোরে,
চাব না কিছু, কব না কথা, চাহিয়া রব বদনে হে,
নয়নে আজি ঝরিছে জল, ঝরুক জল নয়নে হে।"

গুরু। বাবা, কাতরতা ছাড়া অন্য জিনিসও কি নাই? শোন নি কি:

"তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি ধাই—
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই॥
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ,
তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই॥
হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে যাহা-কিছু সব আছে আছে আছে,
নাই নাই ভয়, সে শুধু আমারি, নিশিদিন কাঁদি তাই।"

তিনি যে পূর্ণ! "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।" পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে!

"আবিরাবীর্ম এধি"

শিষ্য। বাবা, এ সব আমার ধারণার অতীত। তবু, বাবা, আপনাকে "বাবা" ব'লে ডেকেছি তো। আপনি আমাকে জন্ম দিন। আপনাকে বাবা ব'লে ডাকা আমার সার্থক হ'ক। আমার পুরাতন জীবনের মরণ হ'ক। নতুন জীবন আরম্ভ হ'ক। আমার তনু মন প্রাণ নূতনভাবে নিয়োজিত হ'ক। আজ থেকে,—এই মুহূর্ত থেকে,—আপনি যে যে কাজ ভালবাসেন, আমার শরীর দিয়ে শুধু সেই সেই কাজই হ'ক। আপনি যে সব ভাবনা ভালবাসেন, আমার মনেতে শুধু সেই সব ভাবনাই হ'ক। আপনার অভিপ্রেত আশা আকাঙ্ক্ষাই শুধু আমার প্রাণে জাগরূক হ'ক। তা হলেই আপনাকে বাবা ব'লে ডাকা আমার সার্থক হবে।

গুরু। বাবা, আমিও তো তোমাকে বাবা ব'লে ডাকি। ধর, বাবা, একটা পাত্রে খানিকটা জল আছে। আর একটা পাত্রে খানিকটা চিনি আছে। খানিকক্ষণ ঢালাঢালি করার পরে দুটি পাত্রেই জল ও চিনি সমান ভাবেই আসে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, "সখি, যাবৎ বাঁচি, তাবৎ শিখি।" তোমারই বুঝি শুধু আমার কাছে শেখার আছে? আমার বুঝি তোমার কাছে কিছুই শেখার নাই? তা নয়, বাবা। তুমি যখন আমার কাছে বসে বসে কথা শোন, তখন আমার মনে হয় শ্রীশ্রীঠাকুর

তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টি দিয়ে আমাকে কেবলই প্রেরণা দিচ্ছেন। তুমি রাশ ঠেলে দাও, তাই না কথা বলি। এই দিয়েই তো বুঝি শ্রীশ্রীঠাকুর অবিনাশী। তিনি বিজর, বিবন্ধন। নাম রূপের পারে, বিরাট। বাবা, তুমি জন্ম-মৃত্যুর রহস্য শিখছ, না শেখাচ্ছ, সত্যি ক'রে বলতো ?

শিষ্য। বাবা, আপনি এমন ক'রে বলবেন না। কোথায় শুদ্ধ সত্ত্ব আপনার গুরুদেব, আর কোথায় আমি।

গুরু। নুনের হাতী, নুনের উট, নুনের বাড়ী, নুনের মঠ ততক্ষণই হাতী, উট, বাড়ী, মঠ, যতক্ষণ সমুদ্রে না যায়। বিভিন্ন নামরূপের ছাঁচে একই নুন। এই নামরূপের আবরণ না থাকলে জন্মই বা কি আর মৃত্যুই বা কি ? "অপাবৃণু, অপাবৃণু, আবিরাবীর্ম এধি, আবিরাবীর্ম এধি।"

শিষ্য। বাবা, বৈদিক যুগ থেকেই এই প্রার্থনা চ'লে আসছে। প্রার্থনা পূর্ণ হল কই ?

গুরু। এর মজা তো এইখানেই। এ যত পোরে ততই খালি হয়। অনন্ত কিনা, তাই এই রকম অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। মহাপ্রভু যখন নীলাচলে বিলাপ করছেন, তখন কি তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে বুঝতে পারেন নি ? না কি, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বলেই বিলাপ করছেন ? সংসারীর বিলাপ আর ভক্তের বিলাপ কি একই ? পুত্র-বিধুর সংসারীর কান্না শুনে মনে হয় আমার যেন ঐ অবস্থা না ঘটে। বিরহ-কাতর ভক্তের কান্না শুনে মনে হয় আমার কবে ঐ কান্না আসবে। একটি লঙ্কার ঝাল, আর একটি দারুচিনির ঝাল। ঋষিদের প্রার্থনা আমাদের প্রাণে নৈরাশ্য জাগাবে কেন ? আমাদের প্রাণে উদ্দীপনা দেবে, প্রেরণা দেবে। দেখ, বাবা, একটি ছোট কথা দিয়েই দেখ। আমরা বলি "মেয়ে মানুষ", "পুরুষ মানুষ"। যদি আমাদের মন থেকে "মেয়ে" "পুরুষের" তফাৎ উঠে যায় তবে থাকে শুধু "মানুষ", মন হুঁশ, শুদ্ধ চৈতন্য।

"এত কাছে কাছে হৃদয়েরি মাঝে লুকায়ে রয়েছ হরি।
কিন্তু মনে ভাবি আমি কতদূরে তুমি রয়েছ আমায় পাশরি।
যেমন নাভিগন্ধে মত্ত মৃগ ইতস্ততঃ ছুটে গন্ধ অন্বেষণে।
তেমনি তোমায় বুকে ধ'রে আকুল তোমার তরে ছুটে যাই ভব বনে"

শিষ্য। বাবা, এটা বলতে পারি না। তবে এটা বলতে পারি :

"দেখা যদি নাহি দিলে, কেন দুটি আঁখি দিলে,
কেন দিলে এই প্রাণ মন।
ধরা যদি নাহি দিলে, কেন মন মাতাইলে,
কেন প্রাণে এই আকর্ষণ।
খুলে দাও আঁখি ডোর, ঘুচাও এ মোহ ঘোর,
দূর কর যত ব্যবধান।
এই তুমি, এই আমি, এই তো হৃদয় স্বামী
দেখা দিয়ে জুড়াও পরাণ।"

"আছ অনল অনিলে চির নভোনীলে ভূধর সলিলে গহনে"

গুরু। বাবা, শ্রীশ্রীঠাকুরের এ স্তবটি কেমন, বল তো ?

"তুঁহি সলিল, তুঁহি অখিল, তুঁহি অনল, তুঁহি অনিল।
তুঁহি আকাশ, স্বপ্রকাশ, জ্যোতির্ময়, নিরমল ॥
তুঁহি ভক্ষ্য, তুঁহি ভোক্তা, তুঁহি দাতা, তুঁহি গ্রহীতা।
তুঁহি পিতা, তুঁহি মাতা, ভ্রাতা, ত্রাতা বন্ধুগণ ॥
তুঁহি অন্তর, অন্তরযামী, তুঁহি বিশ্ব, বিশ্বস্বামী।
তোঁহারি তুলনা তুঁহি, তুয়া ছাড়া কেবা বল।
ভাবাভাবে সমাহিত, গুণময় গুণাতীত ॥
তুঁহি সর্বসাক্ষীভূত, ভূতনাথ মহাকাল ॥"

শিষ্য। বাবা, এ আমার ধারণাই হয় না। বরং বলতে পারি :

"আছ, অনল-অনিলে, চিরনভোনীলে, ভূধর-সলিলে, গহনে,
আছ, বিটপিলতায়, জলদের গায়, শশি-তারকায় তপনে।"

গুরু। সে একই কথা, বাবা। যদি তাঁকে সর্বব্যাপী ব'লে বুঝতে পার, তোমাকেও সব জায়গায় থাকতে হবেই। তা নইলে

কেমন ক'বে বুঝবে। এ যে সর্বব্যাপীর কথা হচ্ছে। তোমার ভিতবেও তিনি, তাঁর ভিতরেও তুমি একই। শ্রীপ্রহ্লাদ হিবণ্য-কশিপু বধেব সময় প্রথমে স্তব করলেন, "তোমাতেই সব, তুমিই সব।" পরে আবার স্তব করলেন, "আমাতেই সব, আমিই সব।" সবাই মানে সব I. সবই আমি।

শিষ্য। এ ধারণা আমার হবেও না; আর এ আমাব চাইও না। জন্ম-মৃত্যুর রহস্য ভেদ অদ্বৈত জ্ঞানে হয় হ'ক, না হয় নাই হ'ক। আমাকে শুধু এই আশীর্বাদ করুন যে আমি যেন মনে প্রাণে বলতে পাবি—

"শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ॥"

পরিশিষ্ট

(শ্রীশ্রীহেমচন্দ্র রায় বিরচিত কয়েকটি গান)

(১)

ইমনকল্যাণ—একতালা

(ওমা) রাজরাজেশ্বরী শ্যামা শুভঙ্করী করুণা কটাক্ষে চাহ না।
বরাভয়-করা ভক্তমনোহরা শুন শুন দুখ যাতনা ॥

নিবিড় আঁধারে মোহিনী পিশাচী পাতিয়ে মোহন ফাঁদ,
আশালতা-জালে মরীচি-হিল্লোলে ধরিল বিমল চাঁদ,
বিষয়-আলানে বাঁধে গো,
মায়ের সন্তানে মাতা বিদ্যমানে
বিধান দেখালি ভাল,
মৃগেন্দ্র শাবকে, প্রহারয়ে ভেকে, এত অপমান সহে না ॥

জ্ঞানচন্দ্রমা রাহুমেঘে ঢাকা না হেরি সত্যের জ্যোতিঃ,
কিবা অপরাধে বিমুখ বরদে চপল বালক প্রতি,
জননী পাষাণী কভু ত নয় ;
(তবে) কিসের কারণে ভুলায়ে সন্তানে
আনিলি ভবের মাঝে,
আমি যদি মরি ও শিব-সুন্দরী দুর্গানাম কেউ লবে না ॥

কাতর অন্তরে জুড়ি দুটি কর চরণে মিনতি করি,
হৃদি-বৃন্দাবনে হও মা আসীনা নিরখি নয়ন ভরি,
শীতল হইবে জীবন-মরু ,—
নীল শতদলে শ্রীপদ কমলে,
জবা-বিল্বদলে পূজিব,
আদ্যাশক্তি উমে কৃপাময়ী নামে কলঙ্ক-কালিমা মেখ না ॥

(২)

ভায়রো মিশ্র—কাওয়ালী

(একবার) জাগো গো মা কুলকুণ্ডলিনী।
সংসার-সঙ্কট ভঞ্জন-কারিণী
হেমবরণী জননী ॥
দনুজ-দলনী দেবী দীন-দুখ-হরা,
যমভয়বারিণী তারিণী ত্রিতাপহরা,
অজরা অমরা বরা, দয়াময়ী পরাৎপরা
ত্রিগুণধারিণী কল্যাণী ॥
মুক্তকেশী রাণী সুরনর বন্দিনী,
অভীষ্ট প্রদায়িনী চিন্ময়রূপিনী,
ষড়ৈশ্বর্যশালিনী সর্বসিদ্ধিদায়িনী,
পরমা প্রকৃতি সতী ব্রহ্ম সনাতনী,
জ্ঞানসূর্যে কর মোহ-তম বিদূরিত,
বিবেক-ভস্মে তনু কর মাগো বিভূষিত,
ভকতি শান্তিবারি, হৃদে হ'ক প্রবাহিত,
প্রেম পীযূষ বিধায়িনী ॥

(৩)

ঝিঁঝিঁট মিশ্র—কাওয়ালী

(ওহে) করুণা নিদান রামকৃষ্ণ ভগবান
দাও প্রভু স্থান রাঙ্গা চরণে।
তব নামে হয় ধরা মধুময়,
পশে সুখে শান্তিধামে ॥ (অজর অমর হয়ে)
নাহি ভক্তি জ্ঞান জপ তপ ধ্যান,
সাধন বিহীন অবোধ অজ্ঞান,
প্রেম সুধাবারি ঢাল পরাণে নাশ মোহ অভিমানে
ও শ্রীপদ বিনা হরি তরি কেমনে। (এ ঘোর দুস্তরে)
(তুমি) বিপদ বান্ধব ক্ষীরোদা বল্লভ,

অনাথ পালক ভুবন নায়ক,
উদয় হও হে হৃদি মাঝারে হেরি মোরা পরাণ ভ'রে,
যেমন নেচেছিলে তুমি বৃন্দাবনে ॥ (মোহন চূড়া ধড়া প'রে)
(যশোদা সাজান বেশে)

(৪)

বাউল—খেমটা

হরিনাম খাসাসুরা, মন বাউরা, আচ্ছা ক'রে পান কর না।
হবি তুই পাকা মাতাল, ঘুচবে জঞ্জাল, বিষয়দহে আর ঘুরবি না ॥
এ সুরার গন্ধ পেলে, আপনা ভুলে, সদানন্দে হয় মন মগনা,
রাখে না কোন খবর, হয় দিগম্বর, জীবন্মৃত হয় সে জনা ॥
যারা সব পেঁচি মাতাল, বুঁচকি আগাল, কিনছে সুরা আনা আনা,
(তুই) পাঁচসিকের বোতল কিনে, মালটি টেনে, ধূলায় গড়াগড়ি দে'না
যে মদে ঈশা পাগল, মুশা পাগল শিব চৈতন্য নানক নানা
তুই তাদের সঙ্গে মিশে, টেনে কষে সাত দেউড়ী পারে চ'লে যানা ॥
মদের গুণ বলি শোন, ও ক্ষেপা মন, জনম মরণ ভয় থাকে না,
পেয়ে সে পরম তত্ত্ব, হয় কৃতার্থ, তত্ত্বমসি ভাব নিশানা ॥
শুনছি (মদের) পিপে নিয়ে, আসছে ধেয়ে, রসিক মাতাল কে একজনা,
অযাচিতে ছিপি খুলে, দিচ্ছে ঢেলে, বলে একটু টেনেই যানা ॥
এ সুরা যত খাবি, তত পাবি, নাইক হেথা লেনা দেনা,
তুই সুরা পিয়ে রামকৃষ্ণ ব'লে কাল সাগরে পাড়ি দে'না ॥
দ্বারে দ্বারে ফিরছে দয়াল, প্রেমের কাঙ্গাল, বোঝা যায় না রকমখানা,
এবার নাম-মদের রঙ্গ, ঘোর তরঙ্গ, বুঝি কীট পতঙ্গ বাদ যাবে না ॥